শির্ক কী ও কেন?

(২য় খণ্ড)

[বাংলা – Bengali – بنغالي]

ড. মুহাম্মদ মুয্যাম্মিল আলী

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

2013 - 1434

IslamHouse.com

https://archive.org/details/@salim_molla

الشرك ما هو ولماذا؟

(الجزء الثاني)

« باللغة البنغالية »

د. محمد مزمل علي

مراجعة: د/ أبو بكر محمد زكريا

2013 - 1434

IslamHouse.com

<table>
<tr><td colspan="2">দ্বিতীয় অধ্যায়</td></tr>
<tr><td colspan="2">বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমদের মাঝে শির্কের বহিঃপ্রকাশ</td></tr>
<tr><td>প্রথম পরিচ্ছেদ</td><td>বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে জনগণ কর্তৃক তা গ্রহণের ধরন ও প্রকৃতি</td></tr>
<tr><td></td><td>বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে এদেশের ভৌগলিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা</td></tr>
<tr><td></td><td>জনগণের ইসলাম গ্রহণের ধরন ও প্রকৃতি</td></tr>
<tr><td></td><td>ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থার অবনতি</td></tr>
<tr><td>দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ</td><td>বাংলাদেশে শির্ক চর্চার কেন্দ্রসমূহ</td></tr>
<tr><td>তৃতীয় পরিচ্ছেদ</td><td>জাহেলী যুগের শির্কের কেন্দ্রসমূহের সাথে আমাদের দেশে অবস্থিত শির্কের কেন্দ্রসমূহের তুলনা</td></tr>
</table>

চতুর্থ পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শির্ক (مظاهر الشرك في كثير من مسلمي بنغلاديش)
	জ্ঞানগত শির্ক (مظاهر الشرك في العلم)
	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য বা গায়েব সম্পর্কে জানতেন বলে বিশ্বাস করা
	ভাগ্য সম্পর্কে জানার জন্য জ্যোতির্বিদদের নিকট গমন করা এবং তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করা
	তারকা সৃষ্টির রহস্য
	অতীত ও বর্তমান জ্যোতির্বিদদের মধ্যে পার্থক্য
	জিন ও জিন সাধকরা অদৃশ্য সম্পর্কে জানতে পারে বলে বিশ্বাস করা
	পাখি বা বানরের মাধ্যমে ভাগ্য জানার চেষ্টা করা
	আল্লাহর ওলিগণ গায়েব সম্পর্কে জানেন?
	পরিচালনাগত শির্ক (مظاهر الشرك في التصرف)
	বিপদ মুক্তির জন্য খতমে নাবী পাঠ করা
	রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে তাঁকে আল্লাহর অবতারে

	পরিণত করা
	অলিগণের মধ্যে যারা গউছ ও কুতুব তারা পৃথিবী পরিচালনা করেন বলে বিশ্বাস করা
	ওলিগণ কি মানুষের কল্যাণ করতে পারেন ?
	কবরস্থ ওলিগণ কি আহ্বানকারীদের আহ্বান শুনতে পারেন ?
	আল্লাহই সকল কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক
	কবরে অব্দুল কাদির জীলানীর হস্তক্ষেপে বিশ্বাস
	আব্দুল কাদির জীলানীকে দস্তগীর নামে অভিহিতকরণ
	রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশের জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে মনে করা
	ওলীদের কবর ও কবরের মাটি, গাছ, নিকটস্থ কূপের পানি ও জীব-জন্তুর দ্বারা উপকারে বিশ্বাস করা
	মানব রচিত বিধান ও আইন দ্বারা দেশ শাসন ও বিচার কার্য্য পরিচালনা করা
	জিনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য জিনকে শিরনী দান

	ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাথরের প্রভাবে বিশ্বাস করা
	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেটে বাধা পাথরের দ্বারা উপকারে বিশ্বাস
	নিম্নজগতের উপর উর্ধ্বজগতের তারকারাজির প্রভাবে বিশ্বাস করা
	মানুষের উপর কোনো গ্রহের প্রভাব থাকা মিথ্যা হওয়ার বাস্তব প্রমাণ
	উপাসনাগত শির্ক (مظاهرالشرك في العبادات)
	আল্লাহ তা‘আলার নামের জিকরের সাথে বা এককভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের জিকর করা
	কবরমুখী হয়ে বা কবরের পার্শ্বে নামায আদায় করা
	দ্রুত দো‘আ কবুল হওয়ার আশায় মুরশিদ বা পীরের বৈঠকখানার দিকে মুখ করে দো‘আ করা
	ওলীদের নিকট কিছু কামনা করা
	ওলীদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা

	ওলীদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বিনয় প্রকাশ করা
	আল্লাহর এবাদতের জন্য কবরের পার্শ্বে ই'তিকাফ বা অবস্থান করা
	কবরের চার পার্শ্বে প্রদক্ষিণ বা ত্বওয়াফ করা
	কবরকে সামনে রেখে রুকু' ও সেজদা করা
	কবর, কবর, দরবার ও মুকামে মানত করা
	গায়রুল্লাহের নামে পশু যবাই করা
	আল্লাহর ভালবাসার ন্যায় নিজের পীরকে ভালবাসা
	অন্তরে পীর ও ওলিদের অনিষ্টের গোপন ভয় করা
	আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করা
	আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত কোনো মানুষের মত ও পথের নিঃশর্ত আনুগত্য ও অনুসরণ করা
	নির্দিষ্ট করে এক মাযহাব অনুসরণের সম্ভাব্য স্থান
	সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট করে এক মাযহাব পালন করা জরুরী না হওয়ার কারণ
	বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে অন্ধভাবে মাযহাব পালনের বাস্তব উদাহরণ
	অনুসরণের ব্যাপারে সাধারণ ও আধুনিক শিক্ষায়

	শিক্ষিতদের অবস্থা
	পীরের নিকট রহমত ও করুণা কামনা করা
	অভ্যাসগত শির্কের উদাহরণ (مظاهر الشرك العادات)
	রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ধাতব দ্রব্য দ্বারা নির্মিত আংটি বা বালা পরিধান করা
	জিন বা অপর কোনো রোগের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীরে তা'বীজ ব্যবহার করা (تعليق التمائم أو التعويذ)
	তা'বীজের প্রকারভেদ
	এ জাতীয় তা'বীজ হারাম হওয়ার কারণ
	দুধের গাভী ও নতুন বাচ্চার গলায় তা'বীজ, জুতা ও জালের টুকরা ঝুলানো
	স্বামীকে বাধ্য করার জন্য গোপনে ঘরের চুলা, বিছানা, বালিশ বা অন্য কোথাও তা'বীজ রাখা
	আগুন, রক্ত, খাবার দ্রব্য, সন্তান ও মাটি ইত্যাদির নামে বা তাতে হাত রেখের শপথ গ্রহণ করা
	ওলীদের কবরের মাটি ও সেখানে জালানো

	মোমবাতিকে বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী মনে করা
	কোন ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য নিরবে দাঁড়িয়ে থাকা
	শিখা অনির্বাণের পাশে দাঁড়িয়ে আগুনকে সম্মান প্রদর্শন করা
	কপালে টাকা স্পর্শ করে তা সম্মান করা
	জঙ্গলের জিনের কাছে আশ্রয় চাওয়া
	খাওয়াজ খিযির ও পীর বদরকে আহ্বান করা
	জঙ্গলের কাঠ সরদারিনীকে ভয় করা
	মাটি ও গাছকে সালাম করা
	শির্কে আসগর এর কতিপয় উদাহরণ (بعض أمثلة للشرك الأصغر)
	কুসংস্কার
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শির্কের সাথে জাহেলী যুগের শির্কের তুলনামূলক আলোচনা
তৃতীয় অধ্যায়	

<table>
<tr><td colspan="2">অধিকাংশ মুসলিমদের শির্কে পতিত হওয়ার কারণ
(الفصل الثالث : أسباب وقوع كثير من المسلمين في الشرك)</td></tr>
<tr><td>প্রথম পরিচ্ছেদ</td><td>অধিকাংশ মুসলিমদের শির্কে পতিত হওয়ার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রথম পরোক্ষ কারণ : ইসলামের সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ
(السبب الأول غير المباشر لوقوع المسلمين في الشرك: جهلهم للعقيدة الإسلامية الصحيحة)</td></tr>
<tr><td></td><td>দ্বিতীয় পরোক্ষ কারণ : শয়তানের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র
(السبب الثاني غير المباشر لوقوع الشرك: مكاييد الشيطان)</td></tr>
<tr><td></td><td>মুসলিমদের শির্কে লিপ্ত হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণসমূহ
(الأسباب المباشرة لوقوع المسلمين في الشرك)</td></tr>
<tr><td></td><td>প্রথম কারণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অলিগণের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন</td></tr>
<tr><td></td><td>রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর নিজ গৃহে দেয়ার কারণ</td></tr>
</table>

	মানুষকে সম্মান করা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ধরন
	দ্বিতীয় কারণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং ওলিগণ কে বৈশিষ্ট্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা
	তৃতীয় কারণ : বস্তুর সাথে কল্যাণ ও অকল্যাণের সম্পর্ককরণ
	চতুর্থ কারণ : নিম্ন জগতের উপর উর্ধ্বজগতের গ্রহ ও নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী হওয়া
	পঞ্চম কারণ : আল্লাহর উপাসনায় ওলিগণ কে শরীক করা
	ষষ্ট কারণ : ওলিগণ কে আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ও শাফা'আকারী হিসেবে মনে করা
	সপ্তম কারণ : পীর ও মুরববীদের কথা-বার্তা ও হেদায়তী বাণীসমূহের অন্ধ অনুসরণ করা
	অষ্টম কারণ : ইমামগণের ইজতেহাদী উক্তি সমূহ পালনের ক্ষেত্রে শরী'আতের সীমালঙ্ঘন করা
	নবম কারণ : দো'আ করার সময় ওসীলা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা

	দশম কারণ : অলিগণের শাফা‘আত সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করা
	একাদশ কারণ : অলিগণের নিকট কল্যাণ কামনা ও তাঁদের অকল্যাণের গোপন ভয় করা
	দ্বাদশ কারণ : কবরের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা
	ত্রয়োদশ কারণ : রাজনৈতিক নেতাদের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা
	চতুর্দশ কারণ : কোনো কোন রোগ নিজেই সংক্রমিত হয় বলে মনে করা
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	ওলিগণ কি মানুষ ও আল্লাহর মাঝে ওসীলা বা মধ্যস্থতাকারী?
	মানুষের জীবনের ইহলৌকিক সমস্যা ও তা সমাধানের মাধ্যম
	পরকালীন সমস্যা সমাধানের মাধ্যম
	জ্ঞানী ও সৎমানুষদের সহচর্য গ্রহণ (صحبة العلماء و الصالحين)
	কুরআনে বর্ণিত ওসীলা শব্দের অপব্যাখ্যা

	(التفسير الخاطئ لمعنى الوسيلة)
	ওসীলার মূলকথা (حقيقة الوسيلة)
	আল্লাহর নিকট কোনো মানুষের নাম বা মর্যাদার ওসীলায় কিছু চাওয়া যায় না
	জীবিত মানুষের দো‘আর ওসীলা গ্রহণ (الوسيلة بدعاء الحي)
	কারো নামের ওসীলায় দো‘আ করা বেদ‘আত
	দো‘আ কবুলের সম্ভাব্য সময় ও মুহূর্ত
	আল্লাহ তা‘আলার নিকট কিছু চাওয়ার বৈধ ওসীলার প্রকারভেদ (أنواع الوسائل المشروعة)
	প্রথম পন্থা : আল্লাহ তা‘আলার সুন্দর নামাবলী ও সুমহান গুণাবলীর ওসীলায় দো‘আ করা (التوسل إلى الله بأسماءه الحسنى وصفاته العلى)
	দ্বিতীয় পন্থা : আল্লাহর তাওহীদ ও ঈমানের রুকনসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের ওসীলায় দো‘আ করা (التوسل إلى الله بالإيمان بأركان الإيمان)

	তৃতীয় পন্থা : আল্লাহর নিকট বিপদ ও দুঃখের কথা বলে নিজের অপারগতা ও দুর্বলতা প্রকাশের ওসীলায় দো‘আ করা (التوسل إلى الله بذكر ما أصيب الإنسان من الأضرار)
	চতুর্থ পন্থা: নিজের অপরাধ স্বীকার করার ওসীলায় দো‘আ করা (التوسل إلى الله باعتراف الذنوب)
	পঞ্চম পন্থা : কোনো সৎকর্মের ওসীলায় দো‘আ করা (التوسل إلى الله بذكر الأعمال الصالحة)
	ষষ্ঠ পন্থা : জীবিত মানুষের দো‘আর ওসীলায় আল্লাহর নিকট কিছু কামনা করা (التوسل إلى الله بدعاء الحي الصالح)
	ওসীলা করার অবৈধ পন্থা (الوسائل الغير المشروعة للوسيلة)
	কারো বিশেষ মর্যাদা কাউকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না
	কারো বিশেষ মর্যাদার ওসীলায় আখেরাতে কেউ

	বিপদ থেকে রক্ষা পাবেনা
	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার ওসীলায় দো'আ করা বৈধ বলা সম্পর্কিত কতিপয় দলীল ও এর খণ্ডন
	আল্লাহর উপর কারো কোনো অধিকার নেই
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	পার্থিব ও পরকালীন বিষয়ে অলিগণের শাফা'আত (المبحث الثالث: شفاعة الأولياء في الأمور الدنيوية والأخروية)
	শাফা'আত সম্পর্কে আরবের মুশরিক ও খ্রিস্টানদেরকে শয়তানের দেয়া ধারণা
	অলিগণের শাফা'আত সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে শয়তানের দেয়া ধারণা
	কোন কোনো শরী'আতী পীরদের দৃষ্টিতে শাফা'আত
	কোনো মানুষই নিজেকে সৎ মানুষ হওয়ার সনদ দিতে পারে না
	কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাফা'আতের মূলকথা
	দুনিয়াবী বিষয়ে পরস্পরের নিকট শাফা'আত করা

	বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ
	দুনিয়াবী বিষয়ে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত
	আখেরাতে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত (الشفاعة عند الله في يوم القيامة)
	সাধারণ মুশরিক ও মুসলিম মুশরিকরা আখেরাতে যে অবস্থায় হাজির হবে
	কারা আখেরাতে শাফা‘আতের অনুমতি পাবেন
	শাফা‘আতের প্রথম পর্যায় : হাশরের ময়দানে যারা শাফা‘আতের অনুমতি পাবেন
	শাফা‘আতের দ্বিতীয় পর্যায় : জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশের পর যারা শাফা‘আতের অনুমতি পাবেন জাহান্নামীদের জন্য ফেরেশতা, নবী ও মু’মিনদের শাফা‘আত
	সাধারণ মু’মিনরগণও শাফা‘আত করবে
	যারা কারো শাফা‘আত পাবে না
	আখেরাতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা‘আতের সংখ্যা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ	সাধারণ মুসলিমদেরকে শির্কে পতিত করানোর ক্ষেত্রে শয়তানের বিভিন্ন অপকৌশল (المبحث الرابع: مكاييد الشيطان و حيله لإيقاع عامة المسلمين في الشرك)
	প্রথম অপকৌশল : কোনো কবরে কারো প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া
	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কারো কোনো উপকার করতে পারেন না
	ওলিগণ কারো উপকার করতে না পারার প্রমাণ
	দ্বিতীয় অপকৌশল : বেলায়তের দাবীদারদের দ্বারা কিছু তেলেশমাতী প্রকাশ
	মানুষের ঘাড়ে শয়তানের সওয়ার হওয়ার প্রমাণ
	আল্লাহ ও রাসূলকে কারা সপ্নে দেখতে পারেন ?
	খিযির আলাইহিস সালাম-এর সাক্ষাৎ
	প্রকৃত ওলির পরিচয়
	তৃতীয় অপকৌশল : ওলিগণ মানুষের আহ্বান শ্রবণ করতে পারেন বলে ধারণা প্রদান (الحيلة الثالثة:إنه أفهم الناس أن الأولياء يسمعون

	دعاء الناس من البعيد)
	মানুষ মরে না ইন্তেকাল করে (هل يموت الناس أو ينتقل)?
	মৃত্যুর পর মানুষের রূহ কোথায় যায়?
	মৃত মানুষের শ্রবণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য
	দেহে প্রাণ থাকলেই কেবল সকল জীব শ্রবণ করতে পারে
	মৃতদের বিশেষ মুহূর্তে শ্রবণ (سماع الموتى في وقت خاص)
উপসংহার	
গ্রন্থপঞ্জী	

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমদের মাঝে শির্কের বহিঃপ্রকাশ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে জনগণ কর্তৃক তা গ্রহণের ধরন ও প্রকৃতি

বাংলাদেশের মুসলিমদের মাঝে শির্কের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কে অবগত হওয়ার বিষয়টি অনেকটা এ দেশে ইসলাম প্রবেশকালীন সময়ে এখানকার মানুষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং জনগণ কর্তৃক তা গ্রহণ করার ধরণ ও প্রকৃতি অবগত হওয়ার উপরে নির্ভরশীল। সে জন্য নিম্নে উপর্যুক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করা হলো।

বাংলাদেশে ইসলাম আগমনের প্রাক্কালে এখানকার ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা

বর্তমান বাংলাদেশ নামের স্বাধীন ও সার্বভৌম এ দেশটি অতীতে ভারত উপমহাদেশের একটি অংশ ছিল। ১৭৫৭ সালে এদেশে

ইংরেজদের ঔপনিবেশিক শাসন পাকাপোক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত এখানে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর ১৯৪৭ সালে তা পাকিস্তানের অংশ হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান নামে ইংরেজদের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এর পর ১৯৭১ সালে তা পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। বর্তমানে জনসংখ্যার দিক থেকে এ দেশটি বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে। এদেশটি পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে হিন্দু প্রধান দেশ ভারতের দ্বারা বেষ্টিত। এর দক্ষিণে রয়েছে মায়ানমার ও বঙ্গোপসাগর। এর আয়তন হচ্ছে ৫৫৫৯৮ বর্গ মাইল। এর জনসংখ্যার প্রায় ৯০% মুসলিম। সুদূর অতীত কাল থেকেই এ দেশের মানুষ মানব রচিত বিভিন্ন ধর্মে দীক্ষিত ছিল। এ সব ধর্মের মধ্যে বহুল প্রচলিত ধর্ম ছিল হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম। তারা এ দু'টি ধর্মের বিভিন্ন রাজা-বাদশা এবং উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু ব্রাহ্মণদের দ্বারা সর্বদাই নির্যাতিত ও শোষিত ছিল। এ ছাড়াও সাধারণ লোকেরা হিন্দু ধর্মের বর্ণ বৈষম্য ও সামাজিক বিভিন্ন নিয়ম কানুনের দ্বারা নিপীড়িত ও অত্যাচারিত ছিল। ঠিক এমনই এক যুগ সন্ধিক্ষণ ও পরিবেশে এদেশে ইসলামের শুভাগমন ঘটে। হিজরী প্রথম শতকে যদিও কোনো কোনো আরব বণিকদের মাধ্যমে এদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে ইসলামের আগমন ঘটেছে বলে প্রমাণ পাওয়া

যায়,[1] তবে খ্রিষ্টাব্দ অষ্টম ও নবম শতকেই এদেশে ইসলাম প্রবেশ করেছে বিপুল সমারোহে। বণিকগণ চট্রগ্রামের তৎকালীন সামুদ্রিক বন্দর দিয়ে সে এলাকায় প্রবেশ করেছিলেন এবং সেখানে তারা নিজেদের জন্য একটি উপনিবেশ তৈরী করে সেখান থেকেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। এমনকি ১৭২ হিজরী সনে খলীফা হারুনুর রশীদের শাসনামলে তারা নদী পথে বর্তমান রাজশাহী জেলার পাহাড়পুর অঞ্চলেও পৌঁছেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।[2] তাদের সততা, ন্যায়পরায়ণতা ও দাওয়াতে এদেশের সাধারণ জনগণ প্রভাবিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তবে সে সময়ে যারা এ সব এলাকায় এসে ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম চালিয়েছিলেন, আজ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট করে তাদের কারোরই নাম জানা সম্ভবপর হয় নি। এরপর খ্রিষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর এ সুদীর্ঘ সময়ে এ দেশের

---

[1]. কুড়িগ্রাম জেলায় প্রত্নতাত্বিক খনন কাজ চালিয়ে মাটির নিচে একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। যার ইটের গায়ে কালেমায়ে তাইয়্যিবাহ ও হিজরী ৬৯ সালের বর্ণনা রয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হিজরী প্রথম শতকেই আরব বণিকদের দ্বারা এদেশে ইসলামের শুভাগমন ঘটেছিল। দেখুন : গোলাম সাকলায়েন, বাংলাদেশের সূফী সাধক; (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), পৃ. ৩। সংক্ষিপ্তাকারে।

[2]. আব্দুল মান্নাম তালিব, **বাংলাদেশে ইসলাম;** (ঢাকা : আধুনিক প্রকাশনী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮০ খ্রি.), পৃ. ৫৬।

বিভিন্ন অঞ্চলে তৎকালীন ইসলামী দেশসমূহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষত আরব, ইয়ামন, ইরান, খুরাসান ও এশিয়া মাইনরের মধ্যাঞ্চল এবং উত্তর ভারত থেকে বহু আলিমে দ্বীন ও ওলিগণ এ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন যুগে ধারাবাহিকভাবে ইসলাম প্রচারের জন্য আগমন করেছিলেন।[3] এ দীর্ঘ সময়ে ইসলাম প্রচারের এ যুগটিকে মোট তিন যুগে বিভক্ত করা যায় :

১. প্রাথমিক যুগ বা শৈশবকাল : খ্রিষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ যুগটি বিস্তৃত ছিল।

২. যৌবন কাল : খ্রিষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগটি বিস্তৃত ছিল।

৩. পতনের যুগ : খ্রিষ্টাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত এ যুগে বিভিন্ন কারণে ইসলামের প্রচার ও প্রসার দুর্বল হয়ে পড়ে।

---

[3]. তদেব; ৬৩।

তাঁদের ইসলাম প্রচারের পদ্ধতি :

এ তিন যুগের ইসলাম প্রচারকগণ তাঁদের কর্মের পদ্ধতিগত দিক থেকে দু'ভাগে বিভক্ত ছিলেন। তাঁদের একদল 'আবেদ' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা যুদ্ধের পথ পরিহার করে নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ পন্থায় জনগণকে ইসলামের পথে আহ্বান জানাতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের মাঝে রয়েছেন শাহ সুলতান বলখী, যিনি প্রারম্ভে ঢাকার হরিরামপুরে এবং পরে ৪৩৯ হিজরীতে বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে এসে ইসলাম প্রচার করেন। এ নীতির উল্ল্যেখযোগ্যদের মধ্যে আরো রয়েছেন শাহ মুহাম্মদ সুলতান রুমী, যিনি ৪৪৫হিঃ/১০৫০ সালে বর্তমান নেত্রকোনা জেলার 'মদনপুর' এলাকায় ইসলাম প্রচার করেন। মুঘল সম্রাট শাহ জাহানের আমলে ১০৮২/১৬৭১ সালে তাঁর নির্দেশে সেখানে তাঁর কবর নির্মাণ করা হয়।

এঁদের মধ্যে আরো রয়েছেন শেখ জালাল উদ্দিন তবরেযী, যিনি বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা লাভের পর এ দেশে আগমন করেছিলেন এবং ৬২২হিঃ/১২২৫ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এঁদের মধ্যে আরো রয়েছেন শাহ নেয়ামত উল্লাহ (মৃত

১০৭৫হিঃ/১৬৬৪ খ্রি.) এবং শেখ ফরীদ উদ্দিন ও অন্যান্য বহু দরবেশগণ।[4]

ইসলাম প্রচারকদের দ্বিতীয় দল 'গাযী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁরা ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে প্রয়োজনে যুদ্ধের পথ অবলম্বন করেছিলেন। তাঁদের মাঝে উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন :

'বাবা আদম শাহী' যিনি **১১৫৭-১১৭৯** সালের মধ্যে তৎকালীন হিন্দু রাজা 'বলরাম সেন'-এর আমলে ঢাকার 'বিক্রমপুর' এলাকায় এসে ইসলাম প্রচার করেন।

---

[4]. শেখ ফরীদ উদ্দিন বর্তমান ফরিদপুর জেলায় আগত প্রখ্যাত 'আবিদগণের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর আগমনের সঠিক তারিখ জানা যায় নি। বলা হয়ে থাকে যে, তাঁর নামের সাথে সম্পর্ক রেখে পরবর্তীতে ফরিদপুর জেলার নামকরণ করা হয়। এ আবিদের নামে ফরিদপুর জেলার কালেক্টরেট ভবনের নিকটবর্তী এলাকায় যশোর বোর্ডের নিকটতম একটি গাছের নিচে একটি দরগাহ রয়েছে। **গোলাম ছাকলায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯৮।**

তন্মধ্যে আরো রয়েছেন : 'মাখদুম শাহ দৌলা শহীদ' যিনি খ্রিষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পাবনা জেলার 'শাহজাদপুর' এলাকায় আগমন করেছিলেন।

আরো রয়েছেন : 'শাহ তুরকান শহীদ' যিনি তৎকালীন বাংলাদেশে মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গাযী হিসেবে বগুড়া জেলায় আগমন করেছিলেন।

আরো রয়েছেন : 'সৈয়দ আহমদ কাল্লা শহীদ', উলূগই আ'জম জা'ফর খাঁন গাযী (মৃত- ৭১৩হি), শাহ জালাল (মৃত ৯৭০হি:/১৫৬২ খ্রি.) এবং অন্যান্য গাজীগণ।[5]

এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে আগত এ সকল 'আবিদ, যাহিদ (দুনিয়া বিরাগী) আলেম ও গাযীদের সততা, নিষ্ঠা ও চরিত্র মাধুর্যতা এবং তাঁদের দ্বারা প্রকাশিত কারামতসমূহ (অলৌকিক কার্যকলাপ) পর্যবেক্ষণ করে এ দেশের সাধারণ লোকেরা প্রভাবিত হয়ে দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল।

---

[5]. তদেব; পৃ. ৩৫; পীর চেহেল গাজী; **(স্থান বিহীন: ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮ খ্রি.)** পৃ.।

জনগণের ইসলাম গ্রহণের ধরণ ও প্রকৃতি:

জনগণের ইসলাম গ্রহণের অবস্থাকে বিচার ও বিশ্লেষণ করলে তাদেরকে দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। তাদের প্রথম ভাগে রয়েছেন এমন সব লোকেরা যারা ইসলামকে ভাল করে বুঝে-শুনে, অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করে তা একটি সত্য ও সঠিক ধর্ম হিসেবে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেই তাতে প্রবেশ করেছিলেন এবং এর সাথে সাথে তারা তাদের অতীত ধর্মের যাবতীয় শির্কী বিশ্বাস ও ধর্মীয় কুসংস্কার সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে তাওহীদী চিন্তা ও চেতনায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ভাগে রয়েছেন এমন সব লোক যারা তাদের অতীত ধর্মের বিবিধ বিশ্বাসের উপর বহাল থেকে শুধুমাত্র সে-সব বিশ্বাসের নাম পরিবর্তন করে ইসলামে প্রবেশ করেছিলেন। তাদের পরিবর্তিত বিশ্বাসের মধ্যে ছিল- ব্রহ্মা দেবতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকৃতিতে অবতার হয়েছেন এবং বিষ্ণু দেবতা রাসূল রূপে আবির্ভূত হয়েছেন।[6]

[6]. গোলাম ছাকালায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৬; মোহর আলী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪।

সে সময়ে ভারত উপ-মহাদেশের সাধারণ মানুষের ইসলাম গ্রহণের প্রকৃতি বর্ণনা প্রসংগে গোপাল হালদার বলেন : **“আর ইহাও আমরা জানি যে, এই নতুন ইসলামকে জনসাধারণ স্বভাবতই তাহাদের পূর্ব পরিচিত জিনিষের আঁধারে ঢালিয়া সাজাইতেছিল। নিরঞ্জন হইতেছিলেন আল্লাহ, বৌদ্ধ দেবতারা হইতেছিলেন মুসলিমদের পীর, স্তুপ হইতেছিল দরগাহ, পুরাতন দেবলীলার কাহিনী নতুন পীরের কেচ্ছায় পরিণত হইতেছিল।... ইহাই ছিল ভারতীয় ইসলামের একটা জনগ্রাহ্য রূপ।”**[7]

এ ধরনের মুসলিমরা নতুন জীবনের, নতুন চেতনার, নতুন সংস্কৃতির, নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টিতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোর পথে চলার পরিবর্তে শুধুমাত্র লেবাছ পরিবর্তন করেছিল। প্রার্থনার স্থান ও ভাষা পরিবর্তন করেছিল। হিন্দু নামের পরিবর্তে মুসলিম নাম রেখেছিল মাত্র। ধুতি ছেড়ে লুঙ্গি পরেছিল, উত্তরীয় রেখে টুপি নিয়েছিল, জলের বদলে পানি বলেছিল, মন্দিরের পরিবর্তে

---

[7]. গোলাম ছাকালায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩-১৪; এ. এইচ. এম শামসুর রহমান, আপন গৃহে অপরিচিত; (খুলনা : জাহান প্রিন্টিং প্রেস, ১ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.), প্রবন্ধ : **“সংস্কৃতির রূপান্তর না শির্ক-বিদ‘আতের নামান্তর”**, পৃ. ৭; গোপাল হালদার রচিত **“সংস্কৃতির রূপান্তর”** গ্রন্থের পৃ. ১৯৮।

মসজিদে এসেছিল, শশ্মানের পরিবর্তে গোরস্থানে এসেছিল। ব্যস এ পর্যন্তই। তাওহীদের মর্মকথা, আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও তাওহীদ, তার অস্তিত্ব, ক্ষমতা, সৃষ্টি ও স্রষ্টার মাঝে ব্যবধান কী, এ সব তারা জানতে পারে নি। ফলে তারা আল্লাহ ও ভগবানের মধ্যে কী তফাৎ রয়েছে তা জানতে পারে নি। পার্থক্য এটুকু ছিল যে, পূর্বে তারা রাম মূর্তির কাছে ধর্ণা দিতো, এখন তারা মুসলিমের মৃত ওলি আওলিয়ার কবরে হাঁটুগেড়ে মাথা লুটিয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলো।

সে কালের মুসলিমরা যে ইসলামকে হিন্দু সংস্কৃতির আঁধারে ঢেলে সাজিয়েছিল, তা সে সময়কার বিভিন্ন কবি ও সাহিত্যিকদের লেখনীর মাঝেও প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল।[8] তারা মক্কা ও মদীনাকে ঠাকুর জগন্নাথ ও কাশীধ্যামের সাথে তুলনা করতেও দ্বিধাবোধ করে নি।[9] তারা কর্মের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা আর

---

[8]. দেখুন : প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলিমদের অবদান; পৃ. ৮২। তাতে একটি কবিতা রয়েছে, যাতে আল্লাহকে ইশ্বর, আদমকে অনাদি নর, মা হাওয়াকে কালী, রাসূলকে চৈতন্য, খোআজ খিজিরকে বাসুদেব, কুরআনকে পুরান আর পীরদেরকে হিন্দুদের গুরুজনদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

[9]. দেখুন কবি মোহাম্মদ আকবর (জন্ম ১৬৫৭ খ্রি.), পুথিকাব্য; পৃ. ৮৫। মুহাম্মদ ইউনুছ রচিত “চৌধুরী লড়াই” গীতির বন্দনায় তা বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীবিষ্ণু বলাকে একই মনে করতেন। এমনকি আল্লাহ, রাম ও রহীম এ দু'অংশে বিভক্ত বলেও বিশ্বাস করতেন।[10]

সে সময়কার সাধারণ মুসলিমদের চিন্তা, চেতনা ও কর্মকাণ্ড দেখলে মনে হয় তারা মুসলিম হয়েছিল ঠিকই, তবে কেনইবা তারা মুসলিম হলো, ইসলামী সংস্কৃতি আর হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কৃতির মাঝে তফাৎটা কোথায়, তা তারা বুঝে উঠতে পারেন নি। অতীতে তারা যেমন তাদের দেব-দেবীদেরকে তাদের এবং ভগবানের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী এবং বিভিন্ন রকমের কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক বলে ভাবতো, মুসলিম হয়েও তেমনি তারা মুসলিম ওলি ও দরবেশদেরকে সে সব কিছুর মালিক বলে ভাবলো। এ অবস্থা শুধু যে মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের মাঝেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, বরং এ অবস্থা তৎকালীন সকল মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ডেও বিস্তৃত ছিল। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন :

---

[10]. 'নূরন্নেহর ও কবির কথা' গীতি কাব্যে রয়েছে : ''বিসমিল্লাহ ও শ্রী বিষ্ণু একই কথা। আল্লাহ দু'অংশে বিভক্ত হইয়া রাম ও রহীম হইয়াছেন''। দেখুন : **আপন গৃহে অপরিচিত**; প্রবন্ধ : সংস্কৃতির রূপান্তর না শির্ক-বিদ'আতের নামান্তর; পৃ. ৬।

“হিন্দু ধর্ম সংস্কৃতিকে এইভাবে আদর্শরূপে গ্রহণ করার এবং এই আদর্শের ছাঁচে নিজেকে গড়ে তোলার এই প্রবণতা শুধুমাত্র কবি, সাহিত্যিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই, মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সর্বস্তরে ইহা সঞ্চারিত ও উত্তরোত্তর প্রসার লাভ করিয়া চলিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে জলদেবতা বরুণ পীর বদরে, গৌরচন্দ্র গোরচাঁদ পীরে, ওলাই চন্দ্রী-ওলাবিবিতে, সত্যনারায়ণ সত্যপীরে, লক্ষীদেবী মা বরকতে রূপান্তরিত হন। আর এই রূপান্তরিত দেবদেবীগণ মুসলিমদের নিকট তাহাদের প্রাপ্য পূজা ও শ্রদ্ধা অব্যাহতভাবেই পাইতে থাকেন। তদুপরি এই সমস্ত রূপান্তরিত দেবতা বা পীর ছাড়াও বহু পীরের কল্পিত কবর এবং কোনো কবরের সহিত সম্পর্ক রহিত কল্পিত পীরও মুসলিমদের নিকট হইতে পূজা, উৎসর্গ, সিন্নি, মোমবাতি ইত্যাদি লাভ করতে থাকেন। অনেক খানকাহ ও দরগাহ এখানে মুসলিমদের সুখ সমৃদ্ধি এবং বিপদ আপদ হইতে উদ্ধার লাভের উপলক্ষ্যরূপে দীর্ঘকাল তাহাদের

আল্লাহর স্থান দখলকারীর ভূমিকায় এবং আংশিকভাবে অদ্যাবধি সেই স্থানই তারা দখল করিয়া আছে।"[11]

এ তো হলো সাধারণ মুসলিমদের অবস্থা। অপর পক্ষে যারা ইসলামকে একটু বুঝে শুনে সঠিকভাবে ঈমান এনেছিলেন, তাদের ব্যাপারে আমাদের হাতে এমন কোনো দলীল প্রমাণাদি নেই যা এ কথা প্রমাণ করে যে, তারা তাওহীদকে এর প্রকারাদিসহ এবং শির্ককে এর কারণসমূহসহ জেনেছিলেন। আমরা যদি ধরে নেই যে, তারা এ সব বিস্তারিতভাবে জেনেছিলেন, তথাপি এ কথা উড়িয়ে দেয়া যায় না যে, শয়তান তাদের কারো মাঝে বাহ্যিক দৃষ্টিতে ভাল অথচ প্রকৃত অর্থে মন্দ এমন সব ধ্যান-ধারণা ও কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে দিয়েছিল, যেমনটি সে মানব জাতির পথ ভ্রষ্টতার উষালগ্নে ওয়াদ্দ, সুয়া', ইয়াগুস, ইয়া'উক ও নছর এর অনুসারীদের প্রতি এ সব ছড়িয়ে দিয়েছিল।

শয়তান অত্যন্ত সন্তর্পণে তাদের মাঝে তা ছড়িয়ে না দিয়ে পারে কেমন করে? যেখানে সে তা ভারতের মুসলিম জনপদের

[11]. মাওলানা আকরম খাঁ, **মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস;** (ঢাকা : আজাদ অফিস, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৫ খ্রি.), পৃ.৮৬।

মধ্যে এখানে ইসলাম প্রচারিত হওয়ার পূর্বেই অতি সন্তর্পণে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। আর সে কারণেই আমরা মুজাদ্দিদে আলফে ছানী আল্লামা শেখ আমহদ ছরহিন্দী (রহ.)-কে (১৫৬৮-১৬২৪ খ্রি.) সে সবের প্রতিবাদ করতে দেখতে পাই। তিনি তৎকালীন ভারতের মুসলিমদের মাঝে, বিশেষ করে তাদের মধ্যকার সূফীদের অনুসারী ও মোগল সরকারের দরবারী আলিমদের মাঝে যে সকল শির্ক, বেদ‘আত ও ধর্মাদ্রোহী কর্মকাণ্ড বিস্তার লাভ করেছিল, সেগুলোর বিরুদ্ধে সংস্কারমূলক আন্দোলন গড়ে তোলেছিলেন, যার জন্যে তাঁকে হিজরী দ্বিতীয় সহস্রের মহান সংস্কারক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।[12] সম্রাট জাহাঙ্গীর এর দরবারে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী তাকে সেজদা না করার কারণে তিনি কারাবন্দী পর্যন্ত হয়েছিলেন। কারাগারে বসে তিনি তাঁর সংস্কারমূলক কর্ম চালিয়ে যাওয়ার ফলে এর সুদূর প্রসারী প্রভাব দেখে জেল কর্তৃপক্ষ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট এ মর্মে রিপোর্ট পেশ করতে বাধ্য হয়েছিল যে, “এ ব্যক্তির সংস্কারমূলক আহ্বানের প্রভাবে জেলখানার পশুসুলভ আচরণের

[12]. তদেব; পৃ. ১৬৭।

মানুষগুলো মানুষে রূপান্তরিত হতে শুরু করেছে এবং সেখানকার মানুষগুলো ফেরেশতায় পরিণত হতে শুরু করেছে।"[13] তাঁর এবং তাঁর এ সংস্কারমূলক আন্দোলনের ব্যাপারে বলা হয়ে থাকে যে, "সে সময়ে যদি শেখ আহমদ ছরহিন্দীর শুভাগমন না হতো, তা হলে প্রায় তিন শতাব্দী পূর্বেই ভারতের মাটি থেকে ইসলামের নাম ও এর নিদর্শন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো।"[14]

এ প্রসঙ্গে মাওলানা আকরম খাঁ বলেন : "শেখ আহমদ ছরহিন্দী যে সংস্কারমূলক আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন শেষ পর্যায়ে এসে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি:) ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা যে সংস্কারমূলক আন্দোলন দাঁড় করেছিলেন, সে আন্দোলনের সাথে তা একীভূত হয়ে যায়। কালের পরিক্রমায় এই দুই সংস্কারকের যাবতীয় প্রচেষ্টা 'রায়ব্রেলভী' এর প্রখ্যাত মুজাহিদ পরিবারের সাথে এসে মিলে যায়। সৈয়দ আহমদই হলেন মুজাহিদ পরিবারের প্রথম ব্যক্তি যিনি ভারত উপমহাদেশে ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা।

---

[13]. তদেব; পৃ. ১৪৮।

[14]. তদেব; পৃ. ১৪৯।

উল্লেখ্য যে, সৈয়দ আহমদের ভারতের মুসলিমদের স্বাধীনতা ও সংস্কারমূলক আন্দোলনের পিছনে একক লক্ষ্য ছিল মুসলিম রাজশক্তির বিনাশ এবং অমুসলিম রাজশক্তির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র মুসলিম ভারতের জাতীয় জীবন স্বাভাবিকভাবে যে সব মারাত্মক অভিশাপে আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল তাথেকে ভারতের মুসলিম জাতিকে উদ্ধার করা। নওয়াব সুলায়মান জাহকে লেখা এক পত্রের মাধ্যমেও তাঁর এ উদ্দেশ্য ফুটে উঠেছে। সে পত্রে তিনি বলেন : ভাগ্যক্রমে এই দেশের শাসন ও রাজত্বের অবস্থা কিছুদিন হতে এরূপ হয়ে দাড়িয়েছে যে, খ্রিষ্টান ও হিন্দুগণ হিন্দুস্থানের অধিকাংশ অঞ্চলের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছে এবং ঐ অঞ্চলগুলোকে অত্যাচারে, অবিচারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে। ঐসব অঞ্চলে শির্ক ও কুফরের রীতিনীতি প্রবল হয়ে উঠেছে এবং ইসলামের অনুষ্ঠানগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এ পরিস্থিতি লক্ষ্য করে আমার অন্তর দুঃখে ও বেদনায় অভিভুত হয়ে পড়েছে, হিজরতের আগ্রহে আমার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠে, ঈমানের অভিমান আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তুলে এবং

জেহাদ প্রবর্তনের আগ্রহে আমার মস্তক আলোড়িত হতে থাকে।”[15]

ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থার অবনতি :

তৎকালীন ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থার অধঃপতন এখানেই শেষ নয়। আমাদের নিকট যথেষ্ট পরিমাণ এমনও তথ্য প্রমাণ রয়েছে যা এ কথারই প্রমাণ বহন করে যে, সৈয়দ আহমদ শহীদ এর যুগে ভারত ও বাংলার মুসলিমগণ শুধুমাত্র নাম সর্বস্ব মুসলিম ছিলেন। তারা বিশ্বাস ও কর্মে হিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় সেখানে যদি সৈয়দ আহমদ শহীদ এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ ও তাঁদের সহযোগীদের পক্ষ থেকে সংস্কারমূলক আন্দোলন না হতো, তা হলে হয়তো বা ভারত উপমহাদেশে ইসলামের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না। এ সব তথ্য প্রমাণের মধ্য থেকে নিম্নে জার্মানীর বিশিষ্ট ঐতিহাসিক Hans Kohn এর “A History of Nationalism in the East” গ্রন্থ হতে সাধারণ পাঠকদের

[15]. তদেব; পৃ. ১৫২।

সুবিধার্থে তাঁর কিছু কথার অনুবাদ তুলে ধরা হলো। তিনি ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থা এবং ওয়াহাবী আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও এর প্রভাব সম্পর্কে বলেন :

"আফ্রিকার মত ভারত এবং সুমাত্রায়ও ওয়াহাবী আন্দোলন মুসলিমদের মধ্যে একটা উদ্দীপনাময়ী ও প্রাণ সঞ্চারক শক্তি হয়ে পড়ল এবং অস্থায়ীভাবে হলেও মুসলিম ধর্মীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলো। এই রাষ্ট্রের লক্ষ্য ছিল ইসলামের প্রথম যুগের ঐতিহ্যে ফিরে যাওয়া। তা ইউরোপীয় প্রভাবের বিরোধী ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ভারতে ওয়াহাবীদের নেতা ছিলেন সৈয়দ আহমদ ও হাজী মৌলভী মুহাম্মদ ইসমাঈল। মক্কায় হজ করতে গিয়ে তাঁরা ওয়াহাবীদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁরা ভারতীয় মুসলিমদের ধর্মীয় কলুষপরায়ণতা এবং হিন্দু রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের সাথে মুসলিম রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের মিশ্রণ দেখে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন। তাঁরা ওয়াহাবী আদর্শে ভারতে ইসলামের সংস্কার সাধনে নিজেদের উৎসর্গ করবেন বলে সঙ্কল্প করেছিলেন। তৎকালে অনেক লোক বিশেষ করে ভারতে শুধু নামে মাত্র মুসলিম ছিল। তারা হিন্দুদের

রীতিনীতি মেনে চলতো। তাদের পর্ব-পার্বনের অনুষ্ঠান করতো। বিবাহ-শাদী ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ব্যাপারে তারা তাদের আইন-কানুন মেনে চলতো এবং তাদের বহু দেব-দেবীর উপাসনা করতো। ওয়াহাবীদের প্রচেষ্টায় এ সবের পরিবর্তন হতে লাগলো। ইসলামকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা হলো। ইসলামের প্রথম যুগের পবিত্র-নৈতিক দৃঢ়তা ফিরিয়ে আনা হলো এবং শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হলো...”।[16]

তৎকালীন ভারতীয় ও বাংলাদেশী মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে Lt. Col. U. N. Mukherji Zuvi “A Dying Race” গ্রন্থে যা লিখেছেন তাথেকেও কিছু কথা অনুবাদ করে নিম্নে বর্ণনা করা হলো। তিনি বলেন :

“পঁচাত্তর বছর আগে একজন মুসলিম কৃষক ও একজন হিন্দু কৃষকের মধ্যে সামান্যই তফাৎ ছিল। শুধু নাম ছাড়া মুসলিম কৃষক ও হিন্দুদের মধ্যে অধঃপতিত জাতের লোকের পার্থক্য করার আর কিছু ছিল না। প্রকৃতপক্ষে মুসলিমদেরকে হিন্দুদের

[16]. তদেব; পৃ. ১৯১-১৯২; Hans Kohn, A History of Nationalism in the East. p. ১৫।

একটা নীচ জাতি বলে গণ্য করা হতো। তারা সমান অজ্ঞ ও সমান দরিদ্র ছিল। তাদের আচার ব্যবহার, জীবন যাপনের ধরণ ও ধর্মাচরণ একই রকম ছিল।”

তিনি আরো বলেন : “একজন স্থানীয় লেখক দক্ষিণ বাংলার ...উত্তরাঞ্চলের জেলাসমূহের মুসলিম কৃষক সম্প্রদায়ের সাথে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ের অভিজ্ঞতা হতে বলেছেন- প্রতি দশজনের মধ্যে একজনও সামান্য কলেমা পর্যন্ত জানে না, অথচ জ্ঞাতে হোক আর অজ্ঞাতে হোক সর্বদা এই কলেমা পড়া মুসলিমদের একটা অভ্যাসের ব্যাপার। তিনি তাদের এমন একটি সম্প্রদায় বলে বর্ণনা করেছেন যে, যারা নিজেদের ধর্মের কোনো নিয়ম মেনে চলে না, বিধর্মীদের মন্দিরে গিয়ে পূজা করে এবং ইসলাম প্রবর্তক যে-সব রীতিনীতি অতিশয় ঘৃণ্য বলে পরিত্যাগ করেছেন, তারা তা-ই আকড়ে রয়েছে।”

এর পর সবকিছুর যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এ সম্পর্কে হিন্দুও নন মুসলিমও নন এমন একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করাই ভাল। ভারত সরকারের ডিরেক্টর জেনারেল অব ষ্ট্যাটিষ্টিকস্ স্যার

ডব্লিউ. ডব্লিউ. হান্টারের বিবরণকে যথেষ্ট প্রামাণ্য বলে ধরা যায়। উপর্যুক্ত বিষয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

“পঞ্চাশ বছর আগে কথাগুলোর দ্বারা শুধু উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোর নয়, সমগ্র বাংলার মুসলিম কৃষকদের অবস্থা বুঝানো যেতো। শুধু শহরে অথবা মুসলিম আমির ও ওমরাদের প্রাসাদের শান্ত জীবনে এবং তাদের ধর্মস্থানে নিষ্ঠাবান এবং পাণ্ডিত্যসম্পন্ন কতিপয় মৌলভী নিয়মিত ধর্মানুষ্ঠান করতেন। কিন্তু পল্লী এলাকার মুসলিম জনসাধারণ যে অবস্থার মধ্যে ছিল, তা খতনা করা নীচ হিন্দু জাতির বর্ণ শঙ্করের চেয়ে সামান্যই উন্নত ছিল। এরপর ভারতে ধর্মীয় জাগরণের ওই প্রবাহ বাংলার মুসলিমদের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গেল। প্রধানত উত্তরাঞ্চলের পরিব্রাজক প্রচারকগণ জেলা হতে জেলান্তরে গমন করে মুসলিমদের আবার ঈমানের পথে ফিরে আসার আহ্বান জানাতে লাগলেন এবং বেখেয়াল ও অন-অনুতপ্তদের উপর আল্লাহর গজব সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিতে লাগলেন। ফলে বহু সংখ্যক বাঙ্গালী মুসলিম পুরাপুরিভাবে হিন্দুয়ানী ত্যাগ করে শুদ্ধ হলেন এবং প্রাচীন কাল

হতে গ্রামে গ্রামে যে সব আচার অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল তা ত্যাগ করলেন... ।’’[17]

উপরে ভারত ও বাংলার মুসলিমদের ধর্মীয় অবস্থার সংক্ষিপ্ত যে বর্ণনা তুলে ধরা হলো, এথেকে তাদের ধর্মীয় অবস্থার যে কী করুণ দশা হয়েছিল, তারা যে কী পরিমাণ শির্ক, বেদ‘আত ও কুসংস্কারে নিমজ্জিত হয়েছিল, সে সবের একটা অনুমান করা যায়।

উপর্যুক্ত এ সব তথ্য প্রমাণের সাক্ষ্যদাতাগণ বহির্দেশীয় ও অমুসলিম হয়ে থাকলেও আমাদের হাতে স্বদেশীয় মুসলিম মনীষীদের পক্ষ থেকেও এ ধরনের সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে, যা অমুসলিম মনীষীদের উক্ত কথার সত্যতা প্রমাণ করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (১১১৪-১১৭৬হি:) এর কথা বলতে পারি। কালের পরিক্রমায় যে মুসলিমদের মাঝে শির্কী ধ্যান-ধারণা বিস্তারলাভ করেছিল, এর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

“অতঃপর যখন নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবী এবং তাঁর দ্বীন বহনকারীগণ বিদায় হয়ে গেলেন, তখন

---

[17]. মাওলানা আকরম খাঁ, প্রাগুক্ত;১৯৪-১৯৫। তিনি এ কথা গুলো থেকে উদ্ধৃত করেছেন। lt. Col. U. n. Mukherji, A Dying Race; p.৮৯-৯১।

তাঁদের পশ্চাতে এমন সব লোকদের আগমন ঘটলো যারা সালাতকে বিদায় করে দিলো, নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে আরম্ভ করলো। কুরআন ও হাদীসে ব্যবহৃত মুতাশাবেহ (অস্পষ্ট অর্থবোধক) শব্দসমূহকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে লাগলো, যেমন আল্লাহর বন্ধু হওয়া ও তাঁর নিকট শাফা'আত করা- যা আল্লাহ তা'আলা সকল শরী'আতেই কেবল বিশেষ মানুষদের জন্য নির্দিষ্ট করে রেখেছেন- সেটাকে তারা ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করতে লাগলো। অনুরূপভাবে কারো দ্বারা অস্বাভাবিক কিছু ঘটতে বা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাতে দেখলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে তারা (আল্লাহর) জ্ঞান স্থানান্তরিত হয়েছে এবং প্রকৃতি সে লোকের বাধ্য হয়েছে বলে মনে করতে লাগলো ...এ-জাতীয় রোগে যারা আক্রান্ত হয়েছে তাদের রয়েছে বিভিন্ন প্রকার : **কেউবা আল্লাহকে সম্পূর্ণভাবে ভুলে গিয়ে তাদের উপাসনায় লিপ্ত হয়েছে যাদেরকে সে আল্লাহর সমতুল্য বলে জ্ঞান করেছে। এ কারণে তারা তাদের যাবতীয় প্রয়োজন (আল্লাহর বদলে) তাদের কাছেই পেশ করতে রয়েছে। আল্লাহর দিকে তারা মোটেও ফিরে তাকায় না...এদের কেউবা মনে করে আল্লাহ হলেন মূল পরিচালক ও সরদার, তবে কখনও তিনি তাঁর কোনো বান্দাকে মর্যাদা ও উলূহিয়্যাতের**

পোষাক পরিয়ে দেন, তাকে বিশেষ বিশেষ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা তা ব্যবহারের ক্ষমতা দান করেন, তাঁর বান্দাদের অভাব ও অভিযোগ শ্রবণের ক্ষেত্রে তাঁর শাফা'আত শ্রবণ করেন, তাদেরকে রাজা-বাদশাদের প্রতিনিধির মর্যাদা দান করেন, যাদেরকে বাদশাগণ তাঁদের দেশের প্রত্যেক অঞ্চলে প্রেরণ করেন এবং তাঁদেরকে সে এলাকার ছোট ছোট বিষয়াদি পরিচালনার দায়িত্ব দান করেন।...এ ব্যাধি হচ্ছে সকল ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও মুশরিকদের এবং আজ পর্যন্ত যারা দ্বীনে মুহাম্মদী এর অনুসারী অথচ অতিরঞ্জিতকারী ও মুনাফিক তাদেরও রয়েছে এ ব্যাধি।"[18]

তিনি তাঁর সমসাময়িক মুসলিমদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে আরো বলেন :

"মুশরিকদের অবস্থা, তাদের বিশ্বাস ও কর্ম অনুধাবন করতে তোমার অসুবিধা হলে আমার যুগের সাধারণ ও মুর্খদের অবস্থার প্রতি নজর কর, বিশেষ করে তাদের মধ্যকার যারা ইসলামী দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করে বেলায়েতের ব্যাপারে তারা

---

[18]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ; ১/৬১।

কী ধারণা পোষণ করে? অলিগণের বেলায়েতকে স্বীকৃতি দেয়া সত্ত্বেও তারা ধারণা করে যে, এ যুগে কোনো ওলি পাওয়া যাওয়া দুস্কর, তারা ওলিদের কবর ও তাঁদের নিদর্শনের স্থানসমূহে যায় এবং নানাধরনের শির্কী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয়।”[19]

বস্তুতঃ শাহ ওয়ালী উল্লাহ (১১১৪-১১৭৬হি:) তাঁর এ-দু’টি বক্তব্যের দ্বারা পূর্বকাল থেকে আরম্ভ করে তাঁর সময় পর্যন্ত মুসলিমরা যে আক্বীদাগত বিকৃতির কারণে শির্কের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল, সে বিষয়ের দিকেই তিনি ইঙ্গিত করেছেন। আউলিয়া ও দরবেশদেরকে মুসলিমরা কিভাবে আল্লাহর রুবূবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতে শরীক করে নিয়েছিল, সে বিষয়টি তিনি তাঁর এ-দু’টি বক্তব্যের দ্বারা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন।

পূর্ব থেকে শুরু করে শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.)এর সময়কার এক শ্রেণীর মুসলিমদের অবস্থা যদি এই হয়ে থাকে, তবে তৎকালীন বাংলার মুসলিমদের ধর্মীয় আক্বীদা-বিশ্বাসের যে কি করুণ দশা হতে পারে- তা সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ তাদের

---

[19]. শাহ ওয়ালী উল্লাহ, **আল-ফাওযুল কাবীর; (দেওবন্দ : কুতুবখানা হেজায, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), পৃ. ৫১।**

আক্বীদা ও আমলের অবস্থা ধীরে ধীরে বদলে গিয়েছিল এবং ভারত ও অন্যান্য দেশের মুসলিমদের মাঝে যে সকল শির্ক, বেদ‘আত ও কুসংস্কার ছেয়ে গিয়েছিল, তা তাদের মাঝেও সমানভাবে প্রসার লাভ করেছিল। যে সকল সূফী ও সাধকগণ এ দেশে এসেছিলেন তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, কালের পরিক্রমায় সাধারণ মুসলিমগণ তাঁদের কবর ও কবরসমূহকে তাওহীদ বিনাশের একেকটি কেন্দ্রে পরিণত করেছিল।

মুসলিমদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও চারিত্রিক অধঃপতনের যুগে সমগ্র ভারত ও বাংলায় যখন বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এ দেশের মুসলিমদের ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থা নাজুক থেকে নাজুকতর হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে গোলাম সাকলায়েন বলেন :

“বাংলাদেশে বৃটিশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের মধ্যে এখানকার মুসলিমদের ইসলামিক শিক্ষা ও সংস্কৃতির অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল হয়ে যায়, অবস্থা এতই খারাপ হয়ে দাড়ায় যে, মুসলিমদের (দৈনন্দিন) জীবনে নানাবিধ বেদ‘আতী কর্মকাণ্ড ও কুসংস্কার অনুপ্রবেশ করে, মুসলিমরা

হিন্দুদের দেবতাদের নামে মানত এবং কবর, পীর ও কবর পূজা করতে থাকে। গাজী ও ফাতেমার নামে হালুয়া প্রদানসহ অন্যান্য ধর্মাদ্রোহী কর্ম করতে আরম্ভ করে।''[20]

কবর পূজার বিরুদ্ধে আন্দোলন :

এ দেশের মুসলিমদের এ হেন অবস্থা দৃশ্যে হাজী শরী'আত উল্লাহই (মৃত ১২৬৭হি:/১৮৫০খ্রি.) হলেন প্রথম ব্যক্তিত্ব যিনি পীর ও কবর পূজার বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। জনগণকে তিনি তাঁর আন্দোলনের দ্বারা দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় বিষয়াদি (فرائض الدين) সম্পর্কে জ্ঞান দান করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর এ আন্দোলন 'ফারায়েযী আন্দোলন' নামে পরিচিতি লাভ করেছিল।[21] তাঁর এ আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জেমস টেইলর বলেন :

''হাজী শরী'আত উল্লাহ পীর ও কবর পূজা এবং গাজী, ফাতেমা ও অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে হালুয়া দান- এ জাতীয় যে সকল

---

[20]. গোলাম ছাকালায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০২।

[21]. গোলাম ছাকালায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০১।

কর্মের সাথে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির কোনই সম্পর্ক নেই এ সবের বিরুদ্ধে তাঁর যাবতীয় প্রচেষ্টা ব্যয় করেন।”[22]

ভারত, বাংলাদেশ ও অন্যান্য মুসলিম দেশসমূহে এভাবে শির্ক, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতা প্রসারিত হতে থাকায় এক সময় গোটা মুসলিম বিশ্ব থেকে পরিচ্ছন্ন ইসলামই পর্দার অন্তরালে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এ অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লামা আবুল হাসান আলী নদভী[23] বলেছেন :

"وكاد أن يحجب الإسلام النقي حُجُبٌ من الشرك و الجهل والضلالة، طرأت على النظام الديني بِدَعٌ شغلت مكانا واسعا من حياة المسلمين وشغلتهم عن الدين الصحيح وعن الدنيا".

---

[22]. আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০২।

[23]. আল্লামা আবুল হাসান ‘আলী নদভী বিংশ শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠতম বিদ্বান। তিনি সৈয়দ আহমদ শহীদ এর অধঃস্তন বংশধর। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তাঁর লিখিত একশতেরও অধিক গ্রন্থ রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে : الطريق إلى المدينة، النبوة والأنبياءفي القرآن، السيرة النبوية ،وغيرها
তিনিماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمين ’ এই গ্রন্থ লিখে বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯১৪ সালে তিনি জন্ম লাভ করেন এবং ১৯৯৯ সালে মারা যান। দৈনিক সংগ্রাম, ১৯৯৯ খ্রি., ৩১ শে ডিসেম্বর, পৃ. ৩।

“শির্ক, অজ্ঞতা ও পথভ্রষ্টতার বিবিধ নেকাব পরিচ্ছন্ন ইসলামকে আবৃত করে ফেলার উপক্রম হয়েছিল। ধর্মীয় বিধানের উপরে এমন সব বেদ‘আতী কর্মকাণ্ড উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল যা মুসলিমদের জীবনের বিস্তর স্থান দখল করে নিয়েছিল, তাদেরকে সঠিক দ্বীন পালন ও দুনিয়া অর্জন করতেও বিরত রেখেছিল।”[24]

এ প্রসঙ্গে মিসরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ মাহমুদ শালতুত বলেন : “অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মত মুসলিমদের মধ্যেও একটি ভ্রান্ত চিন্তা অনুপ্রবেশ করেছে যে, রাসূলগণ ছাড়াও আল্লাহর বান্দাদের মধ্যকার এমন একদল বান্দাও রয়েছেন যাদেরকে আল্লাহ ইহজগত পরিচালনার দায়িত্ব দান করেছেন। তাঁদেরকে মানুষের দো‘আয় সাড়া দেবার যোগ্যতা দান করেছেন। সকল সৃষ্টিকে তাঁদের প্রতি মুখাপেক্ষী করে এবং বিপদের সময় তাঁদের নিকট সাহায্য চাওয়ার অধিকার দিয়ে সকলের উপর তাঁদেরকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। সকল মানুষের সমাধি থেকে

---

[24]. আবুল হাসান ‘আলী নদভী, **মা-যা খাসিরাল আ-লামু বি ইনহেত্বাত্বিল মুসলিমীন**; “মুসলিমদের অধঃপতনের ফলে বিশ্ব কি ক্ষতির সম্মুখীন হলো”, (আল-ইত্তেহাদুল ‘আলমিল ইসলামী লিল মুনাজ্জামাতিত ত্বুল্লাবিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮১ খ্রি.), পৃ. ১৯৪-১৯৫।

তাঁদের সমাধিকে- এর উপর গম্বুজ নির্মাণ করা, মোমবাতি জালানো, বরকত অর্জনের জন্য তাঁদের কবরের উপর হাত বুলানো ও পর্দা টানানো ...ইত্যাদির মাধ্যমে- বৈশিষ্ট্য দান করেছেন। এ ছাড়াও তাঁদের উদ্দেশ্যে মানত করা যায় এবং যাবতীয় ধরনের হাদিয়া তুহফা তাঁদের নিকট পেশ করা যায়। এ জাতীয় ধ্যান-ধারণা ও কর্ম সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে যেমন বিস্তৃতি লাভ করেছে, তেমনিভাবে তা অমুসলিম সাধারণ মানুষের মাঝেও বিস্তৃতি লাভ করে।"[25]

বিভিন্ন মনীষীদের এ সব বক্তব্যের দ্বারা এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশসহ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই অধিকাংশ মুসলিমদের ধর্মীয় বিশ্বাসে মারাত্মক বিকৃতি সাধিত হয়েছিল। ধর্মের নামে তারা অধর্মের কর্মে লিপ্ত হয়েছিল। ওলীদেরকে তাঁদের উপযুক্ত স্থানে না বসিয়ে তাঁদের মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে তারা অতিমাত্রায় সীমালঙ্ঘন করেছিল। তাঁদের কবরগুলোকে শির্ক ও বেদ'আত চর্চার আখড়ায় পরিণত করেছিল। তবে আশার কথা

---

[25]. মাহমূদ শালতূত, আল-ইসলামু 'আক্বীদাতুন ওয়া শরী'আতুন; (কায়রো : দারুশ শুরুক, ১৭তম সংস্করণ, ১৯৯৭ইং), পৃ. ৪০।

হলো, বর্তমানে ইসলামী শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসার পূর্বের তুলনায় অধিক হওয়াতে অবস্থার অনেকটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। অতীতে ওলীদের কবরে গেলে যেভাবে মুসলিমদেরকে ভক্তি ও সম্মানের তাড়নায় তাঁদের কবর ও কবরে সেজদায় পড়ে থাকতে দেখা যেতো, বর্তমানে আর সে পরিমাণে দেখা যায় না। কবরে সেজদা করার বিষয়টি এখন অনেকের কাছে গর্হিত কাজ বলে মনে হলেও ওলীদের ব্যাপারে তাদের মনে অতিরিক্ত যে সব ধ্যান-ধারণা পূর্ব থেকে লালিত ছিল তা শুধু দেশের সাধারণ মুসলিমদের মধ্যেই নয় অনেক বিজ্ঞ লোকদের মাঝেও তা যথারীতি বিদ্যমান রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশে শির্ক চর্চার কেন্দ্রসমূহ

শির্কের কেন্দ্রসমূহ :

আমাদের দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় শির্ক চর্চা করার যে সব কেন্দ্র রয়েছে তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে দেখা যায় যে, সংখ্যার দিক থেকে যেমনি তা অগণিত, প্রকারের দিক থেকেও তেমনি তা বিভিন্ন রকমের। চিন্তা করলে এগুলোকে মোট আট প্রকারে বিভক্ত করা যায়।

প্রথম প্রকার : এমন সব কেন্দ্র যা ওলীদের কবরকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে

এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যুগে যুগে অসংখ্য আউলিয়া ও সৎ ব্যক্তিবর্গের শুভাগমন হয়েছিল। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল এদেশের পথভ্রষ্ট মানুষদেরকে তাওহীদের সন্ধান দান করা এবং তাদেরকে সকল সৃষ্টির দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসে পরিণত করা। এ চেষ্টা ও সাধনা করতে করতে তাঁদের অনেকে এ-দেশের মাটিতেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। এঁদের মধ্যে

উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন শাহ জালাল, [২৬] শাহ পরান, [২৭] শেখ বদর[২৮] ও আল্লামা কেরামত আলী জৌনপুরীসহ[২৯] আরো

---

[26]. তিনি হলেন শাহ জালাল মুজাররাদ ইবন মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম আল-ইয়ামানী অথবা আল-কুনইয়াবী। তিনি ৫৯৬/৫৯৮ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ৬২৫/৬২৬ হিজরীতে তিনি দিল্লী হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের সিলেট জেলায় সেকান্দর গাজীর সাথে তার একজন যোদ্ধা অথবা তার একজন সহযোগী হিসেবে আগমন করেন। তখন সিলেট এলাকায় হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দের শাসন ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁর হাতে কতিপয় কারামতের বহিঃপ্রকাশ ঘটান, যা তাঁকে সিলেট এলাকা সহজে জয় করতে সাহায্য করেছিল। বিজয়ের পর তিনি সিলেটেই থেকে ইসলাম প্রচারে ব্রতী হন। সিলেটে আগমনের প্রাক্কালে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ৩৬০ জন শিষ্য। তিনি ৭৪৭ হিজরীতে ১৫০ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। দেখুন : **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**; (ঢাকা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), পৃ.৩৭৬; চৌধুরী দেওয়ান আনোয়ার, প্রাগুক্ত; **শাহ জালাল (রহ.)**; ৩য় সংস্করণ, ই. ফা. বা., **১৯৯৫** খ্রি.), পৃ. **১১** ও ৪২; **গোলাম সাকালায়েন, প্রাগুক্ত;** পৃ. ১৩০।

[27]. শাহ পরান ছিলেন শাহ জালাল (রহ.)-এর ভাগ্নে এবং তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অন্যতম ব্যক্তিত্ব। তাঁকে তিনি সিলেট শহরের উত্তর পূর্ব এলাকায় ইসলাম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। সিলেট শহর থেকে ৫/৬ মাইল দূরে একটি পাহাড়ের উপর তাঁর সমাধি রয়েছে। দেখুন : **চৌধুরী দেওয়ান আনোয়ার, প্রাগুক্ত**; পৃ. ২৮০-২৮১।

[28]. শেখ বদর ছিলেন চট্রগ্রাম জেলায় আগত আউলিয়াদের মধ্যে অন্যতম। সাধারণ মানুষের মাঝে তিনি শেখ বদর ও বদর শাহ নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন।

অগণিত মনীষীগণ। বহুকাল অতিবাহিত হয়ে যায় তাঁদের কারো

তাঁর প্রকৃত নাম জানা যায় নি। সম্ভবত তাঁর নাম ছিল 'শাহ বদর উদ্দিন বদরে আলম'। কথিত আছে যে, তিনি প্রায় পাঁচ থেকে ছয় শত বছর পূর্বে একটি বড় পাথরের উপর সওয়ার হয়ে সমুদ্র পথে চট্রগ্রামে আগমন করেন। সে সময় উক্ত এলাকায় জিনের মারাত্মক ধরনের প্রভাব ছিল। তারা মানুষদেরকে নানাভাবে কষ্ট দিত। শেখ বদর সে এলাকায় আগমন করে মাটিতে একটি বাতি রাখার জন্য জিনদের নিকট অনুমতি চান। জিনরা এতে সম্মত হলে তিনি পাহাড়ের উপর বাতি জ্বালান। সে বাতির আলো পাহাড়ের চারদিকে বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে জিনরা সে এলাকা থেকে পালাতে থাকে। সে পাহাড়টি এখন 'চেরাগীর পাহাড়' নামে খ্যাত, ... সম্ভবত এই সূফী সাধকই সর্বপ্রথম চট্রগ্রাম অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ইসলাম প্রচার করেন। তাঁর জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে কিছুই জানা যায় নি। দেখুন : **গোলাম ছাকলায়েন, প্রাগুক্ত;** পৃ. ১১৫-১১৭।

[29]. তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলাম প্রচার করেন। তিনি সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর শিষ্য ছিলেন। **১৮২১** সালে তিনি সর্ব প্রথম এদেশে আগমন করেন এবং পশ্চিম বঙ্গ, বাংলাদেশ ও আসাম অঞ্চলে একাধারে আঠার বছর পর্যন্ত ইসলাম প্রচার করেন। দাওয়াত ও হেদায়াতের কাজে এ-সব এলাকায় তিনি তাঁর জীবনের একান্নটি বছর ব্যয় করেন। **১৮৭৩** সালে রংপুর জেলায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেখুন: মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, **"ইসলামী দাওয়াত বিস্তারে ও ধর্মীয় - সামাজিক সংস্কারে আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী এর অবদান"**, পি.এইচ.ডি থিসিস, (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, অপ্রকাশিত, **১৯৯৮** খ্রি.), পৃ. ৭৪ ও ৭৫।

সমাধি বা বিশ্রাম স্থলের উপর কোনো প্রকার স্থাপনা ও গম্বুজ নির্মাণ করা হয় নি। কবরের উপর টানানো হয় নি কোনো পর্দা। ছিল না এর কোনো খাদেম; কিন্তু সময়ের ব্যবধানে ধীরে ধীরে শুরু হয়ে যায় তাঁদের ভক্তদের সাথে শয়তানের প্রাচীনতম খেলা। **কাওমে নূহ এর মত তাদের অন্তরেও সে এ ধারণার জন্ম দিল যে,** এ সব ওলিগণ হলেন আমাদের ও আল্লাহর মধ্যকার মাধ্যম, তাঁরা হলেন আল্লাহর নিকট আমাদের যাবতীয় অভাব ও অভিযোগ উপস্থাপনের ব্যাপারে শাফা'আতকারী। আল্লাহর সন্তুষ্টি তাঁদের সন্তুষ্টির মাঝেই নিহিত, তাঁরা মরে গেলেও রূহানী শক্তি বলে তাঁরা আমাদের দুনিয়া-আখেরাতের অনেক কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূর করতে পারেন।

এভাবে যারা এখানে এসেছিলেন শির্ক নিপাত করে ইসলামের তাওহীদী পতাকা উড্ডীন করতে, কালের পরিক্রমায় শয়তানের প্ররোচনায় তাঁদের কবর ও বিশ্রামের স্থানসমূহই ইসলামকে ধ্বংস করার ও শির্ককে প্রসারিত করার অসংখ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁরা যেখানে জনগণকে শির্কের অপরাধে জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে বিরত রাখতে চেয়েছিলেন, সেখানে তাঁদেরকে কেন্দ্র করেই শয়তান এমন সব ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণা সৃষ্টি করে দিলো, যার মাধ্যমে সে জনগণকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার

পথকে সুগম করে ফেললো। তাদেরকে কীট-পতঙ্গের ন্যায় জ্বলন্ত আগুনে ঝাপ দিয়ে পড়ার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিল।

উল্লেখ্য যে, ওলীদের কবর কেন্দ্রিক শির্কের কেন্দ্রসমূহ শির্কের অন্যান্য কেন্দ্রসমূহের তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও এগুলোর অপকারিতা ও অনিষ্টতা অন্যান্যগুলোর চেয়ে অধিক; কারণ, এ সব কেন্দ্রের মধ্যে এমনও কেন্দ্র রয়েছে যা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে এবং তা তাদের দুনিয়া-আখেরাতের মুক্তি! অর্জনের সহজ ও সরল মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শাহ্ জালাল (রহ.)-এর কবর :

এক্ষেত্রে শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর প্রথম স্থান অধিকার করেছে। যার ফলে সেখানে দৈনন্দিন দেশের দূর-দূরান্ত থেকে শত শত লোক তাদের মনোবাঞ্ছনা পূরণের উদ্দেশ্যে আগমন করে। আমার এ গবেষণা সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ উপলক্ষে আমি ১৯৯৯ সালে সেখানে গিয়েছিলাম। আগত ব্যাক্তিদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে তার পরিচয় জানতে চাইলে লোকটি বললো : সে কুমিল্লা জেলা থেকে তার একটি মানত পূরণের উদ্দেশ্যে সপরিবারে এখানে আগমন করেছে। অনেককে দেখলাম কবরের খাদিমের নিকট টাকা, মোমবাতি ও আগরবাতি দিচ্ছে। কেউবা

কবরের গিলাফের উপর গোলাপজল ছিটাচ্ছে। আরেকজনকে দেখলাম কবরের উত্তর পূর্ব পার্শ্বে একটি নির্দিষ্ট স্থানে আগরবাতি জ্বালাচ্ছে। এ সবই অবলীলায় করা হচ্ছে সকলের মানত পূর্ণ করার নিমিত্তে। অনুরূপভাবে আরো দেখলাম কিছু লোক কবরের চার পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করে রয়েছে। আবার অনেকে কবরের পশ্চিম উত্তর পার্শ্বের নির্ধারিত স্থানে বসে কুরআন তেলাওয়াত করছে। আবার পুকুরে গিয়ে দেখলাম কেউ কেউ পুকুরের মাছগুলোকে ছোট ছোট মাছ খেতে দিচ্ছে। অনেকে কবরের বড় বড় ডেগ ও কূপে টাকা দান করছে। কূপ থেকে অপরিষ্কার ময়লা পানি নিয়ে পান করছে। এক ব্যক্তি এ ময়লা পানি বোতলে ভরে বিক্রি করছে। এ সবই করা হচ্ছে কবরবাসী শাহ জালাল (রহ.) এর নিকট এ আকুতি প্রকাশ করতে- তিনি যেন তাদের ইহকালীন কল্যাণ এনে দেন এবং অকল্যাণ দূর করে দেন। অথবা তিনি যেন আল্লাহর নিকট সে জন্য শাফা'আত করেন। আর সে জন্যই তারা কবরের পার্শ্বে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে ও বিগলিত চিত্তে নেহায়েত অনুনয়-বিনয়ের সাথে দো'আ করছে। তাদের ভাবটা যেন এমন যে, তারা যেন বিপদে পড়ে তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থী হয়ে হাত তুলেছে, তিনি ছাড়া যেন তাদের আর কোনো আশ্রয় স্থল নেই। তিনি ছাড়া তাদের উপর আল্লাহর রহমত অবতীর্ণ হওয়ারও কোনো উপায় নেই। পৃথিবীর চলমান ঘটনা প্রবাহে তাঁর

প্রভাব সম্পর্কে জনমনে এ বিশ্বাসও রয়েছে যে, যে মাটিতে শাহ জালালের কবর রয়েছে সে মাটির নিকটে বা দূরে কোথাও কোনো মারাত্মক অঘটন ঘটতে পারে না। সে কারণেই একটি বিমান দুর্ঘটনায় কোনো হতাহত না হওয়ার ফলে পত্রিকান্তরে এ মর্মে মন্তব্য প্রকাশিত হয় যে, সিলেটের মাটিতে শাহ জালাল (রহ.) শায়িত রয়েছেন বলেই বিমানের আরোহীরা নির্ঘাত মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেল।[৩০] উক্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে বা তাঁর রূহানী নেক নজর লাভের আশায় কেউ কেউ জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর কবর যিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারাভিযান আরম্ভ করতেও দেখা যায়।

শরফুদ্দীন চিশ্তী (রহ.)-এর কবর :

এ জাতীয় কেন্দ্রসমূহের মধ্যে অপর উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হচ্ছে রাজধানী ঢাকার হাইকোর্টে অবস্থিত শাহ শরফুদ্দিন চিশতী

---

[30]. যদিও মানুষের এ ধারণার অবাস্তবতা প্রকাশিত হয়ে গেছে ২০০৪ সালে শাহ জালালের কবরে বোমা হামলা ও এর ফলে লোক মরার মধ্য দিয়ে কেননা, জনগণের ধারণানুযায়ী যদি শাহ জালালের কোনো কেরামতী থাকতো, তা হলে তাঁর কবরে কোনো বোমা বিস্ফুরিত হতো না। বোমা বিস্ফুরণের পূর্বেই তিনি অদৃশ্য থেকে সন্ত্রাসীদের কোনো অনিষ্ট করে দিতেন।- লেখক

বেহেশ্তী (রহ.)-এর কবর। এ কবরটি বর্তমানের ন্যায় অতীতে এতো প্রসিদ্ধ ছিল না। রাজধানী ঢাকাতে অবস্থিত কবর ও কবরসমূহের উপর উর্দূ ভাষায় লিখিত একটি গ্রন্থে এ কবর সম্পর্কে লেখক যা বলেছেন, পাঠকদের বুঝার সুবিধার্থে সংক্ষেপে এর কিছু কথা অনুবাদ করে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

"অতীতে এ কবরের কিছু অনুসারী ছিল, যারা এ কবর যিয়ারত করতে আসতো। এ কবরবাসী সম্পর্কে সঠিকভাবে আমার কিছুই জানা নেই। আমার ধারণামতে এ কবরবাসী ব্যক্তি নওয়াব আলাউদ্দিন ইসলাম খাঁন চিশ্তীর কোনো নিকটাত্মীয় বা তাঁর কোনো সাথী হয়ে থাকবেন। এ কবরটি সরকারী জমির মধ্যে অবস্থিত হওয়ার কারণে বৃটিশ সরকার এ কবরটি নিশ্চিহ্ন করার জন্যে বারংবার চেষ্টা করেছে এবং এ উদ্দেশ্যে এর আশে-পাশে গাছও লাগিয়েছে। এর ভক্তদের দ্বারা কবরের উপর নতুন করে কোনো স্থাপনা বা গম্বুজ ইত্যাদি নির্মাণ করতেও বারণ করেছে, যাতে কবরকে ঘিরে পুরাতন যে দেওয়াল বা গম্বুজ রয়েছে তা সূর্যের আলোর অভাবে শেওলা ধরার ফলে ধীরে ধীরে নিজ থেকেই ধসে পড়ে।"[৩১]

[31].হাবীবুর রহমান, **আছুদগানে ঢাকা**, উর্দূ ভাষায় রচিত, (ঢাকা: মনজর প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৪৬ খ্রি.), পৃ. ৪৮।

বৃটিশ শাসনামলের শেষ সময়ে এ কবরের এ জীর্ণ অবস্থা ছিল। তবে স্বাধীনতা উত্তরকালে এ কবরটি তার ভক্তদের দ্বারা পুরো মাত্রায় লালিত হতে আরম্ভ করে এবং ধীরে ধীরে এর প্রসিদ্ধিও দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে। বর্তমানে প্রসিদ্ধির ক্ষেত্রে এটি প্রায় দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। এক সময় এখানে ছিল না কোনো মসজিদ। কোনো কবরকে বা কবরকে কেন্দ্র করে মসজিদ নির্মাণ করা শরী'আতে নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে এ কবরের ভক্তদের দ্বারা এ কবরকে ঘিরেই মসজিদ নির্মিত হয়েছে। ১৯৭৯ থেকে ১৯৮৩ সালের মধ্যে শবে বরাতের রাতে এ কবর দর্শন করতে গিয়ে দেখেছিলাম, হাজার হাজার বনী আদম এ কবরের চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ করছে। এ অবস্থা দেখে আমার মনে হচ্ছিল- তারা যেন কা'বা শরীফের চার পার্শ্ব দিয়ে প্রদক্ষিণ করছে। সে সময়ে এ কবরটির পরিবেশ বর্তমানের চেয়ে অত্যন্ত খারাপ ছিল। তখন কবরে অনেককে সেজদায় পড়ে থাকতে দেখা যেতো। কবরসহ পুরা এলাকাটি তখন মাথায় জটধারী নেংটা ফকীর, আউল-বাউল, মদ ও গাঁজাখোরদের আস্তানা ছিল। বর্তমানে এ কবরের অবস্থা অনেকটা উন্নতি লাভ করেছে। ১৯৯৯ সালে এ কবরটি পুনরায় দেখতে গেলে আমি আগের সেই অবস্থা দেখতে পাই নি। তবে এ কবরের উদ্দেশ্যে মানত করার এবং এখানে তা পূর্ণ করার সাধারণ মানুষের চিরাচরিত যে রীতি ছিল,

বর্তমানেও তা পুরোমাত্রায় বহাল রয়েছে বলে দেখতে পেলাম। আরো দেখতে পেলাম একদল মানুষ কবরকে ঘিরে রয়েছে। এদের কেউবা বসে কিছু ধ্যান করছে, কেউবা দাঁড়িয়ে কিছু পাঠ করছে, আরেক দল মানুষ উচ্চ স্বরে মিলাদ পাঠ করছে। কিছু লোককে দেখলাম কা'বা শরীফের ন্যায় এ কবরের বেষ্টনী ও দরজার চৌকাঠের উপর হাত মুছে নিয়ে নিজ মুখ ও শরীরে হাত বুলিয়ে বরকত হাসিল করছে। কবর থেকে বের হওয়ার সময় বেআদবী হলে অনিষ্টের ভয়ে পিট পিছনে রেখে বের হচ্ছে। আরো দেখলাম কবর থেকে দূরে মসজিদের দক্ষিণ পার্শ্বে মোমবাতি জ্বালানো রয়েছে। একটি যুবককে দেখলাম কা'বা শরীফের গিলাফ ধরে চুম্বন করে বরকত অর্জন করার ন্যায় মসজিদের উত্তর পার্শ্বের দেওয়ালে লাগানো হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও 'আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.)-এর কবরের গিলাফদ্বয়ে ঠোঁট দিয়ে চুম্বন করছে এবং গাল দিয়ে তা স্পর্শ করে তাথেকে বরকত গ্রহণ করছে।

উপর্যুক্ত এ জাতীয় শির্কী ও বেদ'আতী কর্মে যে শুধুমাত্র আমাদের দেশের সাধারণ মুসলিমরাই জড়িত রয়েছে, তা নয়, বরং এ জাতীয় গর্হিত কর্মে সকল মুসলিম দেশের সাধারণ মুসলিমরাও জড়িত রয়েছে। এ জন্য মুসলিমদের এ জাতীয় কর্মের উপর আক্ষেপ করে আল্লামা আহমদ বাহজাত বলেন :

“এ নিষিদ্ধ কর্মে লিপ্ত না হওয়ার জন্য ইসলাম ধর্মে অনেক দলীল প্রমাণাদি দাঁড় করানো সত্ত্বেও মুসলিমরা ওলীদের কবরে মসজিদ বানিয়েছে, তাঁদের সমাধিকে দৃঢ় ও মজবুত করার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করেছে, এমনকি এমন সব নামের উপরেও সমাধি তৈরী করেছে যে নামে আসলে কোনো ব্যাক্তিরও অস্তিত্ব নেই। বরং তা তৈরী করা হয়েছে কাঠের তখতী ও জীব জন্তুর লাশের উপর। এ অবস্থা সত্ত্বেও এগুলো জনগণের দ্বারা আবাদকৃত এমন সব কবর, যা বিপদ দূরীকরণ, রোগমুক্তি ও কঠিনকে সহজতর করার জন্য দূর-দূরান্ত থেকে (আগমনের জন্য) উদ্দেশ্য করা হয়ে থাকে।”[৩২]

আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর কবর :

এ দিকে চট্রগ্রামের আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর[৩৩] কবরও প্রসিদ্ধির দিক থেকে পিছিয়ে নেই। সেখানে বার্ষিক ওরসে হিন্দু-

---

[32] আহমদ বাহজাত, **আল্লাহু ফীল আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাহ;** (কায়রো: মুআছ ছাসাতুল আহরাম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি/), পৃ. ১৯০-১৯১।

[33]. আহমদুল্লাহ মাইজভান্ডারী নামের এ সূফী সাধক ১৮২৬ সালে চট্রগ্রাম জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুরআন, হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কর্ম জীবনে তিনি কিছু দিন যশোর জেলায় বিচারকের পদে সমাসীন ছিলেন। অতঃপর তিনি এ পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং কলিকাতার ‘বুআলী’ নামক মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ

মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই আপন আপন প্রয়োজন পূরণার্থে একত্রিত হয়ে থাকে। ভক্তরা তাঁর প্রশংসায় কবিতার পুস্তক পর্যন্ত রচনা করেছে। এ কবরের ভক্ত এক হিন্দু কবি তার পুস্তকে নিজ গুরুকে স্বয়ং আল্লাহর অবতার বলে দাবী করেছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত কথা আমরা ইন-শাআল্লাহ শির্কের বাস্তব প্রমাণাদি বর্ণনা প্রসঙ্গে পরবর্তীতে আলোচনা করবো।

এভাবে জনগণ প্রত্যেক ছোট ও বড় ওলিদের কবরগুলোকে পবিত্র স্থানে পরিণত করে হিন্দুদের 'বৃন্দাবন' ও 'কাসী'র ন্যায় তীর্থযাত্রার স্থানে পরিণত করেছে। সেগুলোকে বিপদের সময় আশ্রয় নেবার স্থান বানিয়ে নিয়েছে। যাবতীয় অসুখ-বিসুখ দূরীকরণ ও প্রয়োজন পূরণার্থে তারা সেখানে এমনভাবে অবস্থান গ্রহণ করে যেমন আরবের মুশরিকরা তাদের দেবতাদের পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করতো। অবস্থার পরিবর্তনের জন্য নিশীথ রাতে

করেন। এ সময়ে তিনি কাদেরিয়্যাহ তরীকার পীর আবূ শিহামাহ এর হাতে বায়'আত গ্রহণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁর গ্রামের বাড়ীতে চলে আসেন। এবং চট্রগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমে দাওয়াতী কাজে ব্রতী হন। এক পর্যায়ে তিনি জনগণের মধ্যে 'ফকীর মৌলভী' উপাধিতে ভূষিত হন। এলাকায় তাঁর বিভিন্ন কারামত, তাকওয়া ও পরহেগারী প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। তিনি ১৯০৬ সালে পরলোক গমন করেন। গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৫-১২৬। সংক্ষিপ্তাকারে

নিজ গৃহে বসে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি ও অনুনয় বিনয় করার পরিবর্তে তারা এ সব ওলিদের কবরে এসে কান্নাকাটি ও অনুনয় বিনয় করে। উদ্দেশ্য তাঁরা যেন তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে দেন এবং তাদের আকুতি ও মিনতির কথা স্মরণ করে আখেরাতের ভয়াবহ দুর্দিনে যেন তাঁরা তাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আত করেন।

কবরের খাদিম হওয়ার উদ্দেশ্য :

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত 'হিরনাল'-এর কথিত শাহ আলম আল-হাদী এর কবরের খাদেমকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম- আপনি এ কবরের খাদেম হলেন কেন? লোকটি উত্তরে বললো :

"এ কবরের খাদেম হয়েছি এ আশা নিয়ে যে, আমার এ খেদমত দেখে কবরস্থ ওলি আমার উপর দয়াবান হবেন এবং তাঁর কবরের খাদেমী করার কথা স্মরণ করে আখেরাতে আমাকে সাথে না নিয়ে জান্নাতে যেতে লজ্জাবোধ করবেন।"

ওলিদের কবরের ভক্তদের সেখানে যেয়ে মিনতি করার পার্থিব উদ্দেশ্য হয়তো বিভিন্ন রকমের হতে পারে; কিন্তু তাদের সকলের পরকালীন উদ্দেশ্য একটাই যা উক্ত শাহ আলম আল-

হাদীর কবরের খাদেমের বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। অথচ তারা জানে না যে, ভাগ্য নির্ধারণের মালিক যেমন এককভাবে আল্লাহ, তেমনি তা পরিবর্তনের মালিকও এককভাবে তিনিই। শরী'আত নির্দেশিত কর্ম করার মাধ্যমেই তা পরিবর্তনের জন্য তাঁর নিকট মিনতি করতে হবে। ভাল-মন্দ সকল মানুষের মিনতি শুনার জন্যে তো তাঁর দরজা সকলের জন্য সমানভাবেই উন্মুক্ত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর যে সকল সাহাবীদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার সনদপত্র প্রদান করা হয়েছে কেবল তাঁরা ব্যতীত পরবর্তী সৎ মানুষদের ব্যাপারে জান্নাতে যাওয়ার সুধারণা পোষণ করা গেলেও তা কারো জন্যে নিশ্চিত করে বলার অধিকার আমাদের নেই। আর সে ধারণার ভিত্তিতে কোনো ওলি ও দরবেশের শাফা'আত লাভের আশায় থাকারও কোনো যৌক্তিকতা নেই। কেননা; তাঁরা প্রকৃতপক্ষে জান্নাতী কি না, তা আমরা জানি না। জান্নাতী হয়ে থাকলেও শাফা'আত করার বিষয়টি তাঁদের মালিকানাধীন বিষয় নয় যে, তাঁরা যাকে যখন খুশী শাফা'আত করবেন। বরং তা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত বিষয়। কাকে কখন এর অনুমতি দেয়া হবে এবং কার জন্য হবে, তা কেবল তিনিই জানেন। তবে যারা আল্লাহর উলূহিয়্যাত বা রুবূবিয়্যাতে কোনো শির্ক করে মৃত্যুবরণ করবে,

কুরআন ও হাদীসের বর্ণনামতে তাদের কারো শাফা'আত প্রাপ্তির কোনই সুযোগ নেই।

দ্বিতীয় প্রকার : এমন সব কেন্দ্রসমূহ যা কোনো ওলির নিদর্শনের উপর নির্মিত হয়েছে :

এটি হচ্ছে এ দেশের সাধারণ মুসলিমদের সাথে শয়তানের তামাশা করার অপর একটি চিত্র। সে তাদেরকে ওলীদের কোনো কোনো নিদর্শনাদির উপর বা তাঁদের স্মৃতির সাথে জড়িত স্থানের উপর কোনো কবর ছাড়াই মাযার তৈরী করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, শাহ জালাল (রহ.)-এর কবর সিলেট শহরে থাকা সত্ত্বেও তাঁর নামে কুমিল্লা জেলার কোতয়ালী উপজেলার গাজীপুর গ্রামে একটি এবং একই জেলার সদর উপজেলার শ্রীপুর গ্রামে অপর একটি কবর রয়েছে। এ দু'টি কবর সম্পর্কে উক্ত এলাকায় এমন জনশ্রুতি রয়েছে যে, শাহ জালাল (রহ.) তাঁর কোনো এক সফরে এ দু'টি স্থানে যাত্রা বিরতি করেছিলেন এবং সে দু'টি স্থানে তাঁর হাত ও পায়ের নখ, গোঁফ ও দাড়ি ছেঁটে এখানে দাফন করেছিলেন। পরবর্তীতে এ স্থান দু'টি জনগণের কাছে সম্মানিত স্থানে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে তা তাঁর কবরের সমান মর্যাদা পেতে থাকে। তাঁর কবরকে কেন্দ্র

করে সাধারণ লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে এসে যা করে, এ দু'টি স্থানকে কেন্দ্র করেও এলাকার লোকেরাও তা-ই করে।[৩৪]

তৃতীয় প্রকার : পাগলদেরকে কেন্দ্র করে নির্মিত কেন্দ্রসমূহ :

যে সকল পাগল উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ থাকে, সাধরণত মানুষের সাথে কথা-বার্তা বলে না; বিভিন্ন কবর, গোরস্থান, জংগল ও বড় বড় বট গাছের তলায় রাত যাপন করে, রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ করে কারো নিকট কিছু চায় বা কাউকে কোনো বস্তু দান করে; এ জাতীয় পাগলদের প্রতি সাধারণ লোকেরা ভিন্নরকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে থাকেন। এদেরকে অনেকেই আল্লাহর ওলি হিসেবে মনে করে থাকেন। এ জাতীয় পাগলদের মধ্যে কেউবা সত্যিকার অর্থেই পাগল হয়ে থাকে, আবার কেউবা ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করে পাগলের ভাব প্রকাশ করে থাকে। উদ্দেশ্য এ অবস্থাকে পুঁজি করে পরবর্তীতে জীবিকার্জনের একটি সহজ উপায় বের করা। তাই কিছু দিন এভাবে থাকার পর এরা উপযুক্ত স্থান দেখে নিজের জন্য একটি আস্তানা গড়ে তুলে এবং সেখানে বসেই

---

[34]. এ মাজার দু'টি সম্পর্কে উপর্যুক্ত তথ্য প্রদান করেছে অত্র এলাকারই ছাত্র মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম। সে আল-হাদীস বিভাগের ১৯৯৩-৯৪ সালের ১ম বর্ষের ছাত্র ছিল। তার স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম : তুলতুলী, মৌলভী বাজার, উপজেলা ও পোষ্ট : চান্দিনা, জেলা : কুমিল্লা।

সে সাধারণ মানুষের কল্যাণার্জনে ও অকল্যাণ দূরীকরণে নানারকম কবিরাজী, তেলপড়া, পানিপড়া ও তাবীজ-কবজ দিতে আরম্ভ করে। আমার জীবনে এ জাতীয় কিছু পাগলের সাথে দেখা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় **১৯৮২/১৯৮৩** সালে ঢাকার গুলিস্তানে বর্তমান গাবতলী ও মিরপুরগামী বি. আর. টি. সি. বাস ষ্টেন্ডের স্থানে অর্ধ উলঙ্গ অবস্থায় ধ্যানে মগ্ন গলা ও গায়ে লোহার জিঞ্জিরের সাথে বড় বড় তালা ঝুলানো এক পাগল দেখেছিলাম। **১৯৮৫/১৯৮৬** সালে পুনরায় সে পাগলকেই ঠিক সেভাবেই সে স্থানে বসে তা'বীজ বিক্রি করতে দেখলাম। সাধারণ লোকেরা তাকে ঘেরাও করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ তাবীজ নিতে চাইলে সে চোখ বন্ধ করে তার নিকটে রাখা একটি কাপড়ের ব্যাগ থেকে একটি তা'বীজ বের করে দিচ্ছে এবং বিনিময়ে দু'টি করে টাকা নিচ্ছে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম অনেকেই তার নিকট থেকে তা'বীজ নিচ্ছে। সাধারণ লোকদের মনে এ ধরনের পাগলদের ব্যাপারে ওলি হওয়ার ধারণা রয়েছে বলেই তারা এ পাগলের নিকট থেকে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাবীজ নিচ্ছে। তারা এদের সাথে সুন্দর আচরণ করে, এদের সাথে বেআদবী করলে বিপদ হতে পারে বলে মনে করে, এরা কারো নিকট টাকা চাইলে তা সে ব্যক্তির জন্য সৌভাগ্যের কারণ বলে মনে করে দ্রুত তা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করে, না দিলে সমূহ ক্ষতিরও আশঙ্কা করে। কোনো

ব্যবসায়ীর নিকট টাকা চাইলে ব্যবসায়ে অধিক লাভের আশায় সে তাকে তা দ্রুত দান করে। এদের দিলে ব্যবসায়ে লাভ হয় ও অধিক বিক্রি হয়, আর না দিলে অন্যান্য দিনের তুলনায় এ দিনে বিক্রি কম হয়, এ মর্মে কিছু বাস্তব ঘটনার কথাও লোক মুখে শুনা যায়। এ জাতীয় ঘটনা যদি সত্যিও হয় তবে এর অর্থ এ নয় যে, তা এ পাগলকে টাকা দেয়া বা না দেয়ার কারণে হয়েছে, বরং তা হয়েছে আল্লাহর ইচ্ছার কারণেই। তিনি এ জাতীয় পাগলের দ্বারা জনগণের ঈমানের দৃঢ়তা পরীক্ষা করতে চান। তিনি দেখতে চান কার ঈমান মজবুত আর কার ঈমান দুর্বল। এদের কোনো কোনো কথার সত্যতা বাস্তবে প্রমাণিত হয়ে থাকে, তা দেখে সাধারণ লোকেরা তাদেরকে ওলি বলে মনে করে এবং তাদের সত্য কথাকে তাদের কারামত হিসেবে গণ্য করে; অথচ তারা জানে না যে, এ জাতীয় পাগলেরা জঙ্গল ও গোরস্থানে থাকার কারণে এদের সাথে তাদের অজান্তেই শয়তান জিনের সখ্যতা গড়ে উঠে। আর এ জিনরাই সাধারণ লোকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য এদের মুখে কিছু সত্য কথা বা কোনো তথ্য বলে দেয়। শয়তান এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই বনী আদমকে যুগের পর যুগ বিভ্রান্ত করে আসছে। সাধারণ লোকেরা এভাবে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত হয়েই যুগে যুগে শির্কে লিপ্ত হয়েছে। যারা মিছেমিছি ওলি হওয়ার ভান করে সাধারণ মানুষদেরকে প্রতারণা করে তাদের সম্পদ ও ঈমান হনন

করতে চায়, এদের সাথে যে শয়তানের সখ্যতা গড়ে উঠে, সে সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ٢٢١ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٖ ٢٢٢ يُلۡقُونَ ٱلسَّمۡعَ وَأَكۡثَرُهُمۡ كَٰذِبُونَ ٢٢٣ ﴾ [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٣]

"বল, আমি তোমাদেরকে বলবো কি কাদের উপর শয়তান অবতরণ করে? শয়তান অবতরণ করে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী গোনাহগারের উপর। তারা (ফেরেশ্তাদের নিকট থেকে) শ্রুত কথা তাদের নিকট এনে দেয়। এদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।"[৩৫]

চতুর্থ প্রকার : এমন সব কেন্দ্র যেখানে কোনো কবর বা নিদর্শন কিছুই নেই :

আমাদের দেশে এমনও কিছু ভুয়া কবর রয়েছে যেখানে প্রকৃত পক্ষে কোনো ওলি বা দরবেশের কোনো কবর বা নিদর্শন নেই। এ জাতীয় ভুয়া কবর মূলত এক শ্রেণীর লোকেরা জনগণের অর্থ কড়ি লুন্টন করার জন্য মিছেমিছি গড়ে তুলেছে। এ জাতীয় মিথ্যা কবরের বাস্তব উদাহরণ হচ্ছে চট্রগ্রাম জেলায় অবস্থিত সূফী সম্রাট বায়েজীদ বুস্তামী -এর কবর। এ সূফী সাধক সে অঞ্চলে কেন স্বয়ং বাংলাদেশের মাটিতেই আগমন করেছিলেন কি না, এ নিয়ে বিজ্ঞজনদের মধ্যে দ্বিমত রয়েছে। সঠিক মতানুসারে তিনি

---

[35]. আল-কুরআন, সূরা আশ-শু'আরা : ২২৩, ২২৪।

এদেশে কখনও আগমন করেন নি।[৩৬] ইরান দেশের ‘বুস্তাম’ নামক স্থানে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেছেন। সেখানেই রয়েছে তাঁর কবর। তা সত্ত্বেও চট্রগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকায় তাঁর একটি স্মারক কবর রয়েছে। যার উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষেরা দূর-দূরান্ত থেকে তাদের মানতের টাকা কড়ি ও জীব-জন্তু নিয়ে আগমন করে।

এ জাতীয় কেন্দ্রের আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে কুমিল্লা জেলার ‘বরুড়া’ উপজেলার ‘মুগুতী’ নামক গ্রামের ফকীর রহীম আলী’র কবর। এ কবরটি মূলত সে ফকীরের বসার স্থানের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। এ স্থানে সে বসতো। হঠাৎ একদিন সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। প্রতারক ও সুযোগ সন্ধানীরা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে তার বসার স্থলে কবর নির্মাণ করে এবং এখানে মানত ও শিরনী

---

[36]. সূফী সম্রাট বায়েজীদ বুস্তামী চট্রগ্রাম জেলায় ইসলাম প্রচারে আগমনের সংবাদটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। তা সত্ত্বেও এ অঞ্চলে তাঁর আগমনের জনশ্রুতি রয়েছে। আগমনের জনশ্রুতি থাকলেও তিনি যে ৭৯৪ হিজরীতে ইরানের ‘বুস্তাম’ নামক স্থানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন এবং সেখানেই তাঁর সমাধি রয়েছে, এ ব্যাপারে সকলেই একমত। তা সত্ত্বেও চট্রগ্রামের নাসিরাবাদ এলাকার একটি পাহাড়ের উপর তাঁর একটি স্মারক মাজার রয়েছে। **আব্দুল মান্নান তালিব, প্রাগুক্ত;** পৃ. ৯৩-৯৪।

প্রেরণ করতে আরম্ভ করে। এভাবে তা মানত পূর্ণ ও প্রয়োজন পূরণের স্থানে পরিণত হয়ে যায়।

একইভাবে মাদারীপুর জেলার ‘দরগা খুলা’ নামক স্থানে ‘শাহ মাদার দরগা’ নামে আরেকটি ভুয়া কবর রয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, শাহ মাদার নামে একজন সৎ মানুষ ছিলেন। তিনি মূলত ভারতের অধিবাসী ছিলেন। বিভিন্ন স্থান সফরের এক পর্যায়ে তিনি এখানে এসেছিলেন। অতঃপর নিজ দেশে চলে যান এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। কিন্তুস্বার্থান্বেষী মহল পরবর্তীতে তাঁর বসার স্থানে একটি মাযার তৈরী করে নেয়।

পঞ্চম প্রকার : এমন সব কেন্দ্র যা বড় বড় গাছকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে

এ জাতীয় কবর দেশের সর্বত্রই কম-বেশী রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঝিনাইদহ জেলার কোট চাঁদপুর উপজেলার ‘ফুলবাড়ী’ নামক গ্রামে এ ধরনের একটি কবর রয়েছে। যার নাম ‘ফুলবাড়ীর দরগা’। এ কবর বা দরগাটি মূলত একটি বড় পুকুর এবং এ পুকুরের পার্শ্বে অবস্থিত একটি বড় গাছ ও এর নিচে নির্মিত একটি টিনের ঘর, এ-সবের সমন্বয়ে গঠিত। এলাকার সাধারণ লোকেরা এ গাছটিকে পবিত্র মনে করে এর সম্মান করে। নিকট ও দূর থেকে এখানে মানত নিয়ে আসে এবং

এ গাছের নিকট বিভিন্ন রকমের রোগ মুক্তি কামনা করে। অনেক সময় রোগীরা এ গাছের নিচে শুয়ে থাকে।

অনুরূপভাবে যশোর জেলার 'মনিরামপুর' উপজেলার 'মাজিয়ালী' নামক গ্রামেও একটি পুরাতন বড় গাছ রয়েছে, যার নিকটে রয়েছে জনৈক হিন্দু লোকের একটি ঘর। হিন্দুরা এ গাছের পূজা করে। অনেক মুসলিমও বিভিন্ন সময়ে তাদের কামনা বাসনা ও প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে এখানে মানত নিয়ে আগমন করে। মনস্কামনা পূরণের জন্য এ গাছের ডালে কোনো কোনো বস্তু ঝুলিয়ে রাখে।

অনুরূপভাবে যশোর জেলার 'মনিরামপুর' উপজেলার 'মান্দারডাঙ্গা' পীরের কবরেও একটি পুরাতন গাছ রয়েছে। সে কবরের পার্শ্বে রয়েছে একটি কুঁড়েঘর ও কয়েকটি ভুয়া কবর। এর পার্শ্বে প্রায় একশটি চুলা তৈরী করে রাখা আছে জনগণের মানতের পশু যবাই করে পাকানোর জন্যে। সাধারণ মুসলিমরা সেখানে তাদের মানতের ষাঁড় ও ছাগল নিয়ে যায় এবং তা যবাই করে সে সব চুলাতে পাক করে সবাই মিলে খায়। কোনো মহিলার সন্তান না হলে সন্তান প্রাপ্তির আশায় মাথায় কাপড় বেঁধে সে গাছের নিচে বসে থেকে গাছের একটি পাতা বা ফল নিচে পতিত হওয়ার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। পাতা বা ফল

পতিত হলে সন্তান লাভের এক রাশ আশা নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। আর কিছুই পতিত না হলে নিরাশ হয়ে ফিরে যায়।

এমনিভাবে ফরিদপুর জেলার কালেক্টরেট এলাকার সাথে সংলগ্ন একটি স্থানে যশোর রোডের নিকটে একটি বড় গাছ রয়েছে। কথিত আছে যে, শেখ ফরীদ নামের একজন ভারতীয় সাধক অত্র এলাকায় আগমন করে তাঁর সাথীদের সাথে এ গাছের নিচে বসেছিলেন। মানুষেরা পরে এ গাছের নিচে একটি মাযার তৈরী করে নেয় এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই তাদের প্রয়োজন শেখ ফরীদের নিকট পেশ করার জন্য এখানে আগমন করে।[৩৭]

ষষ্ঠ প্রকার : এমন সব কেন্দ্র যা কোনো কবর ও তৎ সংলগ্ন গাছকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে :

এ জাতীয় কেন্দ্রের উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সাতক্ষিরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলার 'কামারঘাতি' নামক গ্রামে একটি কবর রয়েছে, যার নাম 'কামারঘাতি ছোট মিয়ার দরগা'। লোকেরা এ ব্যক্তির কবরকে কেন্দ্র করে এ মাযারটি তৈরী করে থাকলেও তারা এ ব্যক্তির সঠিক নাম ও তার ইতিহাস সম্পর্কে কিছুই জানে না। এ কবরের পার্শ্বে রয়েছে একটি বড় গাছ।

---

[37]. গোলাম সাকলায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯৮।

লোকেরা এ কবরে যেয়ে সেখানে তাদের বিনয়ভাব প্রকাশ করে, অত্যন্ত অনুনয় বিনয় করে দো'আ করে ছোট মিয়ার নিকট সন্তান কামনা করে। রোগ থেকে মুক্তি চায়। কবরের পার্শ্বের বড় গাছের ডালে পাথর ও ইট বেঁধে ঝুলিয়ে রাখে।

এ প্রকারের উদাহরণস্বরূপ আরো বলা যায় যে, চট্রগ্রামের বায়েজীদ বুস্তামীর ভুয়া কবরের ডান পার্শ্বে একটি গাছ রয়েছে, এ গাছের কাছে লোকের বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আগমন করে সেখানে সুতায় একাধিক গিঁঠ দেয়। একটি উদ্দেশ্য পূর্ণ হলে এসে একটি গিঁট খুলে দেয়। এক ব্যক্তিকে গাছের গোড়ায় সুতা ঝুলিয়ে গিঁট দেয়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে সে ব্যক্তি বললো: এখানে লোকেরা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে সুতায় গিঁট দেয়। কেউ দেয় সন্তান লাভের আশায়, কেউবা দেয় ভালো চাকরী প্রাপ্তির আশায়, আবার কেউবা দেয় মানসিক প্রশান্তি লাভের আকাঙ্ক্ষায়। এক ব্যক্তি বায়েজীদ বুস্তামীর ওসীলায় আল্লাহর নিকট দো'আ করা প্রসঙ্গে একটি কাগজে কিছু কথা লিখে গাছের সাথে তা ঝুলিয়ে রাখে। সে তার দো'আয় লিখেছে: "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ওহে সূফী সম্রাট বা-এজীদ বুস্তামী! আল্লাহর নিকট আমার দো'আ মাকবুল হওয়ার জন্য আমি আপনার মাধ্যমে ওসীলা করছি। তোমার নিকট কামনা করছি তুমি আমাকে নিরাপদে গাড়ী চালাবার তৌফিক দাও, আমাকে যাবতীয় বিপদ থেকে মুক্তি দাও

এবং ভাল একটি কর্ম পাইয়ে দাও, আর এ এতীমের দো‘আ কবুল কর।”

আমাদের দেশের ছোট বড় সাধারণ গোরস্থানগুলোতে এমনিতেই প্রাকৃতিকভাবে যে সব গাছ-পালার জন্ম হয়, সাধারণত জনগণের নিকট এগুলোর কোনো গুরুত্ব থাকে না; পক্ষান্তরে কোনো সত্যিকারের ওলি বা কথিত কোনো ওলির কবরের উপর বা নিকটে যদি কোনো বড় ধরনের গাছ বিশেষ করে কোনো বড় বট গাছ থাকে, তা হলে জনগণের কাছে এ গাছের গুরুত্ব বেড়ে যায়। তারা ওলির কবরের সম্মানের পাশাপাশি এ গাছেরও সম্মান করতে আরম্ভ করে। এ গাছের শিকড়ে সুতা বাঁধলে, এর মূল কাণ্ডে তারকাঁটা মারলে বিভিন্ন রকমের মনস্কামনা পূরণ হয় বলে তারা ধারণা করে। সিলেটের শাহ পরানের কবরে গেলে এর জ্বলন্ত প্রমাণ দেখতে পাওয়া যায়। জনগণ মনে করে ওলিদের মৃত্যুর পর তাঁদের কবরের উপর বা এর সংলগ্ন গাছের মাধ্যমে তাঁদের বিভিন্ন রকমের কারামত প্রকাশিত হয়। এ জাতীয় গাছের একটি সুন্দর উদাহরণ হচ্ছে নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার ‘হিরনাল’ গ্রামের শাহ আলম আল-হাদী এর কবর সংলগ্ন গাছটি। এ গাছের ব্যাপারে অত্র এলাকায় জনশ্রুতি রয়েছে যে, কেউ এ গাছের ডাল কাটলে অথবা এর পাতা ছিড়লে সে ব্যক্তির পেটে বেদনা হয়, এর পার্শ্ব দিয়ে চলার সময় কারো পা

পিঁছলে গেলে সে ব্যক্তির জ্বর হয়। আমি এ কবরের খাদেমকে এ গাছ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তখন সে বললো :

“বৃটিশ শাসনামলের কোনো এক সময় ঝড়ের কারণে এ গাছের একটি ডাল ভেঙ্গে পড়ে, লোকেরা এ ডালটি সরিয়ে নিতে চাইলে তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয় নি, বরং এর ফলে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। এ এলাকার সে সময়কার প্রতাপশালী হিন্দুরা হাতীর সহযোগিতায় এ ডালটি সে স্থান থেকে সরিয়ে নিতে চাইলে হাতীর দ্বারাও তা সরানো সম্ভব হয় নি। হাতীর গলায় বেধে দেয়ার পর যখন হাতী তা জোরে টান মেরেছিল তখন হাতী অস্বাভাবিক রকমের চিৎকার করেছিল। খাদেম আরো বললো : ১৯৯৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কিছু লোক সে ডালটি তার পূর্ব স্থান থেকে সরিয়ে সে গাছের কাছে নিতে পেরেছিল। এরপর তারা এ ডালটিকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিতে চাইলে তারা তা পোড়াতে পারে নি। পরে আমরা এ ডালটিকে রাতের বেলা ওলির কবর ও সে গাছের মধ্যখানে একটি কুঁড়ে ঘরে রেখেছিলাম, সকালে উঠে আমরা সে ডালটি আর সে ঘরে দেখতে পাই নি”। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জনগণের অন্তরে এ গাছের মর্যাদা ও গুরুত্ব আরো বেড়ে যায়। এ কবরের খাদেম ও এর ভক্তরা মনে করে এ গাছ এবং এর ডালকে কেন্দ্র করে এ পর্যন্ত

যে সব অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটেছে, সবই হয়েছে কবরস্থ এ ওলির কারণে, এ সব তাঁর কারামত বৈ আর কিছুই নয়!!

উক্ত কবরের খাদেম এ গাছের ডাল সম্পর্কিত যা কিছু বলেছে তা যদি সত্যিই হয়ে থাকে, তা হলে শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে বলতে হবে যে, এ গাছের ডালটি কারো পক্ষে সরাতে না পারার অর্থ এ নয় যে, কবরস্থ অলিই তাঁর কারামত প্রকাশের জন্য প্রথমে তা সরাতে বারণ করেছেন; বরং ডালটি এর স্থান থেকে সরাতে না পারার পিছনে রয়েছে শয়তানের কারসাজি। শয়তান জিনরাই দীর্ঘকাল এ ডালটিকে সরাতে দেয় নি, আবার এ জিন শয়তানরাই এ ঘর থেকে অবশেষে তা রাতের আঁধারে সরিয়ে নিয়েছে। উদ্দেশ্য এর দ্বারা সাধারণ মানুষদের নতুন করে বিভ্রান্ত করা। যাতে তারা এ গাছকে আরো বেশী করে গোপনে ভয় করে এবং আরো বেশী করে এর তা'যীম করে, এর দ্বারা আরো বেশী করে কল্যাণের আশা করে। এভাবে তারা যেন এ গাছকে কেন্দ্র করে শির্কী চিন্তা ও কর্মের মধ্যে সর্বদা লিপ্ত থাকে। উল্লেখ্য যে, এ গাছে যে জিনের বসতি রয়েছে তাও বাস্তব একটি ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত। একদা এক ব্যক্তির এক মেয়েকে রাতের আঁধারে জিনরা উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সে গাছে। অতঃপর ফজরের সময় তারা দূরবর্তী এক বাড়ীর আঙ্গিনায় তাকে অজ্ঞান অবস্থায় ফেলে যায়। মেয়েটি জ্ঞান ফিরে পেলে তাকে জিজ্ঞাসা

করা হলে সে বললো : আমাকে কিছু অপরিচিত ব্যক্তিরা ‘হিরনাল’ এর কবরের নিকটতম গাছের ডালে নিয়ে বসিয়ে রেখেছিল।[৩৮] এ বাস্তব ঘটনাটি আমাদের জন্য উত্তম সাক্ষ্য বহন করছে যে, এ কবরের ডাল কাটলে বা এর নিকটে কেউ হোছট খেয়ে পড়ে গেলে অসুখ হলে তা এ সব শয়তান জিনের অশুভ দৃষ্টির কারণেই আল্লাহর হুকুমে হয়েছে। এ জাতীয় সকল গাছে বসবাসকারী দুষ্ট জিনেরা সাধারণ মানুষের ঈমান নষ্ট করার জন্যে কখনও কারো কল্যাণ করে, কখনও কারো অকল্যাণ করে। আর সাধারণ মানুষদের এ কুমন্ত্রণা দেয় যে, এ সবই হচ্ছে কবরস্থ এ ওলির কারণে।

সপ্তম প্রকার : এমন সব কেন্দ্রসমূহ যা বেলায়েতের দাবীদারদের কবরে তৈরী করা হয়েছে

বেলায়েত লাভ করা বা আল্লাহর তা‘আলার ওলি হওয়া একটি উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্তির ব্যাপার। যারা আল্লাহ তা‘আলাকে ভালবেসে একান্ত এখলাস ও একাগ্রতার সাথে তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের উদ্দেশ্যে শরী‘আতের যাবতীয় বিধি-বিধান যথাসাধ্য পালন করেন, কেবল তাঁরাই সে মর্যাদায় আরোহণ করতে

---

[38]. হিরনালের কবরের নিকটতম ‘কাকিনীবাগ’ গ্রামের মুহাম্মদ ফরহাদ উদ্দিন দেওয়ান এর নিকট থেকে এ তথ্যটি সংগ্রহ করা হয়েছে। ঘটনাটি তার নিজের সামনে ঘটিত হয়েছে বলে সে জানায়।

পারেন। যে কেউ এ পথের পথিক হওয়ার জন্য চেষ্টা ও সাধনা করতে পারেন। তবে যেহেতু এ সাধনার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন মুক্তি; সে জন্য শর'য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ এ পথে অনেক দূর অগ্রসর হলে তিনি জনগণের কাছে তা প্রকাশ করতে পারেন না। বা এ দাবীও করতে পারেন না যে, আমি আল্লাহর ওলি হয়ে গেছি। যদি কেউ নিজের জন্য এ ধরনের দাবী করেন, তবে তিনি কোনভাবেই প্রকৃত ওলি হতে পারেন না। কিন্তু আফসোসের বিষয় এ ধরনের বেলায়েতের দাবীদারদের সংখ্যাই আমাদের দেশে অধিক। তারা মনে করেন, কোনো পীরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করলে এবং নিজ বাড়ীতে একটি খানকা বানিয়ে নিজ পীরের তরীকানুযায়ী মাথায় লম্বা চুল, গলায় লম্বা তসবীহ, আর গায়ে লাল সালু পরিধান করলে, জনগণের সাথে উঠা-বসা থেকে বিরত থাকলে, সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন ভক্তদের সাথে একত্রিত হয়ে উচ্চৈঃস্বরে যিকির করলে, নিজ পীর, বড়পীর আব্দুল কাদির জীলানী ও খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী এর বার্ষিক ওরস পালন করে সেখানে কিছু গান-বাজনা, মদ ও গাঁজা খেলে ওলি হওয়া যায়। এ জাতীয় স্বঘোষিত ওলি বা পীরদের সংখ্যাই সমাজে অধিক। প্রকৃতপক্ষে তারা পার্থিব উপার্জনের একটি সহজ পথ মনে করে এটাকে একটি পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নিয়ে থাকে। সে জন্যেই আদম শুমারিতে তারা নিজেদের পেশাগত পরিচয় পীর

বলে দিয়ে থাকেন।[৩৯] এরা নিজেদের জীবদ্দশায় যেমন সুকৌশলে সাধারণ মানুষের ঈমান হনন করে সম্পদ অর্জন করে থাকেন, তেমনি তাদের মৃত্যুর পরেও তাদের বংশধরদের জন্য তার কবরকে পার্থিব উপার্জনের একটি সহজ উপায় হিসেবে রেখে যান। সাধারণ লোকেরা তাদের জীবদ্দশায় যেমন তাদের নানাবিধ প্রয়োজন ও মনস্কামনা পূরণের জন্য হাদিয়া, তুহফা ও মানত নিয়ে তাদের দরবারে আগমন করতো, তাদের মৃত্যুর পরেও ঠিক সেভাবেই বরং পূর্বের চেয়েও অধিক হারে আগমন করে থাকে।

অষ্টম প্রকার : এমন সব কেন্দ্র যা জীবিত বেলায়েতের দাবীদাররা নির্মাণ করেছে

অতীতে যারা বেলায়েত লাভের জন্য সাধনা করতেন, তারা সাধারণত নিজেদের প্রচার করা থেকে বিরত থাকতেন। তাঁদের কবরকে কবরে পরিণত করা থেকে আরম্ভ করে এর উপর গম্বুজ

---

39 **১৯৮১** সালে পরিচালিত বাংলাদেশের আদম শুমারির পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২৯৮০০০ ব্যক্তি তাদের পেশাগত পরিচয় দিতে যেয়ে বলেছেন তাদের পেশা হচ্ছে পীর। দৈনিক 'করতোয়া' নামক একটি পত্রিকা এ সংবাদটি প্রকাশ করে এ মন্তব্য করেছে যে, এ সংখ্যাকে বাংলাদেশের মোট গ্রামের মধ্যে ভাগ করলে প্রতি গ্রামের ভাগে মোট চারজন করে 'পীর' পড়বে। এতে প্রমাণিত হয় যে, 'পীর' পেশাই এখন অন্যান্য সকল পেশার চেয়ে লাভজনক। দেখুন : **দৈনিক 'করতোয়া', (বগুড়া : ১৮/১২/১৯৮৭** খ্রি.), পৃ.৩।

নির্মাণ করা, তাঁদের কবরকে কাপড় দ্বারা ঢাকা, উপরে সামিয়ানা টাঙ্গানো, তাঁদের উদ্দেশ্যে ইসালে সাওয়াবের নামে বার্ষিক ওরস পালন ইত্যাদি যা কিছুই বর্তমানে করা হয়ে থাকে, সে সবের জন্য তাঁরা মোটেও দায়ী নন। এ-জন্য যে, তাঁরা তো কাউকে এ সব করতে বলেন নি। কিন্তু কালের পরিক্রমায় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আমাদের দেশে এখন বেলায়েতের দাবীদার এমন অনেক পীর রয়েছে যারা নিজেদের জন্য খানকা তৈরী করে 'বিশ্ব জাকের মঞ্জিল' ও 'বাবে রহমত' ইত্যাদি চমকপ্রদ নাম দিয়ে সেখানে 'বিশ্ব আশেকে রাসূল সম্মেলন'র নামে ওরস পালন করে। তারা নিজেদের বাহ্যিক পোশাকাদি, মিলাদ মাহফিল ও যিকির-আযকারের অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে সাধারণ লোকদের বুঝাতে চায় যে, তারা আসলেই আল্লাহর ওলি ও তাঁর কামেল বান্দা; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা পাকা প্রতারক, ধোঁকাবাজ ও অর্থ-সম্পদের দাস। কেননা, তাদের মধ্যে বাহ্যিক বেশভূষা ছাড়া দ্বীনের আর কিছুই নেই। তারা মূলত দুনিয়ার গোলাম ও কবর পূজারী। সে জন্যেই তারা মাঝে মধ্যে আজমীর ও বাগদাদে গমন করে। তারা বাহ্যিক কিছু কর্মকাণ্ড দ্বারা সাধারণ জনগণকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। বাহ্যত তা তাদের কারামত মনে হলেও আসলে তা শয়তানী চক্রান্ত বৈ আর কিছুই নয়। সাধারণ লোকদেরকে প্রতারণা করার জন্য তারা শয়তানের সহযোগিতায় তা প্রকাশ

করে থাকে। এ সব ধোঁকাবাজদের মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে দেওয়ানবাগের স্বঘোষিত পীর মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী। সে এ মর্মে দাবী করেছে যে, সে আল্লাহ তা'আলাকে একটি যুবকের আকৃতিতে দেখেছে। আরো দাবী করেছে যে, সে স্বপ্নের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দেহকে উলঙ্গ অবস্থায় ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার মধ্যবর্তী একটি আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেছে।[৪০] অপর এক স্বপ্নে দেখেছে: "রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাঁর সাথে কা'বা শরীফসহ তার আরামবাগস্থ 'বাবে রহমত' নামক খানকাতে আগমন করে তাকে লক্ষ্য করে বলেছেন: দেওয়ানবাগী হজ্জ করে নি বলে লোকেরা যা বলে, তা সঠিক নয় কারণ, আমি (রাসূল) সর্বক্ষণ তার সাথে রয়েছি, আর কা'বা শরীফ সর্বদা তার সামনে রয়েছে, সে মানুষের মাঝে আমার ধর্ম প্রচার করছে, এমতাবস্থায় তার হজ্জ করার কোনো প্রয়োজন নেই।"[৪১] 'বিশ্ব আশেকে রাসূল সম্মেলন' নামে প্রতি বছর সে তার দেওয়ানবাগের খানকাতে একটি ওরস পালন করে। রাষ্ট্রের কোনো কোনো পদস্থ

---

[40]. মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী, **রাসূল সত্যই কি গরীব ছিলেন;** (ঢাকা : সূফী ফাউন্ডেশন, আরামবাগ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), পৃ. ১২।

[41]. মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী, **আল্লাহ কোন্ পথে;** (ঢাকা : সূফী ফাউন্ডেশন, আরামবাগ, ৩য় সংস্করণ, সন বিহীন), পৃ. ১৯৮।

কর্মকর্তাদের সাথে তার গোপন আঁতাত রয়েছে। সে জন্য দেওয়ানবাগ এলাকায় সে জনগণের জমি অবৈধ দখলসহ যে সব অপরাধমূলক কর্ম করেছে, জনগণের পক্ষে এর কোনো প্রতিকার করা সম্ভব হয় নি। কা'বা শরীফের 'বাবে রহমত' নামের দরজার নামে আরামবাগের খানকার নাম রাখার পিছনে ভাবটা যেন এমন যে, যারা তার এ খানকায় আগমন করবে তাদের মক্কা শরীফ যাওয়া হয়ে যাবে। আল্লাহর রহমতে অবশেষে কিছুটা হলেও তার গোপন তথ্য ফাঁস হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে সে তার আস্তানা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। তার আস্তানা থেকে পুলিশ অনেক অস্ত্রশস্ত্রসহ কতিপয় ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসীকেও পাকড়াও করেছিল।[৪২] তার পালিয়ে যাওয়ার পর আমি সেখানে গিয়ে এলাকার লোকজনকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বললো: সে জমির দলীল জাল করে অনেক সাধারণ মানুষের জমি বলপূর্বক দখল করে নিয়ে এ বিশাল দরবার তৈরী করেছে। এলাকার লোকেরা তাকে পছন্দ করে না। তারা আরো বললো: প্রত্যেক জুমু'আর দিনে এ খানকাতে তার ভক্তরা বিভিন্ন স্থান থেকে এসে সমবেত হয়। তারা তাকে সেজদা করে, নগদ টাকা দান করে এবং সে সেজদাকারীদের পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়।

[42]. দেখুন : দৈনিক ইনকিলাব, ১ম পৃষ্ঠা, তারিখ : ২৬/১২/১৯৯৯ খ্রি.।

এরকম পীরদের মধ্যে আরেক পীর হচ্ছে দেওয়ান মুহাম্মদ সাঈদ উদ্দিন সাঈদাবাদী।[৪৩] যার খানকা ও আস্তানা ঢাকার সাঈদাবাদ বাস ষ্টেশনের পূর্বে অবস্থিত। কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র জ্ঞান না থাকলেও অনেকের দৃষ্টিতে সে প্রথম সারির একজন ওলি ও সাধক। সে জন্যে তার দরবারে দেশের বহু লোক তাদের সমস্যাদি সমাধান ও মনস্কামনা পূরণের জন্য ভিড় জমায়। কখনও আজমীর ও বাগদাদে গেলে জনগণের যোগাযোগের সুবিধার্থে তা পত্রিকান্তরে প্রকাশ করে যায়। আবার আগমন করলে তাও পত্রিকার মাধ্যমে জনগণকে জানিয়ে দেয়া হয়। জনগণ তার নিকট থেকে ঝাড়ফুঁক থেকে আরম্ভ করে তার দো'আ কামনা, সন্তান প্রাপ্তি ও সমস্যা সমাধানের জন্য যেয়ে থাকে। তার কাছে যেয়ে সন্তান লাভকারীরা মাঝে মধ্যে পত্রিকান্তরে তাদের সন্তান লাভের সংবাদটি প্রচার করে আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি তারও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে

---

[43]. অনেকের সাথে আলাপ করে এ ব্যক্তি সম্পর্কে যা জানা যায় তা হলো : এ লোকটি একজন সাধারণ মানুষ, কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। আজমীর ও বাগদাদ গমনের মাধ্যমে সে মা'রিফাত ও সুলুকের পথ ধরে। ধীরে ধীরে জনগণের মধ্যে তার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। তার নিকট দেশের সাধারণ জনগণের মত অনেক রাজনীতিবিদরাও গমন করে থাকেন। প্রতি সপ্তাহে জুমু'আর নামাজের পর মিলাদ মাহফিল করা হলো তার একটি সাধারণ রীতি।

এবং যারা এখনও তার কাছে যায় নি তাদেরকে তার নিকট যাবার উৎসাহ যোগায়। তার এ জাতীয় প্রচারাভিযান দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, সে সূফী হওয়াকে নিজের জন্য জনগণের সম্পদ আত্মসাতের একটি সহজ উপায় হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

জাহেলী যুগের শির্কের কেন্দ্রসমূহের সাথে এ-সব কেন্দ্রের তুলনা

আমরা প্রথম অধ্যায়ে জাহেলী যুগের শির্কের কেন্দ্রসমূহের ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আমরা এ বিষয়টি খতিয়ে দেখবো যে, বাংলাদেশে অবস্থিত শির্কের কেন্দ্রসমূহের সাথে সে যুগের কেন্দ্রসমূহের কতটুকু সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এ ক্ষেত্রে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম পরবর্তী যুগে বিভিন্ন মুসলিম বা অমুসলিম দেশে বিশেষ করে আমাদের দেশে ওলীদের কবর বা তাঁদের নিদর্শনের উপর যে সব কেন্দ্র তৈরী করা হয়েছে, সেগুলোর বিশেষ ধরনের মিল রয়েছে নূহ ‘আলাইহিস সালাম-এর জাতির মধ্যকার ওয়াদ্দ, সুয়া‘, ইয়াগুস, ইয়া‘উক ও নসর নামের ওলিদের কবরে নির্মিত কেন্দ্রসমূহের সাথে; কেননা, তাঁদের নামে পৃথক পৃথক মূর্তি তৈরী করার পূর্বে তাঁদের ভক্তরা তাঁদের কবরগুলোর সাথে ঠিক সেরকমই আচরণ করেছিল যেরূপ আচরণ অধিকাংশ সাধারণ মুসলিমরা আজ তাদের ওলীদের কবরসমূহের সাথে করে থাকে। সে সময় থেকে আরম্ভ করে সর্বশেষ নবী ও সর্বশেষ রাসূল

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্ব পর্যন্ত লোকেরা তাদের আউলিয়া ও নবীদের সম্মান ও তা'জিম করতে গিয়ে এবং তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের জীবনের কল্যাণার্জন এবং অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষেত্রে শাফা'আতকারী মনে করার কারণেই তাঁদের কবরগুলোকে শির্কের কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছিল। ধীরে ধীরে মুসলিমরাও তাদের ওলীদের সম্মান ও তা'জিম করতে গিয়ে এবং দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে আল্লাহ ও তাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারী ও শাফা'আতকারী হওয়ার ধারণা করার ফলে তাঁদের কবর ও কবরগুলোকে ঠিক একই কায়দায় শির্কের কেন্দ্র বানিয়ে নিয়েছে।

পাগলদের কবরসমূহে নির্মিত কেন্দ্রসমূহ বা তথাকথিত বেলায়েতের দাবীদাররা নিজেদের জন্য যে সব কেন্দ্র নির্মাণ করেছে, সেগুলোরও ওলীদের কবরে নির্মিত কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এরা যদিও ওলীদের অন্তর্ভুক্ত নয়, তথাপি লোকেরা তাদেরকে অজ্ঞতাবশত ওলীদের মাঝে গণ্য করে নিয়েছে। এ ছাড়াও সে কালের গণকদের সাথে এদের বিশেষ রকমের মিল রয়েছে; কেননা, সে কালের গণকদের সাথে শয়তান জিনের

সম্পর্ক ছিল, বর্তমান কালের বেলায়াতের দাবীদারদের সাথেও শয়তান জিনের গোপন সম্পর্ক রয়েছে। এ জিনদের সহযোগিতাতেই যেমন গণকরা জনগণের উপকার করতো, তেমনি এরাও জিনদের সহযোগিতায় জনগণের উপকার করে থাকে। তাই সাধারণ লোকদের দৃষ্টিতে এরা আল্লাহর ওলি হয়ে থাকলেও মূলত তারা শয়তানের ওলি ও বন্ধু। সে জন্যেই তারা নিজেদের বেলায়াত লাভের বিষয় গোপন না রেখে পত্রিকান্তরে প্রকাশ করে। সাধারণত কা'বা শরীফ ও মসজিদে নববী যিয়ারতের বদলে তারা আজমীর ও বাগদাদে যায়। নিজ নিজ খানকাতে ওরস পালনের নামে জাহেলী যুগের মুশরিকদের ন্যায় ঈদ পালন করে।

অবশিষ্ট বিভিন্ন গাছপালা, পুকুর, কূপ ও জীব জন্তুকে কেন্দ্র করে যে সকল শির্কের কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে, সেগুলোর মিল রয়েছে আরবের মুশরিকদের 'লাত' 'উয্যা' 'মানাত' ও 'যাতে আনওয়াত' নামের পাথর ও গাছকে কেন্দ্র করে নির্মিত শির্কের কেন্দ্রসমূহের সাথে; কেননা সেগুলোও গাছ ও পাথরকে কেন্দ্র করেই নির্মাণ করা হয়েছিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শির্ক

ইসলামের বিধান মহান আল্লাহ প্রদত্ত একটি অতুলনীয় নে'আমত। যারা তা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে তারা বড়ই সৌভাগ্যবান। একজন মানুষের পক্ষে মুসলিম হওয়া তার জন্য অত্যন্ত গৌরবের ব্যাপার। সে জন্য বাংলাদেশের একজন সাধারণ মুসলিমও এ জন্য গর্ববোধ করে। এমনকি কেউ ইসলাম বিরোধী বা ইসলাম বিনষ্টকারী কোনো কাজ করলেও এ-জন্য কেউ তাকে অমুসলিম বলুক, এমন কথা তারা বরদাশত করতে পারেন না। তবে আসল কথা হচ্ছে মুসলিম হওয়ার বিষয়টি প্রকৃত আনন্দ ও গর্বের বিষয় হচ্ছে কেবল সে ব্যক্তির জন্যেই যে ইসলামকে সঠিকভাবে বুঝতে সক্ষম হয়েছে এবং ইসলাম বিরোধী যাবতীয় চিন্তা, চেতনা, কর্ম ও অভ্যাসকে চুড়ান্তভাবে পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করেছে এবং এর মধ্যে থেকেই তার জীবন অতিবাহিত করেছে। বাংলাদেশের মুসলিমরা যদিও নিজেদেরকে সত্যিকারের মুসলিম বলে দাবী করে থাকেন, তবে তাদের অধিকাংশের চিন্তা, চেতনা, কর্ম, বক্তব্য ও অভ্যাস এ কথারই সাক্ষ্য দেয় যে, আদম সন্তানদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য শয়তান বিতাড়িত হওয়ার সময় যে প্রতিজ্ঞা করেছিল এবং তা

বাস্তবায়নের জন্যে পরবর্তীতে সে যে সব পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল, তাদের উপর শয়তান তার সে প্রতিজ্ঞা ও পরিকল্পনা বাস্তবেরূপ দিতে সক্ষম হয়েছে। তাদেরকে তাদের অজান্তেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কার আরবের মুশরিকদের অবস্থার শিকারে পরিণত করেছে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেছিলেন :

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ۝١٠٦ ﴾ [يوسف: ١٠٦]

“এদের অধিকাংশই মুশরিক অবস্থায় আল্লাহর উপর বিশ্বাস করে।”[৪৪]

বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের অধিকাংশ মুসলিমদের মাঝে যে শির্কের ছড়াছড়ি রয়েছে, এ বিষয়ে শরী‘আত বিশেষজ্ঞদের সাক্ষ্য প্রমাণ আমরা দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উপস্থাপন করেছি। নিম্নে আমরা তাদের বাস্তব কিছু শির্কী আক্বীদা-বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের উদাহরণ উপস্থাপন করবো ইন-শাআল্লাহ, যা এ কথারই উত্তম সাক্ষ্য বহন করবে যে, তারা নিজেদেরকে একেকজন মুসলিম বলে দাবী করলেও তাদের অধিকাংশরাই এর বিপরীত মেরুতে অবস্থান করছেন। তারা তাদের বিভিন্ন বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের

---

[44] . আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : ১০৬।

দ্বারা যে শুধুমাত্র আরবের মুশরিকদের সমতুল্যই হয়েছেন তা নয়, বরং অনেক ক্ষেত্রে তারা তাদের চেয়েও অগ্রগামী হয়েছেন।

আমাদের দেশের মুসলিমদের ধর্মীয় ও সামাজিক অবস্থা পর্যালোচনা করে আমার কাছে প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের অধিকাংশের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসে যে সকল শির্কের প্রচলন রয়েছে, তা শির্কে আকবার এর চার প্রকারকেই শামিল করে। নিম্নে তা এক এক করে বর্ণনা করা হলো :

জ্ঞানগত শির্ক

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অদৃশ্য বা গায়েব সম্পর্কে জানতেন বলে বিশ্বাস করা :

আমাদের দেশে এমন বহু মুসলিম রয়েছেন যারা নিজেদেরকে প্রকৃত সুন্নী বলে দাবী করে থাকেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জ্ঞান ও তাঁর মান মর্যাদা বাড়ানোর জন্য তাঁর ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করেন যে, তিনি তাঁর জীবদ্দশায় যাবতীয় অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন, বর্তমানেও তিনি সর্বত্র হাজির ও নাজির আছেন। সুদূর মদীনায় থেকেও তিনি সর্বত্র বিরাজমান ও সব কিছু অবলোকন করছেন। দেশের চট্রগ্রাম, কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ ও ময়মনসিংহ জেলার

অনেক মুসলিম এ চিন্তাধারা লালন করে থাকেন। কিশোরগঞ্জ জেলার করিমগঞ্জ উপজেলার আবু বকর সিদ্দিক নামের জনৈক পীর সাহেবও এ ধরনের দাবী করেন বলে পত্রিকান্তরে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে।[৪৫]

অনুরূপভাবে এ বিশ্বাস সিলেট জেলার জকিগঞ্জ উপজেলার ফুলতুলী পীর সাহেব এবং তাঁর সকল ভক্ত অনুরক্তরাও পোষণ করে থাকেন। এ ধরনের বিশ্বাস যে জ্ঞানগত শির্কের অন্তর্গত, এর প্রমাণ আমরা প্রথম অধ্যায়ে যাবতীয় তথ্য প্রমাণাদিসহ উপস্থাপন করেছি। সেখানে প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, কারো পক্ষেই নিজ থেকে গায়েব সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগ নেই। এ বিষয়টি সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহ তা'আলার অধিকারভুক্ত বিষয়। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাঁর রেসালতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করার প্রয়োজনে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে কিছু অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত করেছিলেন, এর বাইরে তিনি নিজ থেকে আর কিছুই জানতেন না বা জানতে পারতেন না। গায়েব সম্পর্কে জানার যেমন তাঁর জন্মগত কোনো বৈশিষ্ট্য ছিল না, তেমনি রেসালত লাভের পরেও তাঁর মধ্যে এমন কোনো বৈশিষ্ট্য দান করা হয় নি। তা না দেয়ার কারণ হলো : এটি

---

45. দেখুন : সাপ্তাহিক সোনার বাংলা, (শুক্রবার, ৪/৮/২০০০ খ্রি.), পৃ.৬।

আল্লাহ তা‘আলার রুবূবিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী তাঁর একটি বিশেষ গুণ, যা তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত তাঁর কোনো সৃষ্টির জন্য শোভা পায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় যে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারেন না, তাঁর তিরোধানের পরেও তিনি সে বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারেন না।

যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার চিন্তাধারা লালন করেন তারা নিজেদেরকে ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত’ এর দল বলে দাবী করে থাকেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যে সকল সাহাবীগণ সর্বপ্রথম নিজেদেরকে এ নামে পরিচয় দান করেছিলেন, তাঁরাতো তাঁর জন্য এ জাতীয় কোনো বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার ধারণায় আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না। এ ভ্রান্ত শির্কী বিশ্বাস পোষণকারীগণ হয়তোবা এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অসীম জ্ঞানের অধিকারী ও মর্যাদাবান বলে তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান; কিন্তু তাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এ জাতীয় বিশ্বাসের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে অধিক সম্মান প্রদর্শন করার অর্থ হচ্ছে- অধিক মাত্রায় শির্কে নিমজ্জিত হওয়া ও

ইসলাম থেকে পূর্ণমাত্রায় বেরিয়ে যাওয়ার শামিল।[৪৬] এ জাতীয় শির্ককারীদের ব্যাপারে মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী বলেন :

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-গায়েব জানতেন এ জাতীয় বিশ্বাস পোষণ করা প্রকাশ্য শির্ক।"[৪৭]

মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী এ জাতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কে বলেন :

"আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে এ ধারণা পোষণ করা যে, নবীগণ গায়েব জানেন, তাঁরা সকল স্থান থেকে মানুষের আহ্বান শ্রবণ করেন, এ জাতীয় আক্বীদা-বিশ্বাস ভ্রান্ত ও শির্ক।"[৪৮]

আমাদের দেশে এ-জাতীয় শির্কী চিন্তাধারা ও বিশ্বাস ভ্রান্ত তরীকত পন্থী এবং আহমদ রেজা ব্রেলভী (১৮৫৬-১৯২১ খ্রি.) এর অনুসারীদের মাধ্যমে অনুপ্রবেশ করেছে; কেননা, মা'রিফাতের দাবীদার ভ্রান্ত তরীকতপন্থীরা এ জাতীয় ধারণা শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারেই পোষণ করে না,

---

[46]. শেখ সুলাইমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুনি', প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩১।

[47]. দেখুন : রশীদ আহমদ গাংগুহী, ফতাওয়া রশীদিয়্যাহ; ২/১০।

[48]. শাহ 'আব্দুল 'আযীয আদ-দেহলভী, **তাফসীরে ফাতহুল আযীয;** পৃ. ৫৩।

তারা ওলিদের ব্যাপারেও উপর্যুক্ত ধারণা পোষণ করে। আহমদ রেজা ব্রেলভীও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারে এ জাতীয় শির্কী চিন্তাধারা পোষণ করত এবং তার ও তার অনুসারীদের দ্বারাই এ চিন্তাধারা পাকিস্তান, ভারত ও আমাদের দেশে অধিকমাত্রায় অনুপ্রবেশ করেছে। সে কারণেই ভারত মহাদেশের বিশিষ্ট আলেমগণকে আহমদ রেজা ব্রেলভী এর ভ্রান্ত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর দেখতে পাওয়া যায়। তার চিন্তাধারার মুখোশ উন্মোচন কল্পেই লিখিত হয়েছে بريلوي مذهب أور إسلام এবং **بريلوي مذهب كي نيا روب** এ নামের দু'টি কিতাব।[৪৯]

২. ভাগ্য সম্পর্কে জানার জন্য জ্যোতির্বিদদের নিকট গমন করা এবং তাদের কথায় বিশ্বাস করা :

আমাদের দেশে বর্তমানে প্রফেসর হাওলাদারসহ[৫০] আরো অনেক জ্যোতির্বিদ রয়েছেন যারা তারকার গতিবিধি লক্ষ্য করে

---

[49]. মাওলানা নূর কেলীম কর্তৃক উর্দু ভাষায় লিখিত **'ব্রেলভী মাযহাব আওর ইসলাম'** কিতাবটি পাকিস্তানের ফয়সলাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এবং মাওলানা মোঃ 'আরিফ সম্বহলী কর্তৃক লিখিত **'ব্রেলভী ফিৎনা কি নয়া রূপ'** কিতাবটি পাকিস্তানের লাহোর থেকে **১৯৭৮** সালে প্রকাশিত হয়েছে।

[50]. প্রফেসর হাওলাদার দেশের একজন প্রখ্যাত জ্যোতিষ। প্রত্যেক সপ্তাহে তার রাশিচক্রের বর্ণিত ফলাফল পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়।

এর ফলাফল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় প্রকাশ করে থাকেন। এর দ্বারা তারা জনগণকে তাদের ভাগ্য সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করে আগাম সতর্ক করেন। রাশি ফলের এ জাতীয় প্রচারণা আমাদের দেশে এখন একটি সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। রাজধানী ঢাকাতে তাদের অনেকের চেম্বার রয়েছে। সাধারণ লোকেরা তাদের নিকট নিজ নিজ ভাগ্যে ভাল বা মন্দ কী অপেক্ষা করছে, তা আগাম জানার জন্য গমন করে। যারা ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হয়েছে, তারা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য পরামর্শ নেয়ার উদ্দেশ্যে তাদের নিকট গমন করে। অথচ তারা জানে না যে, ইসলাম জ্যোতির্বিদদের মানুষের ভাগ্য সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণীকে স্বীকার করে না এবং নিম্নজগতের প্রাণীর ভাগ্যে উর্ধ্ব জগতের গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকার প্রভাব আছে বলে দীর্ঘকাল থেকে মানুষের মাঝে যে বিশ্বাস গড়ে উঠেছে, সেটাকে ইসলাম শির্কী চিন্তাধারা হিসেবে গণ্য করে; কেননা, বিশ্বজগত এককভাবে মহান আল্লাহর নির্দেশ ও তাঁর পরিকল্পনানুযায়ী পরিচালিত হয়ে থাকে। আমাদের ন্যায় সকল গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজী আল্লাহরই সৃষ্টি। এগুলোকে আমাদের ভাগ্যের ভাল বা মন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য সৃষ্টি করা হয় নি। এ সব একান্তই আবহমান কালের মানুষের কল্পনা ও ধারণাপ্রসূত কথা বৈ আর কিছুই নয়। এ সব বিশ্বাসের

ফলেই একবার মানুষ তারকার কাল্পনিক মূর্তি বানিয়ে এর পূজা করতে অভ্যস্ত হয়েছিল।

তারকা সৃষ্টির রহস্য :

আমরা মহাশুন্যে কতক ঘুর্ণমান ও কতক স্থির গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজি দেখতে পাই। এরা সবাই আল্লাহর সুনির্দিষ্ট বিধানের অধীনে মহাশুন্যে অবস্থান করছে। এদের সৃষ্টির পিছনে মহান আল্লাহর আসল উদ্দেশ্য কী, সে সম্পর্কে তিনি কুরআনুল কারীমের কোথাও বিস্তারিতভাবে কোনো তথ্য প্রদান না করে থাকলেও সংক্ষেপে এ সব সৃষ্টির কিছু উদ্দেশ্য ও উপকারিতার কথা বর্ণনা করেছেন। যেমন এ সম্পর্কে বলেছেন :

﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَٰبِيحَ وَجَعَلْنَٰهَا رُجُومًا لِّلشَّيَٰطِينِ﴾ [الملك: ٥]

“আমি পৃথিবীর নিকটতম আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত করেছি, সেগুলোকে শয়তানের জন্য ক্ষেপনাস্ত্রস্বরূপ তৈরী করেছি।”[৫১]

এ আয়াত দ্বারা তারকা সৃষ্টির পিছনে আল্লাহর একটি উদ্দেশ্য ও তা সৃষ্টির একটি উপকারিতার সন্ধান পাওয়া যায় : এ

---

[51]. আল-কুরআন, সূরা মুলক : ৫।

সব সৃষ্টির উদ্দেশ্য হচ্ছে- পৃথিবী সংলগ্ন আকাশকে সাজানো। আর এর উপকারিতা হচ্ছে- যে সকল জিন শয়তান উর্ধ্বজগতে গিয়ে ফেরেশতাদের কথোপকথন শ্রবণ করতে চায়, সে সব শয়তানদের উপর তারকারাজি থেকে কোনো আগ্নেয় উপাদান নিক্ষেপ করার কাজে এ সব তারকাকে ব্যবহার করা হয়।[৫২]

মানব জীবনে তারকা সৃষ্টির পিছনে কী উপকারিতা রয়েছে সে সম্পর্কে অন্যত্র বলা হয়েছে :

﴿ وَعَلَٰمَٰتٖۚ وَبِٱلنَّجۡمِ هُمۡ يَهۡتَدُونَ ١٦ ﴾ [النحل: ١٦]

“এবং তিনি পথ নির্ণায়ক অনেক নিদর্শনাদি সৃষ্টি করেছেন, আর তারকা দ্বারা তারা পথের নির্দেশনা লাভ করে।”[৫৩]

---

52. মুফতি মুহাম্মদ শফী‘ ইমাম কুরত্ববী থেকে বর্ণনা করেন : নক্ষত্ররাজিকে শয়তান বিতাড়িত করার জন্যে নিক্ষেপ করার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, নক্ষত্ররাজি থেকে কোন আগ্নেয় উপাদান শয়তানের দিকে নিক্ষেপ করা হয় এবং নক্ষত্ররাজি স্বস্থানেই থেকে যায়। সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিতে এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নক্ষত্রের ন্যায় গতিশীল দেখা যেতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই এটাকে তারকা খসে যাওয়া বলা হতে পারে। দেখুন : **মুফতি মুহাম্মদ শফী‘, প্রাগুক্ত;** পৃ. ১৩৯২।

53. আল-কুরআন, সূরা নাহাল : ১৬।

অপর আয়াতে বলা হয়েছে:

﴿وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهۡتَدُواْ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۗ﴾ [الانعام: ٩٧]

"তিনি হলেন সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য তারকারাজি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা এর দ্বারা স্থল ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও।"[৫৪]

এ দুটি আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, তারকা সৃষ্টির পিছনে মানব জীবনে যে প্রত্যক্ষ উপকারিতা রয়েছে তা হলো- সমুদ্র বা স্থল পথে রাতের বেলা চলার সময় তাদের সাথে দিকদর্শনের জন্য যদি কোনো যন্ত্রপাতি না থাকে, তা হলে তারা তারকার প্রতি লক্ষ্য করে পথের নির্দেশনা লাভ করবে। এই হচ্ছে নক্ষত্রপুঞ্জ সৃষ্টির পিছনে আল্লাহ তা'আলার কী উদ্দেশ্য রয়েছে এবং মানব জীবনে এর প্রত্যক্ষ কী উপকারিতা, তার একটি বর্ণনা। এর বাইরে যদি আমরা বিজ্ঞানের আলোকে তারকা সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে যাই তা হলে এটুকু বলতে পরি যে, বিশ্বজগত সুষ্ঠুভাবে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত পরিচালিত হওয়ার জন্য মহান আল্লাহ মহাশূন্যে এ সব গ্রহ, নক্ষত্র ও তারকারাজি সৃষ্টি

---

[54] . আল-কুরআন, সূরা আল-আন'আম : ৯৭।

করেছেন। বর্তমানে বিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে বলেই আমাদের পক্ষে এ সব সৃষ্টির এ উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত হওয়া সম্ভব হয়েছে। কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে মহাশূন্য সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান এতদূর অগ্রসর হয় নি বলেই কুরআনে এ উদ্দেশ্যের কথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত না হয়ে যে উদ্দেশ্য ও উপকারের কথা তৎকালীন মানুষের বোধগম্য হয় কেবল সে উদ্দেশ্য ও উপকারের কথাই তাতে বর্ণনা করা হয়েছে।

অতীত ও বর্তমান জ্যোতির্বিদদের মধ্যে পার্থক্য :

কুরআন অবতীর্ণকালীন সময়ে সমাজে যারা কাহিন বা জ্যোতির্বিদ নামে পরিচিত ছিল, তারা মোট দু'টি মাধ্যমের উপর নির্ভর করে ভবিষ্যদ্বাণী করতো :

এক . তারকারাজির গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য করে আবহমান কাল থেকে জ্যোতির্বিদরা আন্দাজ ও অনুমানের উপর নির্ভর করে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল, সে অভিজ্ঞতার আলোকে তাদের মাঝে ভবিষ্যদ্বাণী করার যে রীতি চলে আসছিল, সে রীতি অনুযায়ী তারা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতো।

দুই. জিনরা উর্ধ্বাকাশে গিয়ে ফেরেশতারা পৃথিবীর কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে গোপনে তা শ্রবণ করে তাদের কাছে

এসে এর সাথে আরো অসংখ্য মিথ্যা মিশ্রণ করে সংবাদ দিতো এবং সে সংবাদের আলোকেই তারা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করতো। ফলে তাদের কিছু কথা বাস্তবের সাথে মিলে যেতো। এ জাতীয় ভবিষ্যৎ প্রবক্তাদের উত্তরসূরীরা এখনও সকল দেশেই কম-বেশী রয়েছে। তবে এদেরকে আর আধুনিক জ্যোতির্বিদদেরকে একপাল্লায় বিচার করা যায় না; কারণ, পুরাতন জ্যোতিষ ও তাদের উত্তরসূরীগণ পুরাতন নিয়মানুযায়ী তারকার গতিবিধি লক্ষ্য করে আন্দাজ ও অনুমান করে মানুষের ভাগ্যের ব্যাপারে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তারা একদিকে যেমন বাস্তবে সত্যিকার অর্থেই কিছু ঘটতে যাচ্ছে এমন কিছু জেনে কোনো কথা বলতে পারেন না, অপরদিকে তেমনি তারা যা বলেন এর দু'একটি কথা ঘটনাক্রমে সত্য বলে প্রমাণিত হলেও বাদবাকী সবই মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়। যেমন ২০০৪ সনে অনুষ্ঠিত আমেরিকার নির্বাচনের ফলাফল দ্বারা তাদের মিথ্যাবাদিতা প্রমাণিত হয়েছে। তথাকথিত জ্যোতির্বিদরা বলেছিল এবারের নির্বাচনে জন কেরি জয়ী হবেন, কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। পক্ষান্তরে আধুনিক জ্যোতির্বিদগণ যা বলেন তা কোনো অদৃশ্য সম্পর্কিত বিষয় নয়। তারা আধুনিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সৌরজগত সম্পর্কে নিত্য নতুন যে সব আবিষ্কারের কথা বলেন, তাদের সে সব কথা সত্য হোক আর না হোক তা যেমন মানুষের ভাগ্যের সাথে সম্পৃক্ত কোনো অদৃশ্য

সম্পর্কিত কথা নয়, তেমনি তা মিথ্যা হলেও এতে মানুষের ব্যক্তি জীবনেও এর কোনো বিরূপ প্রভাব নেই। জ্যোতিষরা মানুষের ভাগ্য সম্পর্কে জানে এবং এ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে এ মর্মে জনমনে যে বিশ্বাস রয়েছে ইসলামী শরী'আতে এ বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। বরং নিম্ন জগতের ঘটনা প্রবাহের উপর উর্ধ্ব জগতের তারকার প্রভাবে বিশ্বাস করাকে ইসলামে শির্কী বিশ্বাস বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এমন বিশ্বাসীকে হাদীসে কুদসীতে কাফির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[৫৫]

১. জিন ও জিন সাধকরা গায়েব সম্পর্কে জানতে পারে বলে বিশ্বাস করা :

আমাদের দেশের অনেক লোকেরা জিনসাধকদের ব্যাপারে এ বিশ্বাস রাখেন যে, এরা ইচ্ছা করলে গায়েব সম্পর্কে জানতে পারে। সে-জন্য দেখা যায় কারো কিছু চুরি হলে বা কেউ কোনো সমস্যায় পতিত হলে, তারা দ্রুত কোনো জিনসাধকের শরণাপন্ন হন। সেখানে যেয়ে চুরি হওয়া দ্রব্য এবং চোর সম্পর্কে জানতে চান। দ্রব্যটি এখনও অক্ষত অবস্থায় আছে কি না এবং কিভাবে তা পাওয়া যেতে পারে, সে সম্পর্কেও জানতে চান। বিভিন্ন রোগীরাও তাদের নিকট গিয়ে তাদের রোগটা কী এবং কিভাবে

[55]. হাদীসটি প্রথম অধ্যায়ে টীকায় দেখুন।

তা আরোগ্য হতে পারে, তা জানতে যান। জিনসাধকেরা মানুষের সমস্যার সমাধান কল্পে যে সব কথা বলে, অনেক সময় তা বাস্তবের সাথেও মিলে যায়, সে জন্যেই সাধারণ মানুষের মাঝে তাদের সম্পর্কে উক্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। জিনসাধকদের কোনো কোন কথার সত্যতা বাস্তবে প্রমাণিত হলেও এর দ্বারা তারা গায়েব সম্পর্কে জানে বা জানতে পারে, এ কথা বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই; কেননা, জিনসাধকেরা বাড়ীতে বসে থাকলেও তারা জিনের সহযোগিতায়ই তাদের অসাক্ষাতে ঘটিত ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। তারা তাদের বশ্যতা স্বীকারকারী বন্ধু জিনকে সর্বাগ্রে এ কাজে ব্যবহার করে। যে সব বিষয়াদি তাদের কাছে আসে তা যদি তাদের বন্ধু জিনের উপস্থিতিতে ঘটে থাকে, তা হলে সে তার নিজের দেখানুযায়ী এ ঘটনা সম্পর্কে তথ্য দান করে। আর তার অসাক্ষাতে ঘটে থাকলে ঘটনাস্থলে গিয়ে সেখানকার জিনদের সহযোগিতা নিয়ে ঘটনা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে এসে তার বন্ধুকে সংবাদ দান করে। অনেক সময় কোনো সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে না পারলে আন্দাজ ও অনুমান করে কিছু বলে দেয়। ইসলাম পূর্ব যুগেও এ ধরনের জিনসাধকরা ছিল। তখন তাদেরকে ‘কাহিন’ বলা হতো। জিনদের সহযোগিতায়ই তারা জনগণকে বিভিন্ন তথ্য ও পথ্য দিতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে উক্ত

বিশ্বাসের আলোকে লোকেরা জিনসাধক ‘কাহিনদের’ কাছে যেতো, সে জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করেছিলেন। এ নিষেধ সংক্রান্ত দলীল আমরা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি। জিনরা যে অদৃশ্য বা গায়েব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারে না, তাও কুরআনুল কারীম দ্বারা প্রমাণিত। সুলায়মান (আ.) বায়তুল মাক্বদিস নির্মাণের সময় জিনদেরকে নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজে লাগিয়েছিলেন। গৃহ নির্মাণ শেষ হওয়ার পূর্বে লাঠির উপর নির্ভর করে দাড়িয়ে থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলে জিনরা তাঁর মৃত্যুর কথা বুঝতে না পেরে যথারীতি নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল, নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর ঘুণ পোকায় লাঠি খেয়ে ফেলার ফলে তিনি পড়ে গেলে তারা বুঝতে পারলো যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তখন তারা আফসোসের সাথে বলেছিল যে, যদি তারা তা পূর্বে বুঝতে পারতো তা হলে এ কঠিন কাজে তারা এতদিন লেগে থাকতো না। এ ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُوا۟ فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾﴾ [سبا: ١٤]

"যখন আমি সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।"[৫৬]

আজও যারা জিন সাধক ও জিনরা গায়েব জানে, এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের কাছে যাবে, তাদের পরিণতিও ইসলাম পূর্ববর্তী সময়ের লোকদের মতই হবে।

৪. পাখি বা বানরের মাধ্যমে ভাগ্য জানার চেষ্টা করা :

ঢাকা শহরের গুলিস্তান এলাকার ফুটপাতে বসে কোনো কোন ব্যক্তিকে একটি টিয়া (Parot) বা বানরের মাধ্যমে ভাগ্যাহত মানুষের ভাগ্যের ভাল-মন্দ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে দেখা যায়। তারা তাদের সম্মুখে সাজিয়ে রাখেন কিছু খাম। খামের ভিতরে থাকে ভবিষ্যৎ জীবনে ভাগ্যের ভাল-মন্দ সম্পর্কে বিভিন্ন কথা। ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হয়ে কেউ তাদের কাছে ভাগ্য সম্পর্কে জানতে গেলে লোকটির নির্দেশে সে টিয়া পাখি বা বানর তার সামনে সাজিয়ে রাখা খামগুলো থেকে একটি খাম উত্তোলন করে

[56]. আল-কুরআন, সূরা সাবা : ১৪।

লোকটির হাতে তুলে দেয়। এবার লোকটি খামের ভিতরের কাগজটি বের করে তাতে যা লিখা রয়েছে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পড়ে শুনায় বা তাকে পড়তে দেয়। এভাবেই সাধারণ লোকেরা টিয়া পাখি বা বানরের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে জানার চেষ্টা করে। খামের লিখা ভাল হলে এর দ্বারা তারা সাময়িকের জন্য হলেও আনন্দ উপভোগ করে, আর খারাপ হলে আরো হতাশাগ্রস্ত হয়। টিয়া পাখি বা বানরের মাধ্যমে সাধারণ লোকেরা নিজেদের ভাগ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়ার কারণ হলো- তারা এদের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করে যে, এরা অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত থাকে। জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকদের মাঝেও পাখির ডানে বা বামে উড়ে যাওয়া থেকে কোথাও ভ্রমণে যাওয়ার শুভ অশুভ জানার রেওয়াজ ছিল। এটি একটি শির্কী চিন্তাধারা হওয়াতে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- তা এই বলে রহিত করেন যে, [.. وَلاَ طِيَرَةَ ..] "...পাখি ডানে বা বামে উড়ে যাওয়ার সাথে ভাগ্যের ভাল বা মন্দের কোনো সম্পর্ক নেই..."।[৫৭] অপর হাদীসে তিনি বলেন: [الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ثَلاَثاً.]"পাখি উড়িয়ে বা উড়ে যাওয়া থেকে ভাগ্যের শুভ বা অশুভ নির্ধারণ করা

---

57. বুখারী, প্রাগুক্ত, ৫/২২৭৭, মুসলিম, প্রাগুক্ত; ৪/১৭৪২।

শির্ক। (এ কর্মটি যে শির্ক তা গুরুত্বের সাথে বুঝাবার জন্য) তিনি এ কথাটি তিন বার বলেন''।[৫৮]

১. আল্লাহর ওলিগণ গায়েব সম্পর্কে জানেন :

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদের মাঝে বিশেষ করে পীর ভক্তদের মাঝে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা আল্লাহর ওলিগণ তাঁদের রূহানী শক্তিবলে জানতে পারেন। এ ধারণার ভিত্তিতেই তারা দূর-দূরান্ত থেকে ওলিগণ কে 'ইয়া গাউস' 'ইয়া খাজা' ইত্যাদি বলে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে থাকেন। এমনকি ভক্তির আতিশয্যে তাদের কাউকে আল্লাহর যাবতীয় গুলাবলী দ্বারা খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীকে গুণান্বিত করতেও দেখা যায়। যেমন এক ব্যক্তি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-কে গুণান্বিত করতে গিয়ে বলেছে : সাত্তারুন মঈনুদ্দিন, ওয়াহিদুন মঈনুদ্দিন, সামী'উন মঈনুদ্দিন, আলীমুন মঈনুদ্দিন, আন-নাজিরু মঈনুদ্দিন ইত্যাদি।[৫৯] যার অর্থ হচ্ছে : মঈনুদ্দিন একাধারে

---

[58]. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; কিতাবুত ত্বিব, বাব : পাখি উড়িয়ে ভাগ্য যাচাই করার বর্ণনা; ৪/২৩০।

[59]. এ কথাগুলো মঈনুদ্দিন চিশতী (রহ.)-এর বার্ষিক ওরস উপলক্ষে তাঁর জনৈক ভক্তের দ্বারা প্রচারিত একটি দাওয়াতী হ্যান্ডবিল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

মানুষের সকল দোষ-ক্রটি গোপনকারী, একক, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ও সর্বদ্রষ্টা। না'উজু বিল্লাহ

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতীকে এভাবে গুণান্বিত করার অর্থ দাঁড়ায়- তিনি যেন আল্লাহর অবতার ছিলেন। সে জন্যই তিনি তাঁর ভক্তদের যাবতীয় বিষয়ের ব্যাপারে সম্যক অবহিত রয়েছেন। তিনি তাদের আহ্বান শ্রবণ করে থাকেন। এ সব ধারণার ভিত্তিতেই বিপদের সময়ে হোক আর স্বাভাবিক সময়ে হোক সর্বাবস্থায়ই তারা তাঁদেরকে এ সব নামে আহ্বান করে থাকেন। এমনকি নামাযের মুসল্লায় দাঁড়িয়েও তাদেরকে 'ইয়া গাউছ' বলে বড়পীর আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.)-কে আহ্বান করতে দেখা যায়।[৬০]

---

[60]. মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকাতে কামিল মুহাদ্দিস শ্রেণীতে ১৯৭৯-১৯৮১ সালে অধ্যয়ন করার সময় মোঃ আব্দুল মান্নান আ'জমী নামে চট্রগ্রাম জেলার আমার এক সহপাঠি ছিল। একদিন যোহরের সালাতের জন্য মুসল্লায় দাঁড়িয়ে 'ইয়া গাউস' বলে বড়পীর আব্দুল কাদির জীলানীকে আহবান করতে শুনলাম। তাকে বললাম- নামাযের মুসল্লায় দাঁড়িয়ে গাউসকে আহবান করছো? জবাবে সে বললো- গাউস আমার আহ্বান শ্রবণ করতে পারেন, তাই তাঁকে আহ্বান করলাম।

পরিচালনাগত শির্ক

ব্যবহার বা পরিচালনাগত শির্কের পরিচিতি সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে এর পরিচিতি সম্পর্কে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, এ বিশ্বজগতের মালিকানাতে যেমন আল্লাহর কোনো শরীক নেই, তেমনি গাউছ, কুতুব ও আবদাল নামে এর ছোট থেকে বড় কোনো কিছু পরিচালনার ক্ষেত্রেও তাঁর কোনো শরীক বা সাহায্যকারী নেই। তিনি যেমন বিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার সাথে তাঁর এ জগতের সবকিছু পরিচালনা করেন, ঠিক তেমনিভাবে তিনি পরজগতও পরিচালনা করবেন। এ সৃষ্টিজগতের কারো পক্ষে তাঁর পরিচালনা কর্মে তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত কারো ব্যাপারে শাফা'আত করারও কোনো অধিকার নেই। এ জগতে মানুষ তাঁরই সৃষ্ট একটি সম্মানিত জীব। তাদের ভাগ্যের ভাল-মন্দ সব কিছুই তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। হিকমতের ভিত্তিতে যাকে ইচ্ছা প্রভূত কল্যাণ বা অকল্যাণ দিয়ে থাকেন। তাই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য অপর কোনো মানুষের মধ্যস্থতা পরিহার করে সরাসরি কেবল তাঁরই নিকট বিনয়ের সাথে চাইতে হবে। মানুষেরা পরস্পরের পূর্ব অনুমতি ছাড়াই একে অপরের কাছে অন্যের জন্য শাফা'আত করতে পারে, তারা পারস্পরিক প্রয়োজনে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একে অপরের সুপারিশ অনুযায়ী কাজও করে; কিন্তু

আল্লাহর বিষয়টি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, তাঁর সামনে তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত শাফা'আত করারও কেউ নেই, কারো নাম শুনেও তিনি প্রভাবিত হন না। তাঁর কাছে কিছু চাইতে হলে তাঁর উত্তম নামাবলীর মাধ্যমে বা ওসীলার অন্যান্য বৈধ পন্থায় তা চাইতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা অপর কোনো ওলিদের নামের ওসীলায় নয়; কেননা, তাঁর নিকট কারো নামের ওসীলায় কিছু চাওয়া তাঁর সাথে মানবীয় আচরণ ও তাঁকে তাঁর সৃষ্টির দ্বারা প্রভাবিত করার শামিল।

কোনো মানুষ বা কোনো বস্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো উপকার বা অপকার করতে পারে না; সে-জন্য জীবিত কোনো মানুষ বা কোনো বস্তুর দ্বারা কোনো উপকার বা অপকার অর্জিত হলে সে উপকার বা অপকারের কৃতিত্ব সে মানুষ বা সে বস্তুকে দেয়া যাবে না। কেউ যদি এর পূর্ণ কৃতিত্ব সে মানুষ বা সে বস্তুর বলে মনে করে, তবে এতে সে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে সে মানুষ বা সে বস্তুকে শরীক করে নিল বলে গণ্য হবে এবং তার এ মনে করাটি শর'য়ী দৃষ্টিতে শির্কে আকবার হিসাবে গণ্য হবে।

আল্লাহর পরিচালনা কর্মে কোনো হস্তক্ষেপকারী এ ধরাতে না থাকা সত্ত্বেও এবং তাঁর ইচ্ছার বাইরে কারো কোনো উপকার বা

অপকার করার মত কেউ না থাকা সত্ত্বেও আমাদের মুসলিম সমাজে এমন সব চিন্তা, চেতনা ও কর্ম রয়েছে যা এ কথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর পরিচালনা কর্মে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -সহ বিভিন্ন ওলিগণ হস্তক্ষেপ করতে পারেন। তিনি (আল্লাহ) তাঁর নবী ও অলিগণের নামের দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা মরে গেলেও তাঁদের রূহানী শক্তি বলে তাঁরা ইচ্ছা করলেই মানুষের যে কোনো উপকার করতে পারেন। **না'উজু বিল্লাহ।**

মুসলিম সমাজে প্রচলিত এ ধরনের কিছু পরিচালনাগত শির্কের উদাহরণ নিম্নে বর্ণিত হলো।

1. **বিপদ মুক্তির জন্য দরূদ বা খতমে নারী পাঠ করা:**

বিপদ মুক্তির জন্য ওসীলা করার শরী'আত নির্দেশিত বৈধ পন্থা রয়েছে, যার কিছু ইঙ্গিত একটু আগেই দেয়া হয়েছে। তবে এর বিস্তারিত বর্ণনা আমরা এ বই এর তৃতীয় অধ্যায়ে প্রদান করবো ইন-শাআল্লাহ। কিন্তু আমাদের দেশে ওসীলার নামে শরী'আত অনুমোদিত পন্থার বাইরে সূফীদের কর্তৃক উদ্ভাবিত দুরূদে নারী বা খতমে নারী নামে সাধারণত মাদ্রাসার শিক্ষকদের মাঝে অপর একটি ওসীলার বহুল প্রচলন রয়েছে। দরূদটি নিম্নরূপ :

"اللَّهُمَّ صَلِّ صَلاَةً كَامِلَةً وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا تَامًّا عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ الَّذِيْ تَنْحَلُّ بِهِ الْعُقَدُ وَ تَنْفَرِجُ بِهِ الْكُرَبُ ، وَتُقْضٰى بِهِ الْحَوَائِجُ ، وَتُنَالُ بِهِ الرَّغَائِبُ وَحُسْنُ الْخَوَاتِمَ، وَ يُسْتَسْقَى الغَمَامُ بِوُجْهِهِ الْكَرِيْمِ...."

"হে আল্লাহ! আমাদের নেতা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপর অনেক অনেক রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন, যার দ্বারা যাবতীয় সমস্যার গিঁট খুলে যায়, বিপদাপদ দূরীভূত হয়, সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয় এবং সকল কামনা, বাসনা ও ভাল পরিণতি অর্জিত হয়। যার মর্যাদাপূর্ণ মুখমণ্ডল অথবা তাঁর জাতের ওসীলা করে বৃষ্টি কামনা করা হয়।"

এ দরূদকে এ নামে নামকরণ করার কারণ হিসেবে বলা হয়ে থাকে যে, আগুন যেমন তাতে নিক্ষিপ্ত বস্তুকে পুড়ে ছাই করে দেয়, তেমনিভাবে এ দরূদটি ৪৪৪৪ বার পাঠ করলে নাকি তাও সকল বিপদাপদকে আগুনের মত পুড়ে ছাই করে দেয়। এ দুরূদের বাক্যগুলোর মধ্যে আমরা বাহ্যতই দেখতে পাচ্ছি যে, তাতে বিপদ মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার বদলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। আর রাসূলের ব্যাপারে এ ধারণা পোষণ করা হচ্ছে যে, তাঁর দ্বারা যাবতীয় উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। অথচ তিনি বা কারো ব্যাপারে এ জাতীয় ধারণা করা আল্লাহর পরিচালনা কর্মে হস্তক্ষেপ করার

শামিল। সে জন্য আল্লামা জাযাইরী[৬১] (মৃত ১৯৯৯ খ্রি.) এ দরূদ প্রসঙ্গে বলেন :

"إن هذه الصلاة لا تجوز؛لأن فيها إسناد حل العقد ...إلى آخره إلى الرسول ﷺ ، وهذا شرك أو كفر"

''এ দরূদ পাঠ করা জায়েয নয়। কারণ; এতে সমস্যার গিঁট খোলাসহ দো'আয় বর্ণিত অন্যান্য বিষয়াদিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে। আর এ ধরনের কথা শির্ক অথবা কুফর এর অন্তর্গত''।[৬২]

ইবনে আব্দিল হাদী (৭০৪-৭৪৪ হি:) বলেন: ''রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার মানসে তাঁর ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে,

---

[61]. শায়খ আব্দুর রহমান আল-জাযাইরী তিনি মূলত আলজিরিয়ার অধিবাসী হয়ে থাকলেও পরবর্তীতে সৌদী আরবের নাগরিকত্ব লাভ করেন। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা এর একজন অধ্যাপক ছিলেন। মসজিদে নববীতে স্থায়ীভাবে তাফসীরের দারস দিতেন। তিনি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে 'আয়সারুত তাফাসীর, মিনহাজুল মুসলিম ও 'আক্বীদাতুল মু'মিন ইত্যাদি গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। - লেখক

[62]. আবু বকর জাবির আল-জাযাইরী, ওয়া জা-উ ইয়ারকুদুনা!!! মাহলান ইয়া দু'আতাদ দলালাহ; পৃ. ৬০।

তিনি গায়েব সম্পর্কে জানেন, কিছু দিতেও পারেন এবং দিতে বারণও করতে পারেন, যারা বিপদের সময় আল্লাহকে ব্যতীত তাঁকে আহ্বান করে তিনি তাদের কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের ক্ষমতা রাখেন, আল্লাহ তা‘আলার পূর্ব অনুমতি ছাড়াই তিনি যে কারো ব্যাপারে শাফা‘আত করতে পারেন এবং যাকে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবেন, তাঁর সম্মানের ক্ষেত্রে এ ধরনের বাড়াবাড়ি করা অতি মাত্রায় শির্ক করা ও গোটা দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাওয়ারই শামিল।”[৬৩]

২. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করে তাঁকে আল্লাহর অবতারে পরিণত করা :

আমাদের দেশে এমনও কিছু মানুষ রয়েছেন যারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অতি সম্মান দেখাতে গিয়ে তাঁর প্রশংসায় এমন সব কথা-বার্তা বলেন যা তাঁকে আল্লাহ ও প্রতিপালকের মর্যাদায় উন্নীত করে। মনে হয় যেন তিনি আর আল্লাহর মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। আল্লাহ নিজেই যেন মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আকৃতিতে এ পৃথিবীতে নিজেকে প্রকাশ করেছেন এবং তিনিই যেন আল্লাহর

[63]. শেখ সুলাইমান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুনী‘, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩১।

হয়ে এ-জগত পরিচালনা করেন। তাদের এ-জাতীয় শির্কী কথা-বার্তার কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

ক)

جوتھا عرش پرمستوي خدا هو کر** وه أتر يرا زمين مين مصطفى هو کر

'যিনি খোদারূপে আরশের উপর ছিলেন, তিনি পৃথিবীতে মুস্তাফারূপে অবতরণ করেন'।

খ) 'আরশে যিনি আহাদ ছিলেন, ফরশে (যমিনে) তিনি আহমদ হলেন''।

গ) 'আহাদ আর আহমদের মাঝে শুধু মীম অক্ষরের পার্থক্য রয়েছে, মীমকে মাঝ থেকে সরিয়ে দিলে আহাদ আর আহমদকে একই দেখতে পাবে'।

ঘ) 'আহমদের ঐ মীমের পর্দা উঠিয়ে দে রে মন

দেখবি সেথা বিরাজ করেছে আহাদ নিরঞ্জন'।

ঙ)

محمد با شكل عرب آمده است ** عين را حذف كن كه رب آمده است

'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-একজন আরবী মানুষের আকৃতিতে আগমন করেছেন, আরব শব্দের 'আইন' অক্ষরকে বিলুপ্ত করে দিলে দেখতে পাবে প্রকৃতপক্ষে রবই আগমন করেছেন'।

চ) 'بظاهر محمد بباطن خدا' মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যত মুহাম্মদ হয়ে থাকলেও গোপনে তিনি খোদা।'

ছ) محمد گرچہ خدا نہیں ولیکن خدا سے جدا بھی نہیں "মুহাম্মদ যদিও খোদা নন, তবে তিনি খোদা থেকে পৃথকও নন।"

জ) رسول خدا خود خدا بنکے آیا "আল্লাহর রাসূল স্বয়ং খোদা হয়ে আগমন করেছিলেন।"

ঝ) خالق کل نے آپکو مالك کل بنا دیا "সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা আপনাকে সব কিছুর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন।"[৬৪]

---

[64]. মুহাম্মদ ফজলুল করীম, **তৌহীদ-রেসালত ও নূরে মুহাম্মদী (সা.)-এর সৃষ্টি রহস্য;** (কুমিল্লা : জমইয়াতু উলামাই আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা'আত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৪৮-৫০।

মাইজভাণ্ডারের অনুসারীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে আল্লাহ বলে বিশ্বাস করার পাশাপাশি তাদের পীর আহমদুল্লাহ ভাণ্ডারীকেও তারা আল্লাহ বলে বিশ্বাস করেন। তাই তাকে লক্ষ্য করে তারা বলেন : **"একের ভিতরে তিনের খেলা বুঝব কী করে, তুমি আল্লাহ, তুমি রাসূল, তুমি ভাণ্ডারী।"**

তাদের ধারণা মতে, আল্লাহ নিজেই একবার রাসূল হিসেবে আবার ভাণ্ডারী হিসেবে আগমন করেছিলেন। **নাউজুবিল্লাহ।**

উল্লেখ্য যে, উর্দু ও ফার্সী ভাষায় লিখিত কবিতাগুলোর লেখকগণ পরদেশী হলেও আমাদের দেশের ভ্রান্ত তরীকতপন্থীগণ এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্তুতি বর্ণনার ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘনকারীগণ কবিতার এ পংক্তিগুলো খুব ভালো করেই রপ্ত করে থাকেন এবং সাধারণত ১২ ই রবীউল আউয়াল উপলক্ষ্যে আয়োজিত ঈদে মিলাদুন্নবী উৎসবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভালবাসা প্রকাশার্থে তারা এ সব গাইতে থাকেন। ইসলামের দৃষ্টিতে অবতারবাদ একটি শির্ক ও কুফরি বিশ্বাস হয়ে থাকলেও তাদের এ সব ধ্যান-ধারণা ও কথা বার্তার দ্বারা মনে হয় যে, তারা খ্রিস্টান ও হিন্দুদের ন্যায় অবতারবাদে বিশ্বাসী। তাদের মাঝে এ জাতীয় ধারণা ও বিশ্বাস যে হিন্দু ও

খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে অনুপ্রবেশ করেছে, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

৩. অলিগণের মধ্যে যারা গউছ ও কুতুব তারা পৃথিবী পরিচালনা করেন বলে বিশ্বাস করা :

আমাদের দেশে ভ্রান্ত তরীকত ও মা'রিফাতপন্থীদের মাঝে এমন একটি অদ্ভূত বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা তাঁর অলিগণের মধ্য থেকে কতিপয় লোকদেরকে পৃথিবীর বিভিন্ন কর্ম পরিচালনা জন্য গউছ, কুতুব ও আব্দাল ইত্যাদি পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন। সরকারী ক্ষমতা লাভ, প্রশাসনের বিভিন্ন পদের নিয়োগ, বদলী ও অপসারণ তাঁদেরই ইশারায় নাকি হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের হাতে কাউকে কিছু দেয়া বা না দেয়া, কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষমতা দান করে থাকেন। 'দেওয়ানুস সালেহীন' নামে তাঁদের নাকি একটি পরামর্শ পরিষদও রয়েছে। সেখানে বসেই তাঁরা যাবতীয় বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সে অনুযায়ী ফরমান জারী করেন। এমনকি তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই নাকি আদালতের যাবতীয় রায়সমূহ জারী হয়ে থাকে।[৬৫] এ-জাতীয় ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই বড় পীর আব্দুল

---

[65]. মাওলানা ফজলুল হক নামে 'ফাজিলে দেওবন্দ' ডিগ্রী অর্জনকারী মাদ্রাসা-ই-আলীয়া, ঢাকা'র একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন। দেওবন্দে অধ্যয়নকালে

কাদির জীলানীকে ‘গউছে আ‘যম’ (বড় উদ্ধারকারী) বলে নামকরণ করা হয়েছে। এ ধারণার ভিত্তিতেই পীরদের ভক্তগণ তাদের পীর সাহেবদেরকে ‘যামানার কুতুব’ নামে খেতাব দিয়ে থাকেন। গাউছ ও কুতুব সম্পর্কিত এ বিশ্বাস যে শুধু সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে, তা নয়; এ ধরনের বিশ্বাস অনেক আলেমদের মাঝেও রয়েছে। যার জ্বলন্ত প্রমাণ হলেন জমঈয়াতুল মুদাররিছীনের সভাপতি ও ইনকিলাব পত্রিকার মালিক মাওলানা আব্দুল মান্নান। তিনি তাঁর পত্রিকায় এ মর্মে একটি প্রবন্ধ বিগত ২৮/৯/১৯৯৭ সালে প্রকাশ করেছিলেন। যার উদ্ধৃতি প্রথম অধ্যায়ে প্রদান করা হয়েছে। গউছ ও কুতুব সম্পর্কিত এ জাতীয় চিন্তাধারা ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ ব্যতীত অন্যান্য মুসলিম দেশের মুসলিমদের মাঝে নেই। এ-জাতীয় চিন্তাধারা তাদের মধ্যে

তিনি এ সম্পর্কিত কিছু ঘটনা শ্রবণ করেছিলেন। তন্মধ্যকার একটি ঘটনা নিম্নরূপ: একদা এক ব্যক্তি খুনের দায়ে অভিযুক্ত হলে তার বিরুদ্ধে মকদ্দমা হয়। লোকটিকে নির্দোষ সাব্যস্ত করে খালাস করে আনার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনরা মকদ্দমা চলাকালীন সময়ে একজন বিশিষ্ট আলেমের মাধ্যমে সে সময়ে যিনি দিল্লীর গাউছ ছিলেন, তাঁর শরণাপন্ন হয়। গাউছ বিষয়টি তাঁদের দেওয়ানে আলোচনা করেন এবং লোকটিকে নির্দোষভাবে খালাসের সিদ্ধান্ত পাশ করেন। পরবর্তীতে আদালতের বিচারকও সে অনুযায়ী তাকে নির্দোষ বলে রায় প্রদান করেন। [গাঁজাখুরী গল্প (সম্পাদক)]

প্রসারিত হওয়ার পিছনে কিছু হাদীস রয়েছে; যে-গুলো দুর্বল অথবা মাওযু' হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশেষজ্ঞগণের মাঝে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৬৬] ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাঃ এ-জাতীয় বিশ্বাস সম্পর্কে বলেন,

---

[66]. কেউ কেউ মুগীরাহ ইবনে শু'বাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাস হেলাল এর ব্যাপারে এ সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন, সে হাদীসে রয়েছে : তিনি কুতুবদের মধ্যকার একজন ছিলেন। এ হাদীসটি হাদীস বিশেষজ্ঞদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে বাতিল বলে গৃহীত হয়েছে। আবু নাঈম তাঁর 'হিলয়াতুল আউলিয়া' গ্রন্থে এবং শেখ আব্দুর রহমান আস-সুলামী তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থে এ সম্পর্কিত কিছু হাদীস বর্ণনা করেছেন, তা দেখে কারো ধোঁকায় পড়ার কোন অবকাশ নেই; কারণ, তাদের কিতাবাদিতে সহীহ, হাসান, যয়ীফ ও মাওদু' তথা মিথ্যা হাদীসের সমাহার রয়েছে যেগুলো মিথ্যা হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বিশারদদের মধ্যে কোনো মতবিরোধ নেই। এ ছাড়া আবুস শেখ নামক মুহাদ্দিস এর বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে এমন সব বর্ণনাকারীদের হাদীস রয়েছে, যারা হাদীসের মধ্যে বিশুদ্ধ আর বাতিল বলে কোনো পার্থক্য না করে যা-ই শ্রবণ করেছেন তা-ই বর্ণনা করার নীতি অবলম্বনকারী ছিলেন, যদিও প্রকৃত হাদীস বেত্তাগণ এ ধরনের হাদীস বর্ণনা করতেন না, এ কারণে যে, রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-থেকে বিশুদ্ধ সনদে প্রমাণিত হয়েছে তিনি বলেছেন :

«مَنْ حَدَّثَ بِحَدِيْثٍ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِبِيْنَ»

"একটি হাদীস মিথ্যা জানা সত্ত্বেও যে আমার পক্ষ থেকে তা বর্ণনা করলো, সে মিথ্যুকদের মধ্যকারই একজন।" দেখুন: ইবনে তাইমিয়্যাহ, **যিয়ারাতুল**

"وهذا كله باطل لا أصل له في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا قاله أحد من سلف الأمة، ولا أئمتها، ولا من المشايخ الكبار المتقدمين الذين يصلحون للاقتداء بهم ..."

"এ সব বাতিল বিশ্বাস। আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতে এ সবের কোনই ভিত্তি নেই, মুসলিম উম্মাহের অগ্রবর্তীদের মধ্যকার কেউ তা বলেন নি। তাদের ইমামগণও তা বলেন নি এবং অনুসরণীয় অগ্রবর্তী বড় বড় পীর-মাশায়েখগণও এ সব বলেন নি..."।[৬৭]

কুবূরি ওয়াল ইস্তেনজাদি বিল মাকবূর; (রিয়াদ : আর রিয়াসাতুল আ-ম্মাহ..., দারুল ইফতা, ১ম সংস্করণ, ১৪১০হি:), পৃ.৬৫।

[67]. ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.)-কে গাউছ ও কুতুব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : কোনো কোনো দলের লোকেরা এ সব কথা বলে থাকে, এবং ইসলাম ধর্মের মধ্যে বাতিল বিষয়ে এ সবের ব্যাখ্যা করে, যেমন কেউ কেউ বলে : গাউছ হলেন তিনি যার মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টির সাহায্য ও জীবিকা এসে থাকে, এমনকি তারা আরো বলে যে, ফেরেশতা ও সমুদ্রের মাছের সাহায্য ও গাউছের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এ জাতীয় ধারণা ঈসা আলাইহিস সালাম-এর ব্যাপারে খ্রিষ্টানরা এবং 'আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে বাড়াবাড়িকারীরা তাঁর ব্যাপারে যা বলে, সে সব কথারই অনুরূপ। এ জাতীয় ধারণা ও কথা প্রকাশ্য কুফরী। যারা এ সব বলবে তাদেরকে তাওবা করাতে হবে। তাওবা না করলে এদেরকে (মুরতাদ হওয়ার কারণে)

এ সম্পর্কে আল্লামা সুন‘উল্লাহিল হালাবী হানাফী বলেন :[৬৮]

إن مثل هذا الاعتقاد من موضوعات إفك المسلمين

“গউছ, কুতুব ও আব্দাল ইত্যাদি সম্পর্কিত বিশ্বাস মুসলিমদের মিথ্যা রচিত বিশ্বাসের অন্তর্গত।”[69]

হত্যা করা হবে; কেননা, সৃষ্টির মাঝে এমন কোনো ফেরেশতা বা মানুষ নেই যার মাধ্যমে সকল সৃষ্ট জীবের সাহায্য এসে থাকে ...। ‘গাউছ’ শব্দের দ্বারা আমি এটাই উদ্দেশ্য করেছি যা এদের কেউ কেউ বলে যে, পৃথিবীতে ৩১৩ জনেরও অধিক ব্যক্তি রয়েছেন যাদেরকে ‘নুজাবা’ বলা হয়, তাঁদের মধ্য থেকে পুনরায় ৭০ জনকে বাছাই করা হয়, যাদেরকে বলা হয় ‘নুক্বাবা’। এদের মধ্য থেকে ৪০ জনকে বাছাই করা হয়, তাঁদেরকে বলা হয় ‘আবদাল”। এদের মধ্য থেকে আবার সাত জনকে বাছাই করা হয়, তাঁদেরকে বলা হয় ‘আকতাব’। এদের মধ্য থেকে আবার চার জনকে বাছাই করা হয়, তাঁদেরকে বলা হয় ‘আওতাদ’। এদের মধ্য থেকে আবার একজনকে বাছাই করা হয়, যাকে বলা হয় ‘গাউছ’।... এরপর তিনি বলেন: এ সম্পর্কে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা বলা হলো, এর সবই বাতিল। প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৩-৬৪।

[68]. তিনি ১৭০৮ সালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর সময়ে তিনি মক্কা শরীফে হানাফী মাযহাবের একজন প্রখ্যাত ‘আলিম ছিলেন। একজন বিশিষ্ট ওয়াইয, ফক্বীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। দেখুন: ‘উমার রেজা কাহহা-লাহ, **মু‘যামুল মুআল্লিফীন**; (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিছালাহ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.), ১/৮৪৩।

আমাদের দেশে এমন সব লোকও রয়েছেন যারা এ বিশ্বাস করেন যে, মহান আল্লাহ অলিগণের আকৃতিতে আত্মপ্রকাশ করে থাকেন বিধায়, অলিগণের পরিচালনাগত শক্তি সীমাহীন হয়ে থাকে। তারা আরো বিশ্বাস করেন যে, ইতোপূর্বে আল্লাহ তা'আলা বাগদাদ, আজমীর ও মাইজভাণ্ডারে নিজের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। সে জন্য মাইজভাণ্ডারের ভক্তদেরকে এ জাতীয় ধারণা প্রকাশ করে কবিতা লিখতেও দেখা যায়। যেমন মাইজভাণ্ডারের এক হিন্দু ভক্ত লিখেছে:

---

[69]. এ জাতীয় বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান উপলক্ষে তিনি বলেন : "মুসলিমদের মাঝে এমন কিছু দলের আবির্ভাব ঘটেছে যারা এ দাবী করে যে, ওলিগণ জীবিত হোন আর মৃত হোন সর্বাবস্থায় জগত পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে, বিপদাপদে তাঁদের নিকট সাহায্য কামনা করা যায়,... তাঁদের মাঝে রয়েছেন আব্দাল, নুকাবা, আওতাদ ও নুজাবা..., কুতুবই হলেন সমগ্র মানুষের বিপদে সাহায্যকারী...। তিনি বলেন : এ জাতীয় কথার মধ্যে বাড়াবাড়ি রয়েছে, বরং এর মধ্যেই চিরস্থায়ী ধ্বংস ও শাস্তি অনিবার্য হয়ে রয়েছে। কেননা; এতে নিশ্চিতভাবে শির্ক রয়েছে। কুরআনের সাথে রয়েছে এর বিরোধ, সকল ইমাম ও মুসলিম উম্মাহের ঐকমত্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আক্বীদার সাথেও এর বিরোধ ও বৈপরিত্য রয়েছে...। মৃত্যুর পরেও ওলিগণ মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেন, এ জাতীয় বিশ্বাস সবচেয়ে জঘন্যতম বিশ্বাস...। আব্দাল ও গাউছ সম্পর্কে লোকেরা যা বলে তা তাদের মিথ্যা বানানো গল্প বৈ আর কিছুই নয়। দেখুন : শেখ সুলই্মান ইবন আব্দুল্লাহ ইবন মুনী', প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩২-২৩৪।

হায়রে দয়াল ভাণ্ডারী।

দোজাহানের মালিক আমার জগতের কাণ্ডারী।

(মাওলারে) তোমার নাম নিয়ে দিলাম ভব সাগরে পাড়ি।

পুলসেরাতে পার করিও দিয়ে চরণ তরী।

(মাওলারে) মানুষরূপে এলে চিনতে না পারি।

তুমি যদি দয়া কর এক পলকে তরি।

(মাওলারে) মদিনা, বাগদাদ, আজমিরের খেলা সাঙ্গ করি

চট্রগ্রামে রোশন করিলা হইয়া ভাণ্ডারী।

(মাওলারে) নাম শুনে তোমার দরজায় হয়েছি ভিখারী।

রমেশ বলে দোহাই তোমার এক নজরে চাও ফিরি।”[৭০]

কী আশ্চর্য যে, এ লোকটি একজন হিন্দু ধর্মাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীর একজন প্রথম শ্রেণীর উপাসকে পরিণত হয়েছে। হিন্দুরা যেমন তাদের রাম, কৃষ্ণ ও শিব ইত্যাদি দেবতাদের ব্যাপারে এরা আল্লাহর অবতার বলে বিশ্বাস করে, ঠিক তেমনি এ ব্যক্তি মাইজভাণ্ডারীর বেলায়ও একই ধারণা পোষণ করছে। সে তার অপর এক কবিতায় বলেছে : ভাণ্ডারীর পা নিয়ে সর্বদা চিন্তা করলে কখনও বিপদ হয় না। মানুষের পাপ মোচনের জন্যই মাইজভাণ্ডারে তাঁর শুভাগমন হয়েছিল। ভাণ্ডারীর পায়ের

[70]. স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র সরকার, মুক্তির দরবার; (চট্রগ্রাম: শ্রী পুলিন বিহারী শীল, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯২ খ্রি.), পৃ. ৮।

কথা চিন্তা করলে কা'বা, কাশী ও বৃন্দাবন সবই পাওয়া যায়। তাঁর প্রতি ভক্তি রেখে মুখে ভাণ্ডারী নাম জপ করলে আখেরাতে মুক্তি পাওয়া যাবে; কেননা, আখেরাতে ভাণ্ডারী ব্যতীত পার পাবার কোনো উপায় নেই। নিম্নে বর্ণিত তার কবিতার দ্বারা তার এ সব বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। যেমন সে বলেছে :

ভাব অবোধ মন হরদমে ভাণ্ডারী চরণ।
ঐ চরণে শরণ নিলে বিপদ হয় না কদাচন।
মাইজভাণ্ডারীর জোর কদমে কী ফল আছে জান না,
পাপীর ভাগ্যে দেখা দিল ভাণ্ডারেতে মাওলানা;
ঐ কদম বরকতে পাবি কা'বা কাশী বৃন্দাবন।
মাওলার প্রতি ভক্তি রাখ মুখে ডাক ভাণ্ডারী,
মাওলা বিনে আর কেহ নেই নিতে যাবে পার করি,"।[৭১]

শুধু এখানেই শেষ নয়, সে আরো দূর অগ্রসর হয়ে ভাণ্ডারীকে মানুষের ভাগ্যের উপর হস্তক্ষেপকারী ও তাদের যাবতীয় সুখ-দুঃখের মালিক বানিয়ে দিয়েছে। এ পর্যায়ে সে বলেছে:

কালি তোমার কলম তোমার, সুখ-দুঃখ লিখা সকল তোমার,
কে খন্ডাবে তুমি না খন্ডালে।[৭২]

---

[71]. তবেদ; পৃ. ২।

মাইজভাণ্ডারের মুসলিম ভক্তরা হয়তো উপর্যুক্ত সকল বিষয়ে এ ব্যক্তির চিন্তাধারার সাথে একমত নাও হতে পারেন। তবে একজন মানুষের পথভ্রষ্টতার জন্য তো তার একটি ভ্রান্ত ধারণাই যথেষ্ট। মাইজভাণ্ডারের বার্ষিক ওরসে যে সকল মুসলিমরা তাদের ভাগ্য পরিবর্তন ও সমস্যাদির সমাধান পাবার জন্য মানতের জীব, জন্তু ও নগদ টাকা অকাতরে বিলিয়ে দেন, সে সবই তাদের শির্কী কর্মে লিপ্ত থাকার দলীল হওয়ার জন্য যথেষ্ট। সেখানকার বার্ষিক ওরসে যে হারে হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে সবাই ভিড় জমায়, তাতে মনে হয় মাইজভাণ্ডার যেন সকল ধর্মাবলম্বী লোকদের জন্য একটি মহামিলন কেন্দ্র। এ সম্পর্কে সে ব্যক্তির ভাষ্য নিম্নরূপ:

"'আয়রে আয় রহমান' মনজেলে মাইজভাণ্ডার,
ঔরস মেলা প্রেমের খেলা দেখবি আশেকের গোলজার।
দুই দিকে দুই রওজা বাত্তি জ্বলে অনিবার,
হালকা তালে আশেক নাচে আল্লাহু জিকির সার,
উট, গরু, গয়াল, মৈষ সংখ্যা নাই ছাগল ভেড়ার,
মাঝে মাঝে নলকুপ আছে পিঁপাসী লোক পানি খায়।
কেহ ছিটে আতর গোলাপ বাবাজানের হুজুরায়,
বাবাজানের পশ্চিম পার্শ্বে রওজা শাজাদার,
কেহ রান্ধে কেহ খাওয়ায় খেদমতে আছে মশগুল,

---

[72]. তদেব; পৃ. ১১।

নানা রকম বাদ্য বাজে হক ভাণ্ডারী শব্দমূল,

হিন্দু, মুসলিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ মিলন কেন্দ্র প্রেম দরবার।”[৭৩]

ওলিগণ কি মানুষের কল্যাণ করতে পারেন?

বস্তুত আমাদের দেশের অধিকাংশ মুসলিমদের কবরে যাওয়ার কারণ ও উদ্দেশ্য নিয়ে গবেষণা করে আমার কাছে যা প্রতীয়মান হয়েছে তা হলো-আউলিয়া, পীর ও দরবেশদের অধিকাংশ ভক্তরা এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একমত যে, আউলিয়া ও দরবেশগণের জীবন আর মৃত্যু সবই সমান। কেননা, প্রকৃতপক্ষে তাঁরা মরেন না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে মৃত্যুর মাধ্যমে তাঁরা ইহজগত থেকে ইন্তেকাল করেন বা স্থানান্তরিত হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যান। এ সময়ে তাঁদের রূহানী শক্তি পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি হয়, যার ফলে পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে তাঁদেরকে আহ্বান করলে তাঁরা তা শুনতে পারেন এবং মানুষের যে কোনো কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণ করতে পারেন। এ ধারণার পরিপ্রেক্ষিতেই তারা তাদের কাছে তাদের পার্থিব ও পরকালীন যাবতীয় প্রয়োজনাদি নিয়ে আগমন করেন। রোগীরা যায় রোগ মুক্তির জন্য, সন্তানহীনরা যায় সন্তান লাভের জন্য, বিপন্নরা যায় বিপদ মুক্তির জন্য, চাকুরীহীনরা যায় চাকরী লাভের জন্য, অপরাধীরা যায় ক্ষমা

---

[73]. তদের; পৃ. ৮।

প্রাপ্তির জন্য; নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীরা নির্বাচনে জয়ী হওয়ার জন্য। তাদের কবরে যাওয়ার পার্থিব উদ্দেশ্য বিভিন্ন রকমের হলেও সকলের পরকালীন উদ্দেশ্য তাঁদের শাফা'আতের মাধ্যমে পরকালীন মুক্তি।

অনেকে মনে করে খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির কবর থেকে ফয়েজ ও বরকত উপচে পড়ছে। সেখানে যে যে উদ্দেশ্যেই তাঁকে আহ্বান করে, তাদের সকলের জন্যেই তাঁর দু'হাত প্রশস্ত হয়ে রয়েছে। এভাবে **"কেউ ফিরে না খালি হাতে খাজা তোমার দরবার হতে"** এ বাক্যটি তাঁর ভক্তদের নিকট একটি শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। তারা ওরস উপলক্ষে তাদের দাওয়াতী চিঠি-পত্রে এ জাতীয় শ্লোগান লিখে থাকেন। যেমন জনৈক কাজী মাহবুবুল আলম তার এক দাওয়াতী পত্রে লিখেছেন : **"তাহার এতই দয়া কেহ তাহার দরবার হইতে খালি হাতে ফেরে না। ওলি আল্লাহর নেক দৃষ্টি বিদ্যুতের ন্যায় মুহূর্তেই আপনার ভাগ্য পরিবর্তন করিতে পারে এবং আপনাকে শত বৎসর এবাদতের উর্ধ্বে তুলে দিতে পারে। আপনি খাজা সাহেবের নেক দৃষ্টি লাভ করুন।"**[৭৪]

---

[74]. কাজী মাহবুবুল আলম এর ঠিকানা : লিংক ইন্টারন্যাশনাল, আল-চেম্বার নং ১২২/১২৪, মতিঝিল , ঢাকা।

খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির ব্যাপারে তাঁর ভক্তদের ধারণা হচ্ছে- এক সময় আল্লাহ তাঁর নবীকে সব কিছু পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। এরপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এ দায়িত্ব অর্পণ করেছেন খাজা মঈনুদ্দিন চিশতিকে। তাদের এ জাতীয় ধারণা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর প্রশংসায় নির্মিত বাজারজাতকৃত গানের কেসেটে। যেমন তারা বলে থাকে :

খোদার ধন নবীকে দিয়া খোদা গেলেন খালি হইয়া
নবীর ধন খাজাকে দিয়া নবী গেলেন খালি হইয়া
খাজারে তোর দরবার হতে কেউ ফিরে না খালি হাতে।

অলিগণের ব্যাপারে তাদের আরো ধারণা হচ্ছে-তাঁরা সকল অসাধ্যকে সাধন করতে পারেন। সে-জন্যে তাদেরকে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা করার পরিবর্তে ওলিদের করুণার উপর ভরসা করতে দেখা যায়। যেমন এক ব্যক্তি তার মনের এ-জাতীয় অভিব্যক্তি প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছে : **"খোদারই পেয়ারা ওলি যে জন সংসারে, অসাধ্য সাধন করিতে সে পারে, তোমার দয়া না হলে বাবা আমার হবে কী উপায়।"**

অপর এক ব্যক্তি খাজা মঈনুদ্দিন চিশতির বার্ষিক ওরসে শরীক হওয়ার জন্য সাধারণ জনগণকে আহ্বান করতে গিয়ে বলেছে : **"গরীব নেওয়াজ যাহার দরবারে সর্বদা ফয়েজের সমুদ্র উছলিয়া পড়ে, সেই দয়ালু খাজা বাবার দরবারে আপনিও আসুন**

আল্লাহর রহমত পাইতে ও রোগ শোক দুঃখ দারিদ্রতা হইতে মুক্তি পাইতে। দীন ও দুনিয়ার পরম শান্তি লাভ করিতে ওরস মোবারকে শরীক হইয়া আপনিও ফয়েজ হাসিল করুন।”[৭৫]

ওরস উপলক্ষে আজমীর হতে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত এক দাওয়াতী পত্রে ওরসের মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে: “উরশ মোবারক এক সৌন্দর্য্য ও রহমতের দৃশ্য জানিবেন। এই রহমতের সময় আউলিয়া একরাম হইতে ফয়েজ বরকত হাসিল করার সময় ঐ পবিত্র সময় খাজা বাবার রূহানী ফয়েজ অগণিত ভাবে বিতরণ হইয়া থাকে, সকল আশেকীনরা ঐ নেক সময়ে সকল মনো কামনা পূরা করিয়া থাকেন এবং নেক সময়ে বাবার দরবার হইতে কেহ খালী হাতে ফেরেন না।”[৭৬]

নোয়াখালী জেলার মহীউদ্দিন এখলাসপুরীর ভক্তরা তার ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করে, তা যেন অতীতের সকল ওলিগণ কে অতিক্রম করে গেছে। তারা তার ব্যাপারে যে সব ধারণা পোষণ করে তা তাদের ওরস উপলক্ষে প্রকাশিত এক দাওয়াতী

---

[75]. এ দাওয়াত দাতার নাম : সৈয়দ আলমগীর চিশতী, এম. রহমান এন্ড কোং, ৩৭/ কে. বি.আব্দুস সাত্তার রোড, রহমতগঞ্জ, চট্রগ্রাম, বাংলাদেশ।

[76]. ১৯৭৮ সালে পীরজাদা মৌলভী সৈয়দ ফজলুর রহমান বোরাকী হতে সে বছরের ওরস উপলক্ষে প্রচারিত দাওয়াতী পত্র থেকে গৃহীত।

পোস্টারে এ ভাবে লিখিত রয়েছে: "...তিনি (মহীউদ্দিন) তাঁর জীবদ্দশায় জনগণের কল্যাণ সাধন করে গেছেন, এখনও (মৃত্যুর পরও) তিনি মানুষের কল্যাণ করে যাচ্ছেন। তিনি মানুষের দুঃখ দূরীকারী (গউছ) ছিলেন। তার হাতে দেশের বিচার ও শাসন ক্ষমতা ছিল। চট্রগ্রাম, নোয়াখালী, বরিশাল ও খুলনা জেলার উপকূলীয় এলাকায় সমুদ্রকে তার তাণ্ডবলীলা থেকে তিনি বারণ করেছিলেন। যার ফলে সে সব জেলার উপকূলীয় এলাকা ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়েছে। তার নিকট ৮৬ হাজার গউছ, কুতুব, আবদাল, নজীব ও আখইয়ার ইত্যাদির নেতৃত্বদানের রূহানী ও বাতেনী যোগ্যতা ছিল। কমপক্ষে আট হাজার ধনী, ব্যবসায়ী, সমাজের নেতৃত্বদানকারী ও শিল্পপতিরা তার মাধ্যমে তাদের জীবনে শান্তি লাভ করেছেন।"

কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্য পরিবর্তন : পীর, অলি, দরবেশ ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে বিনা সফরে যাদের কবর যিয়ারত করা যায়, তাদের কবর যিয়ারতের অনুমতি প্রদানের পিছনে শরী'আতের উদ্দেশ্য হচ্ছে কবরস্থ ব্যক্তির জন্য মাগফেরাত কামনা করে দো'আ করা এবং নিজের শেষ পরিণতি ও আখেরাতকে স্মরণ করা। মানুষেরা কবর যিয়ারতে গিয়ে শরী'আত বিরোধী কর্ম করে বিধায়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক সময় কবর যিয়ারত নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। কবর যিয়ারতের পিছনে

শরী‘আতের যে উদ্দেশ্য রয়েছে সে সম্পর্কে জনগণের অবগতির পর পরবর্তী এক সময়ে তিনি পুনরায় তা যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেন:

«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمِ الْآخِرَةَ»

“আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে (এক সময়) নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা যিয়ারত করো; কেননা, তা তোমাদেরকে আখেরাত স্মরণ করিয়ে দেয়।”[৭৭]

কিন্তু পীর ও ওলীদের ভক্তদের অবস্থা বিচার করলে দেখা যায়, তারা কবর যিয়ারতের মূল উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণভাবে ভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রবাহিত করে দিয়েছে। তারা কবরবাসী ওলির প্রয়োজন পূরণের বদলে তাঁদের কবরকে নিজেদের প্রয়োজন পূরণের স্থানে পরিণত করেছে। তারা মনে করছে- ওলীদের জন্য মাগফিরাত কামনা ও তাঁদের জন্য দো‘আ করার কোনো প্রয়োজন নেই; কেননা, তারাতো আল্লাহর নৈকট্য লাভে ধন্য হয়ে গেছেন! অথচ কুরআন ও হাদীস দ্বারা এ কথা প্রমাণিত রয়েছে যে, মানুষ সে

---

[77]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানাইয, বাব নং ৩৬, হাদীস নং ৯৭৭;২/৬৭২; নাসাঈ, প্রাগুক্ত; ৮/৩১০; তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানাইয, বাব নং ৬০, হাদীস নং ১০৫৪;৩/৩৭০।

যে-ই হোক না কেন, মৃত্যুর পর তার সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায়, সে জীবিতদের দো‘আর প্রতি আশান্বিত হয়ে থাকে। আমাদের পক্ষ থেকে তারা কোনো উপকার পেলে তারা আমাদের কল্যাণের জন্য দো‘আ করলেও তাদের এ দো‘আর কোনো কার্যকারিতা নেই বলে তা আমাদের কোনো কল্যাণে আসে না; কারণ, তারা মৃত, আর মৃত মানুষের এমন কোনো কর্ম নেই, যার দ্বারা তিনি নিজে বা অপর কেউ উপকৃত হতে পারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বলেছেন :

«إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ...»

“মানুষ যখন মরে যায় তখন তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়...।”[৭৮] এরপরও সাধারণ মানুষেরা যেমন ওলিদের ব্যাপারে এ হাদীসের বিপরীত চিন্তা করে, তেমনি আমাদের দেশের কোনো কোন নামধারী ওলি বা পীরদেরকেও অনুরূপ চিন্তা করতে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ সাতক্ষীরা জেলার বশিরহাটের পীর জনাব

---

[78]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ওয়াসিয়্যাহ, বাব নং ৩, হাদীস নং ১৬৩১, ৩/১২৫৫; তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আহকাম ..., বাব নং ৩৬, হাদীস নং ১৩৭৬;৩/৬৬০; আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; ৩/১১৭; আদ-দা-রিমী, আব্দুল্লাহ ইবন আব্দুর রহমান, আবু মুহাম্মদ, **সুনানিদ দারিমী;** সম্পাদনা : ফওয়ায আহমদ ও গং, (বৈরুত : দারুল কিতাবিল আরবী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭হি:), ১/১৪৮; সহীহ ইবনে হিববান; ৭/২৬৬।

মুহাম্মদ রুহুল আমিন সাহেবের কথা বলা যায়। তিনি তার জীবনের শেষ প্রহরে তার ভক্তদের উদ্দেশ্যে এ উপদেশ দিয়ে গেছেন যে,

"আমার কবরে সাওয়াব পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে তোমরা যেখানেই ইসালে ছওয়াবের মাহফিল করো না কেন, তা আল্লাহ গ্রহণ করবেন, আমার ইসালে ছওয়াবের জন্য যারাই হাদিয়া পেশ করবে আমি আমার কবরে শুয়ে তার জন্য দো'আ করতে থাকবো।"[৭৯]

কবরস্থ ওলিগণ কি আহ্বানকারীদের আহ্বান শুনতে পারেন?

যারা ওলীদেরকে সাধারণ মানুষের ইহ-পরকালীন কল্যাণের ক্ষেত্রে অনেক কিছু করতে পারেন বলে মনে করে, তাঁদেরকে নিকট ও দূর থেকে আহ্বান করে এবং মনে করে যে, তাঁরা তাদের এ সব আহ্বান শ্রবণ করতে পারেন। কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন পূর্বক বলেন :

---

[79]. এ উপদেশের কথাটি সাতক্ষিরা জেলার কুলিয়া মাদ্রাসার সেক্রেটারী ক্বারী মুহাম্মদ আশরাফুল আলম পীর রুহুল আমিন সাহেবের ইসালে ছওয়ার উপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি ইসলামী সভায় জনগণকে শরীক হওয়ার জন্য দাওয়াতী পত্রে উল্লেখ করেছেন।

﴿ وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ٢٠ أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ٢١ ﴾ [النحل: ٢٠، ٢١]

"আল্লাহকে ব্যতীত তারা যাদেরকে আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না অথচ তাদের সৃষ্টি করা হয়। তারা মৃত, জীবিত নয়, আর তারা কবে পুনরুজ্জীবিত হবে তা অনুধাবন করতে পারে না।"[৮০]

আরবের মুশরিকরা উপর্যুক্ত ধারণার ভিত্তিতে ওয়াদ, সুয়া', ইয়াগুস, উয়া'উক, নসর ও অন্যান্য যে সব ওলিদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান জানাতো, সে সব অলিগণের বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে এ আয়াতে আলোকপাত করা হয়েছে এবং তাদেরকে এ কথা বলা হচ্ছে যে, তোমরা যাদেরকে উক্ত ধারণার ভিত্তিতে আহ্বান করছো, তারাতো তোমাদের সাহায্য করতে পারে না; কেননা, তারাতো মৃত। আর মৃতরা কিছুই শ্রবণ করতে পারে না। পৃথিবীতে কে কী করছে, এখানে কখন কী ঘটছে, কখন মহাপ্রলয় ঘটার পর তাঁরা পুনরুজ্জীবিত হবে, এ সব ব্যাপারে তাঁদের কোনই অনুভূতি নেই। এই যদি হয় মুশরিকদের আহ্বানকৃত অলিগণের অবস্থা, তা হলে সাধারণ মুসলিমরা যে সব ওলিগণ কে

---

80 . আল-কুরআন, সূরা নাহাল: ২০, ২১।

উক্ত ধারণার ভিত্তিতে আহ্বান করে থাকে, তাঁদের অবস্থা যে এর ব্যতিক্রম হবে না, তা বলা-ই বাহুল্য। বস্তুত মরে যাবার পর তাঁদের রূহের দ্বারা তাঁরা নিজেরা এবং অপর কেউ উপকৃত হতে পারবে না কেননা, রূহের দ্বারা রূহ নিজের বা অপর কারো উপকার করার জন্য রূহের সাথে জীবন্ত দেহের সহঅবস্থান একান্ত প্রয়োজন। দেহ যখন মরে যায় তখন রূহের জীবিত থাকা আর না থাকা উভয়ই সমান হয়ে যায়। দেহ মরে যাওয়ার ফলে রূহকে হাজারো আহ্বান করলেও তা স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী কিছুই শ্রবণ করতে পারে না। তখন তা কারো কোনো উপকারও করতে পারে না। والله أعلم

আল্লাহই সকল কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক :

আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক কর্ম সম্পাদিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বৈধ কাজকর্ম করা হচ্ছে শরী'আতের নির্দেশ। যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করে আল্লাহর উপর ভরসা করলো এবং এর সাথে সাথে আল্লাহর রহমত ও দয়া কামনা করলো, আল্লাহ সে ব্যক্তির কামনা কখনও দ্রুত পূর্ণ করেন, কখনও সে ব্যক্তির ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তা পূর্ণ করতে বিলম্ব করেন। যাকে ইচ্ছা দ্রুত রোগ থেকে আরোগ্য দান করেন, যাকে ইচ্ছা দ্রুত সন্তান দেন, যাকে ইচ্ছা তা

দিতে বিলম্ব করেন। এ ক্ষেত্রে নবী, রাসূল আর সৎ ও অসৎ বলে কোনো পার্থক্য নেই। এইতো নবীবর আইউব এর বিষয়ই লক্ষ্য করা যায়। তিনি দীর্ঘ দিন যাবৎ মহামারীতে আক্রান্ত ছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁর রোগ মুক্তিতে বিলম্ব করেন। অবশেষে তাঁকে যে অনিষ্টতা পেয়ে বসেছে সে অনিষ্টের কথা আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে এর ওসীলায় তাঁর রহমতের প্রত্যাশী হয়ে সে রোগ থেকে আরোগ্য লাভের জন্য এ মর্মে দো'আ করেন :

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ٨٣ ﴾ [الانبياء: ٨٣]

"আমাকে অনিষ্টতা পেয়ে বসেছে, অথচ তুমি দয়ার সাগর"।[৮১]

এই দো'আ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেন। ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম-এর অবস্থা দেখুন, জীবনের শেষ প্রহরে পৌঁছার পরও তাঁর কোনো সন্তান হচ্ছিল না। দেখতে দেখতে তাঁর স্ত্রীও বৃদ্ধা এবং বন্ধা হয়ে গেছেন। দীর্ঘ পরীক্ষা গ্রহণের পর যখন আল্লাহ তাঁদেরকে সন্তান প্রদানের সংবাদ দিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী হতবাক হয়ে বলেন :

---

[81]. আল-কুরআন, সূরা আম্বিয়া : ৮৩।

﴿ءَأَلِدُ وَأَنَا۠ عَجُوزٞ وَهَٰذَا بَعۡلِي شَيۡخًاۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيۡءٌ عَجِيبٞ ۝٧٢﴾ [هود: ٧٢]

"আমি সন্তান প্রসব করবো অথচ আমি একজন বৃদ্ধা ও বন্ধা এবং আমার স্বামী একজন বৃদ্ধ মানুষ ! নিশ্চয় এ ঘটনাটি একটি অদ্ভূত ব্যাপার।"[৮২]

অনুরূপভাবে নবীবর যাকারিয়া আলাইহিস সালাম-এর বিষয়টিও লক্ষ্য করা যায়। তিনিও সন্তান প্রাপ্তির আশায় থাকতে থাকতে বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। পরিশেষে আল্লাহর কাছে এই বলে দো'আ করেন :

﴿رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلۡعَظۡمُ مِنِّي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأۡسُ شَيۡبٗا وَلَمۡ أَكُنۢ بِدُعَآئِكَ رَبِّ شَقِيّٗا ۝٤ وَإِنِّي خِفۡتُ ٱلۡمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرٗا فَهَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا ۝٥ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنۡ ءَالِ يَعۡقُوبَۖ﴾ [مريم: ٤، ٦]

"হে আমার পালনকর্তা! আমার অস্থি বয়স-ভারাবনত হয়েছে, বার্ধ্যক্যের ফলে মাথার চুল শুভ্র হয়ে গেছে, প্রভু হে! তোমাকে আহবান করে আমি তো কখনও হতভাগা হইনি। আমার পর আমার স্বগোত্রের লোকদের (অবস্থা) নিয়ে আমি আতঙ্কিত

---

[82]. আল-কুরআন, সূরা হূদ : ৭২।

আছি, আমার স্ত্রী বন্ধা হয়ে গেছে, কাজেই আপনি আপনার পক্ষ থেকে আমাকে এমন একজন কর্তব্য পালনকারী দান করুন, যে আমার ও ইয়া‘কুবের উত্তরাধিকারী হবে।”[৮৩]

এবার লক্ষ্য করে দেখুন : রোগ মুক্তি আর সন্তান দান যদি ওলি ও দরবেশগণের আয়ত্বে বা সামর্থ্যের মধ্যে থাকতো, তা হলে নবীগণ আল্লাহর বড় ওলি হওয়ার সুবাদে অন্যান্যদের চেয়ে অধিক সুবিধাভোগ করতেন। তাঁদের কোনো রোগই হতো না, বা হলেও তা দ্রুত আরোগ্য করে নিতেন। সন্তানাদি যথা সময়ে পেয়ে যেতেন; কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত বলেই আমরা দেখতে পাই। তাঁদেরকে রোগ মুক্তি ও সন্তান লাভের জন্য হতাশ না হয়ে অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে দেখা যায় এবং অপর কোনো বিকল্প ব্যবস্থার চিন্তা না করে শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘আলার কাছেই বিনয়ের সাথে তা কামনা করতে দেখা যায়।

এ ক্ষেত্রে আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনেও আমাদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে। তিনি আল্লাহর এতো প্রিয়ভাজন হয়েও একজন ইয়াহূদীর জাদু মন্ত্রের দ্বারা

---

[83]. আল-কুরআন, সূরা মারয়াম : ৪-৭।

আক্রান্ত হয়েছিলেন, অথচ তিনি বুঝতেও পারেন নি যে তাঁর কী হয়েছে, কী ভাবেই বা তিনি এথেকে পরিত্রাণ পাবেন? অবশেষে আল্লাহই তাঁকে এ ব্যাপারে সংবাদ দিলেন এবং সূরায়ে নাস ও ফালাক্ব অবতীর্ণ করে এর দ্বারা ঝাড়ফুঁকের মাধ্যমে তা নষ্ট করার ব্যবস্থা করেন। যদি বিপদ দূর করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিজস্ব কোনো উপায় থাকতো, তা হলে তিনি জাদুতে আক্রান্তই হতেন না, বা হলেও মুহূর্তের মধ্যেই তাথেকে আরোগ্য লাভ করতে সক্ষম হতেন; কিন্তু তাঁর পক্ষে তা করা সম্ভব হয় নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি তাঁর উপরে পতিত বিপদ নিজ থেকে দূর করতে না পারেন, তবে এ জগতে এমন কোনো ওলি ও দরবেশ থাকতে পারেন না, যিনি নিজের বা অপর কোনো মানুষের বিপদ দূর করতে পারেন। বা যার কোনো সন্তান হবার নয় তাকে সন্তান দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। সে জন্য মাওলানা ক্বাযী সানাউল্লাহ পানিপথী বলেন:

“যে বস্তুর কোনো অস্তিত্ব নেই সে বস্তুর অস্তিত্ব দান করা বা যে বস্তুর অস্তিত্ব রয়েছে সেটাকে অস্তিত্বহীন করার মত সামর্থ্য ওলীদের নেই। অতএব কারো প্রতি এ ধারণা পোষণ করা যে, তিনি কোনো বস্তুকে অস্তিত্ব দিতে পারেন, বা সেটাকে অস্তিত্বহীন করতে পারেন, কাউকে জীবিকা দিতে পারেন, রোগ থেকে মুক্তি

দিতে পারেন, কিংবা বিপদাপদ ও অকল্যাণ দূর করতে পারেন, তবে তা কুফরী বিশ্বাসে পরিণত হবে।"[৮৪]

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমাদের দেশের সাধারণ মুসলিমগণ ওলীদের কবরে শয়তানের পাতানো কিছু অদ্ভূত কর্মকাণ্ড দেখে, বা অদ্ভূত কোনো ঘটনার কথা লোক মুখে শুনে শয়তানের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গেছেন। যার ফলে তারা আল্লাহর ক্ষমতাকে ওলীদের হাতে ন্যস্ত করে দিয়েছেন। সে জন্যই তারা তাদের জীবনের যাবতীয় অভাব ও অভিযোগের কথা আল্লাহর পরিবর্তে ওলীদের কাছেই জানিয়ে থাকেন, বিপদে পড়লে তাঁদেরকেই স্মরণ করে থাকেন, তাঁদের কবরের নিকতম গাছ-পালা, কূপ ও পুকুরের পানি এবং জীব-জন্তু থেকেও কল্যাণ ও বরকত গ্রহণ করে থাকেন। এগুলোর সম্মান ও তা'যীম করে থাকেন। এতে তারা নিজেদের অজান্তেই আরবের মুশরিকদের ন্যায় শির্কে নিমজ্জিত হচ্ছেন; কেননা ওরাও তাদের অলি, দেবতা, গাছ-পালা ও পাথরের ব্যাপারে এ জাতীয় ধারণা করার ফলেই শির্কে নিমজ্জিত হয়েছিল।

[84]. মাওলানা মুহাম্মদ আরিফ সম্বহলী, প্রাগুক্ত; ৯৩।

৪. কবরে অব্দুল কাদির জীলানীর হস্তক্ষেপে বিশ্বাস:

মানুষের ইহকালীন জীবনে মৃত অলিগণের হস্তক্ষেপ করার বিশ্বাসের পাশাপাশি কিছু জনমনে এ বিশ্বাসও রয়েছে যে, তারা প্রয়োজনে মানুষের কবরেও হস্তক্ষেপ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে বড়পীর আব্দুল কাদির জীলানীর ব্যাপারে একটি চমকপ্রদ ঘটনা তাঁর ভক্তদের মাঝে আলোচিত হতে দেখা যায়। তা হলো- একদা তাঁর এক ভক্ত মৃত্যুর পর কবরে নাকির-মুনকার ফেরেশতার প্রশ্নের জবাব দিতে অপারগ হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় সে তার পীর আব্দুল কাদির জীলানীকে সাহায্যের জন্য স্মরণ করতে থাকে। তিনি তাঁর ভক্তের দো'আ শুনে সে লোকের কবরে আগমন করেন এবং ফেরেশতাদের হাত থেকে তাঁর ভক্তের আমলনামা নিজ হাতে নিয়ে তাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন- তোমরা কি জান না, এ লোকটি আমার ভক্ত। এতে ফেরেশতাগণ নির্বাক হয়ে ফিরে যান।[৮৫]

১. আব্দুল কাদির জীলানীকে দস্তগীর নামে অভিহিতকরণ :

[85]. দেখুন: অধ্যাপক আব্দুন্নুর সালাফী, **তৌহিদ বনাম শির্ক;** (রংপুর: সালাফিয়া প্রকাশনী, সংস্করণ বিহীণ, ১৯৮৪ খ্রি.), পৃ. ৭৭।

মহান আল্লাহ হলেন এ জগতের পরিচালক। এ-জগতকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তাঁকে সর্বদাই জাগ্রত থাকতে হয়। কখনও তাঁকে মানবীয় কোনো প্রকার দুর্বলতা যেমন- তন্দ্রা, নিদ্রা ও পদস্খলন স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর একটি গুণগত নাম হচ্ছে (قَيُّوْمْ), এ গুণের কারণে তিনি সমগ্র জগতকে ধারণ করে রয়েছেন। তিনি পায়চারি করেন, হাঁটতে হাঁটতে তাঁর পা মুবারক পিছলে যায়- নাউজু বিল্লাহ! এ জাতীয় কথা আল্লাহর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তিনি যদি পা পিছলে পড়ে যান, তা হলে তিনি কী করে এ মহাজগত ধারণ করে থাকবেন। কিন্তু বড়পীর 'আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.)-এর ভক্তদের মধ্যে আল্লাহর ব্যাপারে এ জাতীয় বিশ্বাস রয়েছে। 'আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.)-এর ব্যাপারে তাঁর ভক্তদের মাঝে যে- সব রূপকথা ও কল্প-কাহিনী রয়েছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে অদ্ভূত একটি কাহিনী হচ্ছে- 'একদা তিনি অদৃশ্য হয়ে আকাশে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেন এবং দুই বন্ধুর ন্যায় তিনি সেখানে আল্লাহর হাত ধরে চলতে থাকেন। এক সময় হঠাৎ করে আল্লাহর পা পিছলে যায় (নাউজু বিল্লাহ)। তখন 'আব্দুল কাদির জীলানী আল্লাহকে তাঁর হাত ধরে সোজা করে দাঁড় করান।'[৮৬] এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই 'আব্দুল

---

[86]. তদেব; পৃ. ৭৪-৭৫।

কাদির জীলানী দস্তগীর (আল্লাহর হাত পাকড়াওকারী) নামে অভিহিত হন। যারা এ জাতীয় কল্প-কথায় বিশ্বাস করে তারা যেন প্রকারান্তরে 'আব্দুল কাদির জীলানীকেই আল্লাহর ধারক হিসেবে গণ্য করে থাকে এবং তাঁকে আল্লাহর পরিচালনাকারীর মর্যাদা দিয়ে থাকে, অথচ এমন ধারণা করা সুস্পষ্ট শির্ক।

রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দেশের জনগণকে সকল ক্ষমতার মালিক বলে মনে করা :

সকল ক্ষমতার মালিক ও উৎস হলেন আল্লাহ। কারো ক্ষমতায় যাওয়া বা ক্ষমতা থেকে অপসারিত হওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে তাঁরই ইচ্ছা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সে অনুযায়ী যখন তিনি কোনো দলকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসাবার ইচ্ছা করেন, তখন জনগণের অন্তরকে সে দলের প্রতি তিনি আকৃষ্ট করে দেন। তাই তারা স্বেচ্ছায় অথবা কোনো কিছুর বিনিময়ে হলেও তাদেরকে ভোট দেয় এবং এ প্রক্রিয়ায়ই সে দল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করে। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে যেহেতু জনগণ কোনো দলকে ক্ষমতায় বসাবার জন্য ভোট দিতে পারে না, সেহেতু ক্ষমতার মূল মালিক হলেন তিনিই, জনগণ নয়। সে-জন্য কেউ যদি এ কথা এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে বলে যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভের পিছনে আল্লাহর কোনো হাত নেই এবং জনগণই এর সব কিছুর মালিক, তবে

তার এ ধারণা শির্কে আকবার হিসেবে গণ্য হবে। এমন ধারণা না নিয়ে বললে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তার কথাটি আপত্তিকর হওয়ায় তা শির্কে আসগার হিসেবে গণ্য হবে। এ ধরনের কথা বলার বিষয়টি শর'য়ী দৃষ্টিতে গর্হিত হওয়া সত্ত্বেও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ম ধারার প্রথম প্যারাতে এ জাতীয় সিদ্ধান্তই গৃহীত রয়েছে। সিদ্ধান্তটি নিম্নরূপ :

'All powers in the Republic belong to the people and their exercise on behalf of the people shall be effective only under, and by the authority of this Constitution.'[87]

জনগণকে এ ধরনের ক্ষমতার স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত দু'টির সাথে সাংঘর্ষিক বলে প্রতীয়মান হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٦٥]

"সকল ক্ষমতার মালিক কেবল আল্লাহ।"[৮৮]

অপর আয়াতে বলেন :

---

[87]. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; পৃ. ৬।

[88]. আল-কুরআন, সূরা বাকারাহ : ১৬৫।

﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلۡمُلۡكِ تُؤۡتِي ٱلۡمُلۡكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلۡمُلۡكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُۖ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ٢٦ ﴾ [آل عمران: ٢٦]

"বল হে আল্লাহ! হে ক্ষমতার মালিক, তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান কর, যাকে ইচ্ছা সম্মান দান কর, আবার যাকে ইচ্ছা অসম্মানিত কর, তোমার হাতেই সকল কল্যাণের চাবিকাঠি, তুমি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।"[৮৯]

৬. ওলীদের কবর ও কবরের মাটি, গাছ, নিকটস্থ কূপের পানি ও জীব-জন্তুর দ্বারা উপকারে বিশ্বাস করা :

মহান আল্লাহর ইচ্ছায় এ পৃথিবীর অনেক কিছুই মানুষের অনেক অসুখ-বিসুখের ক্ষেত্রে উপকারী হয়ে থাকে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে কোনো ওলির কবর বা কবরের মাটি, এর নিকটস্থ গাছ, পুকুরের মাছ, কচ্ছপ ও কুমির ইত্যাদির প্রতি তা সে ওলির সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার কারণে উপকারী হওয়ার ধারণা করা শির্কের অন্তর্গত। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেক মুসলিমদের মনে এ সব উপকারী হওয়ার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। সে কারণে তাদেরকে অলিগণের কবরের মাটি, কবর বা কবরের উপর পুড়ানো মোম

---

[89]. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ২৬।

সংগ্রহ করতে দেখা যায়। কূপ ও পুকুরের পানি ময়লা হলেও তা যমযমের পানির মত আগ্রহের সাথে পান করতে ও তা ক্রয় করতে দেখা যায়। এমনকি শাহ জালাল (রহ.)-এর কূপের সাথে যমযম কূপের গোপন সম্পর্ক রয়েছে বলেও ধারণা করতে দেখা যায়।[৯০] কবরের কবুতর, পুকুরের মাছ, কচ্ছপ ও কুমিরকে যত্নের সাথে খাবার দিতে দেখা যায়। অনিষ্টের ভয়ে কবুতর ও মাছ খাওয়া থেকে বিরত থাকতে দেখা যায়। বিভিন্ন রোগ মুক্তি ও সন্তান লাভের আশায় কোনো কোনো কবর বা কবরের নিকটস্থ গাছে তারকাঁটা মারতে ও লাল সুতা বেঁধে রাখতে দেখা যায়। এ জাতীয় গাছ শির্ক চর্চার কেন্দ্র হওয়াতে তা স্বমূলে উৎপাটন করা প্রসঙ্গে মালিকী মাযহাবের একজন প্রসিদ্ধ আলেম ইমাম ত্বরত্বুশী বলেন :

"فانظروا رحمكم الله ! أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس و يعظمونها و يرجون منه البرء الشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير و الخرق فهي ذات أنواط ، فاقطعوها."

---

[90]. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, **শাহ জালাল ও তাঁর কারামত;** (সিলেট : নিউ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম ষংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ২২।

“ওহে মুসলিম জনতা লক্ষ্য কর! আল্লাহ আপনাদের উপর রহম করুণ! যেখানেই তোমরা এমন কোনো কুল গাছ বা অন্য কোনো গাছ পাবে, যার নিকটে লোকেরা (দূর-দূরান্ত থেকে) উদ্দেশ্য করে আগমন করে, এর সম্মান করে ও তাথেকে রোগ মুক্তি কামনা করে, তাতে তারকাঁটা মারে ও কাপড়ের টুকরা ঝুলিয়ে রাখে, তা হলে তোমরা বুঝে নিবে যে, এটি (কাফিরদের) সেই যাতে আনওয়াত (এরই অনুরূপ গাছ, যাকে কাফিররা দূর-দূরান্ত থেকে উদ্দেশ্য করে আসতো)। সুতরাং তোমরা তা কেটে ফেলো।”[৯১]

আল্লামা আহমদ রূমী কবর ও কবরের নিকটতম গাছের কাছে লোকেরা যা করে সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

“কবরের কাছে যিয়ারতকারীদের নামায পড়া, কবরের হজ্জ করার সময় বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনে চলা, এর পার্শ্বে পশু যবাই ও কান্নাকাটি করা, প্রয়োজনের কথা কবরবাসীকে জানানো, তাদের নিকট কষ্ট, অভাব ও বিপদ থেকে মুক্তি ইত্যাদি কামনা করে যিয়ারতকারীরা যে সব কর্ম করে, এর কোনটিই আল্লাহর জন্য নয়, বরং তা শয়তানের জন্যেই করে থাকে।”[৯২] রাসূলুল্লাহ

---

[91]. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, **ফতাওয়া রহীমিয়্যাহ**; (গুজরাট : মকতবা-ই-রহীমিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), ১/২০৩-২০৪।

[92]. আহমদ রূমী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫৯।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সহচরগণ তাঁর নিকট মুশরিকদের 'যাতে আনওয়াত' নামের কুল গাছের অনুরূপ একটি গাছ নির্ধারণ করে দেয়ার আবেদনের হাদীসটি[৯৩] বর্ণনা পূর্বক তিনি বলেন : "লক্ষ্য করুন! যখন (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবীদের পক্ষ থেকে) কোনো প্রকার এবাদত বা এর নিকট কোনো প্রয়োজন পূরণের কথা জানানো ছাড়াই, শুধুমাত্র এতে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখা এবং এর পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে এ ধরনের গাছকে নির্ধারণ করে দেয়ার আবদার করা-ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টিতে এ

---

[93] হাদীসটি নিম্নরূপ : আবু ওয়াক্বিদ আল-লায়ছী রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খয়বর অভিযানের বের হলেন, তখন মুশরিকদের একটি গাছের পার্শ্ব দিয়ে অতিক্রম করেন, যাকে 'যাতে আনওয়াত' বলা হতো, এর উপর তারা তাদের অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রাখতো। সাহাবীগণ বললেন- হে রাসূল! ওদের ন্যায় আমাদের জন্যেও একটি 'যাতে আনওয়াত' নির্ধারণ করে দিন। সাহাবীদের এ আবেদন শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : সুবহানাল্লাহ! তোমাদের এ কথাটি মূসা (আ.) এর জাতির কথার মতই হয়ে গেল, তারা বলেছিল- মুশরিকদের ইলাহের ন্যায় আমাদের জন্যে একটি ইলাহ বানিয়ে দিন। যার হাতের মধ্যে আমার আত্মা তাঁর শপথ করে বলছি- তোমরা অবশ্যই তোমাদের অতীতের লোকদের রীতিনীতি অনুসরণ করবে।" দেখুন : আবু ঈসা আত- তিরমিযী, প্রাগুক্ত; ৪/৪৭৫। কোনো কোনো বর্ণনায় খয়বার যুদ্ধের পরিবর্তে হুনায়ন যুদ্ধের কথা বর্ণিত হয়েছে।

গাছকে ইলাহ বা উপাস্যে পরিণত করার নামান্তর হয়ে গেল, তখন সেই সমস্ত লোকদের ব্যাপারে আমরা কী ধারণা করতে পারি, যারা কোনো কবর, গাছ ও পাথরের কাছে আগমন করে এটাকে সম্মান করে, এর দ্বারা রোগমুক্তি কামনা করে, এর উদ্দেশ্যে মানত করে, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে যে, এটি তাদের মানত গ্রহণ করে। এটিকে তারা হাত দিয়ে স্পর্শ করে, মুখ দ্বারা চুম্বন করে, অথচ আল্লাহ তা'আলা 'মাকামে ইব্রাহীমকে' নামাযের স্থান হিসেবে নির্ধারণের জন্য আমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করা সত্ত্বেও সলফগণ তা হাত দ্বারা স্পর্শ করতে নিষেধ করেছেন। যেমন আযরক্বী ইমাম কাতাদাহ (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি

﴿وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَٰهِـۧمَ مُصَلًّىۖ﴾ [البقرة: ١٢٥] [٩٤]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন :

(إن الله أمر الناس بالصلاة في هذا المكان و لم يأمرهم بلمسه)

"আল্লাহ তা'আলা জনগণকে এ স্থানে নামায পড়তে আদেশ করেছেন, তাদেরকে তা স্পর্শ করতে আদেশ করেন নি।"[৯৫]

---

[94]. অনুবাদ : "তোমরা মাকামে ইব্রাহীমকে নামাযের স্থান বানাও।" আল-কুরআন, সূরা : বাক্বারাহ : ১২৫।

বাস্তবিক অর্থে যারা কোনো কবর, কবর, গাছ, পাথর, মাটি, কূপ ও পুকুর এবং ওলীদের নিদর্শনাদিকে বিভিন্ন রোগমুক্তির হাসপাতাল ও বিপদের আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিয়েছে, সন্তান লাভ ও বিভিন্ন মনস্কামনা পূরণের স্থান বানিয়ে নিয়েছে, তারা যেন ওলীদের কবর ও কবরসমূহকে মুশরিকদের 'হুবল' ও 'মানাত' দেবতার স্থানে বসিয়েছে এবং গাছ, কূপ, পুকুর ও ওলীদের নিদর্শনাদিকে মুশরিকদের 'যাতে আনওয়াত', 'উয্যা' ও 'লাত' নামের দেবীতে পরিণত করেছে। এসবকে কেন্দ্র করে তারা যা কিছু করে এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সে ভবিষ্যদ্বাণীরই সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে, তিনি বলেছিলেন :

"তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্বেকার জাতির (মুশরিকদের) রীতিনীতির অনুসরণ করবে।"[৯৬]

৭. মানব রচিত বিধান ও আইন দ্বারা দেশ শাসন ও বিচার কার্য পরিচালনা করা :

এ পৃথিবীতে মানুষ যদি নিজ থেকে আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়ে

---

[95]. আহমদ রূমী, প্রাগুক্ত; পৃ.১৬১।

[96]. **দেখুন :** তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল কদর, বাব নং ১৮, হাদীস নং ২১৮০; ৪/৪৭৫; ইবনে মাজাহ, প্রাগুক্ত; ২/১৩২২; ইবনে আবী শায়বাহ, ৭/৪৭৯।

থাকতো, তা হলে তারা যেমন খুশী চলতে পারতো। তাদের জীবনের যাবতীয় দিক ও বিভাগ শাসন ও পরিচালনা করার জন্য নিজেরাই স্বাধীনভাবে আইন ও বিধান রচনা করতে পারতো। কিন্তু মানুষ আল্লাহর সৃষ্ট জীব হওয়ায় তাদের এ স্বাধীনতা নেই; কেননা, তিনি নিজেই তাদের এ প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এ জন্য দিয়েছেন সর্বকাল ও সর্বস্থানে প্রয়োগের উপযোগী সর্বশেষ অহীর বিধান আল-কুরআন ও তাঁর শেষ নবীর সহীহ সুন্নাহ। এ দু'য়ের মাঝে বর্ণিত যাবতীয় বিধি-বিধান মানুষের ব্যক্তি, পরিবার, ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বাস্তবায়ন করা বা না করার ব্যাপারে আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টিগত স্বাধীনতা দিয়ে থাকলেও শরী'আতগত দিক থেকে তা পালন করা বা না করার ব্যাপারে তিনি তাদেরকে কোনো স্বাধীনতা দান করেন নি। বরং এ কথা বলে দিয়েছেন যে, যারা স্বেচ্ছায় তা তাদের জীবনে বাস্তবায়ন করবে বা এ জন্য চেষ্টা করবে, তারা আল্লাহর আইনের কাছে আত্মসমর্পণকারী ও তাঁর দাস হিসেবে গণ্য হবে। তারা আল্লাহকেই তাদের জীবনের পরিচালনাকারী ও রব হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী হবে। আর যারা তা করবে না, তারা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তাঁর দাসত্বকে অস্বীকারকারী হয়ে নিজেদেরকে নিজেদের ইলাহ ও রব হিসেবে স্বীকৃতি দানকারী হবে। কুরআন

ও হাদীসের দ্বারা এ বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও দেখা যায়- আমাদের দেশে যারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করেন, তাদের অধিকাংশই তাদের জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে ওহীর বিধান বাস্তবায়ন করতে রাজি নন। তারা এটাকে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ বলে আখ্যায়িত করেন। দেশের অধিকাংশ জনগণ ইসলামী রাজনীতির পরিবর্তে পাশ্চাত্য রাজনীতির অনুসরণ ও অনুকরণ করার ফলে দেশে যেমন ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হচ্ছে না, তেমনি শুধুমাত্র বিবাহ, তালাক, উত্তরাধিকার ও পারিবারিক আইন ব্যতীত মানব জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে অহীর যে সব বিধান রয়েছে, তা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ যেখানে যাবতীয় আইনের মূল উৎস হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার কথা, সেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা নিজেই আইনের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। দেশ পরিচালনার জন্য সংবিধান রচনা করে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি যে, এ সংবিধানে বর্ণিত বিধানের সাথে অপর কোনো বিধানের বিরোধিতা করার কোনো আইনগত অধিকার নেই এবং করলে তা অপনিতেই বাতিল বলে গণ্য হবে। যেমন সংবিধানের ৭ম ধারার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আমরা এ সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছি যে,

"This Constitution is, as the solemn expresson of the will of the people, the supreme law of the Republic,

and if any other law is inconsistent with this Constitution that other law shall, to the extent of the inconsistency, be void."[97]

এ সিদ্ধান্তের দ্বারা আমরা নিজেদের রচিত সংবিধানের আইন ও বিধানকে কুরআন ও সুন্নাহের আইন ও বিধানের উপর মর্যাদা দান করেছি। বিচার কার্য অহীর বিধানানুযায়ী পরিচালিত না করে তা পাশ্চাত্য বা নিজেদের রচিত বিধানানুযায়ী করছি। এভাবে আমরা সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে স্রষ্টার আসনে বসিয়ে দিয়েছি এবং এ জাতীয় কর্ম করে নিজেদের অজান্তেই নিজেদেরকে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শরীক করে নিয়েছি। এ হেন অভিযোগ থেকে কেবল তারাই মুক্তি পেতে পারেন যারা আল্লাহর আইন ও বিধানকে কোনো প্রকার অবজ্ঞা না করে সর্বকালে তা বাস্তবায়নের যোগ্য বলে মনে করেন, ক্ষমতায় যেতে না পারলে ইসলাম বিরোধী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক যাবতীয় ষড়যন্ত্রের জাল

---

[97]. এর বঙ্গানুবাদ হচ্ছে : জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জসপূর্ণ হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে। দেখুন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান; (ডেপুটি কন্ট্রোলার, গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত, ১৯৯১ খ্রি.), পৃ. ৬।

ছিন্ন করে কোনো প্রকার সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছাড়াই শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতায় যেয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা ও তদবীর করেন। কিন্তু যারা শুধু সেমিনার, সেম্মোজিয়াম ও বক্তৃতায় দাঁড়িয়ে ইসলামী বিধানের মৌখিকভাবে প্রশংসা করেন এবং শুধুমাত্র সমস্যাদির কথা ভেবে তা বাস্তবায়ন করার জন্য কোনো প্রকার বাস্তব উদ্যোগ গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন, তারা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্ক করা থেকে বাঁচতে পারলেও কোনো অবস্থাতেই তারা কবীরা গুনাহ থেকে মুক্ত হতে পারবেন না কেননা, একজন মুসলিম বা একটি মুসলিম রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ ও অনুসারীদের ঈমানী দায়িত্ব হচ্ছে- ক্ষমতায় গিয়ে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী দেশ ও বিচার কার্য পরিচালনার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা, যারা তা চায় তাদের সহযোগিতা গ্রহণ করা। নিজে চাইবো না বা যারা তা চায় তাদের সহযোগিতাও করবো না, এমন মুনাফিকী চরিত্র নিজের আখেরাত সম্পর্কে সচেতন কোনো মুসলিমের কশ্মিনকালেও হতে পারে না।

৮. জিনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য জিনকে শিরনী দান:

জিন-পরী ও দেও-দানবসহ যাবতীয় অনিষ্টকারীদের অনিষ্টের হাত থেকে বাঁচার জন্য একজন মু'মিনের করণীয় হচ্ছে পারতপক্ষে সর্বদা পবিত্র থাকার চেষ্টা করা এবং জিনের আশ্রয়

কামনা করার বদলে বিভিন্ন দো‘আ-কালাম পাঠ করে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া; কেননা যে কোনো বিপদ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা হচ্ছে তাঁর একটি বিশেষ ধরনের উপাসনা। কিন্তু দেশের গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মুসলিমদের দেখা যায়, মাছ ধরার জন্য কোনো পুকুর বা বিল সেচ করলে তারা সেচ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে দুষ্ট জিন যাতে মাছ অন্যত্র সরিয়ে না নেয়, সে জন্য পুকুর বা বিলের পারে শিরনী তৈরী করে নিকটস্থ কোনো গাছের নিচে এর কিছু অংশ রেখে দেন এবং এর মাধ্যমে পুকুর বা বিলের পার্শ্ববর্তী জিনের সন্তুষ্টি কামনা করেন ও তার অনিষ্ট হতে বাঁচার জন্য তার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থানে মুকাম নামে পরিচিত এমন কিছু পুরাতন গাছপালাবিশিষ্ট স্থানও রয়েছে যেখানে জিনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য লোকেরা সেখানকার কোনো বড় গাছের নিচে হালুয়া ও শিরনী দিয়ে থাকে। এ জাতীয় কর্মের প্রচলন সিলেট জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে অধিকহারে রয়েছে। লোকেরা যেন এ কর্মের দ্বারা জিনের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার বদলে জিনের কাছেই আশ্রয় কামনা করে থাকে। এ জাতীয় কর্মকে হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের মনসা পূজার সাথে তুলনা করা যায়, যা তারা মনসা দেবী নামে এক কাল্পনিক দেবীর

সন্তুষ্টির জন্য উপাসনালয়ের গাছতলায় খাবার রাখার মাধ্যমে করে থাকে।

১০. ভাগ্য পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পাথরের প্রভাবে বিশ্বাস করা :

আমাদের দেশে গণক ও হস্তরেখাবিদ নামে কিছু পেশাজীবী লোক রয়েছেন যারা মানুষের চেহারা বা হাত দেখে তাদের ভাগ্যের ভাল-মন্দ বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। যারা তাদের শিকার হয় তাদেরকে ভাগ্য বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে তারা তাদেরকে বিভিন্ন রকমের পাথর দ্বারা নির্মিত আংটি ব্যবহারের জন্য দিয়ে থাকে। পাথর দাতা ও গ্রহীতা সকলেই এ সব পাথরের অলৌকিক প্রভাবে বিশ্বাস করে, যা শর'য়ী দৃষ্টিতে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্কের শামিল। উল্লেখ্য যে, মানুষের ভাগ্যে মহান আল্লাহ দু'টি কারণে বিড়ম্বনা বা দুঃখ দিয়ে থাকেন :

এক. কোনো দুঃখ দুর্দশা দিয়ে তিনি তাদের ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা করতে চান। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন :

﴿وَلَنَبۡلُوَنَّكُم بِشَيۡءٖ مِّنَ ٱلۡخَوۡفِ وَٱلۡجُوعِ وَنَقۡصٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡوَٰلِ وَٱلۡأَنفُسِ وَٱلثَّمَرَٰتِۗ وَبَشِّرِ ٱلصَّٰبِرِينَ ١٥٥﴾ [البقرة: ١٥٥]

"আমি অবশ্যই ভয়-ভীতি, ক্ষুধা, জান ও ফসলের ক্ষতি সাধনের মাধ্যমে তোমাদের পরীক্ষা করবো।"[৯৮]

দুই, কোনো মানুষকে তার কর্মদোষের ফলেই তিনি তার ভাগ্যে দুর্দশা নামিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছেন :

﴿ وَمَآ أَصَٰبَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۝٣٠ ﴾ [الشورا: ٣٠]

"তোমাদের উপর যে বিপদ পতিত হয়েছে তা তোমাদের কর্মদোষের ফলেই হয়েছে।"[৯৯]

উপর্যুক্ত দু'টি কারণে ভাগ্যের যে কোনো বিড়ম্বনা আল্লাহর ইচ্ছায়ই হয়ে থাকে। এটি কোনো রোগ-ব্যাধি নয় যে কোনো ঔষধ সেবন বা কোনো পাথর ব্যবহারের মাধ্যমে তা ভাল করা যাবে। তা ভাল করার একমাত্র পথ হচ্ছে এ দিক সে দিক মুখ না করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা এবং ধৈর্যের সাথে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য বৈধ উপায়ে কর্ম করা। কোনো গণক বা হস্তরেখাবিদের কথা যদি কারো ভাগ্যের অতীত অবস্থার সাথে মিলেও যায়, তবুও এর দ্বারা কারো আশ্চর্যান্বিত ও প্রতারিত হলে

---

98. আল-কুলআন, সূরা বাক্বারাহ : ১৫৫।

99 . আল-কুরআন, সূরা শূরা : ৩০।

চলবে না; কারণ গণকরা অনেক সময় জিনের সহযোগিতায় মানুষের ভাগ্যের অতীত সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে কথা বলে। আবার অনেক সময় এরা ও হস্তরেখাবিদরা অভিজ্ঞতার আলোকে কথা বলে, যার অনেকটা অনেকের ভাগ্যের বাস্তবতার সাথে মিলে যায়। এদের বক্তব্যের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, কারো ভাগ্য পরিবর্তনে তাদের দেয়া পাথরের কোনই প্রভাব নেই; কেননা তা সম্পূর্ণভাবেই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাপার। তা পরিবর্তন করতে হলে যে বৈধ পন্থা অবলম্বন করলে তা পরিবর্তন হতে পারে তা ক'রে পরিবর্তনের জন্য আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। হিকমতের ভিত্তিতে তিনি যাকে ইচ্ছা তা দ্রুত পরিবর্তন করে দেন, আবার যাকে ইচ্ছা বিলম্বে দেন। যারা ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য অন্যের কাছে চায় বা মৃত ওলিদের শাফা'আতের মাধ্যমে তাদের ভাগ্য বদলাতে চায়, তাদের ভাগ্যও তিনিই তাঁর হিকমতের ভিত্তিতে পরিবর্তন করেন। এক্ষেত্রে অন্যের বা মধ্যস্থতাকারী মৃত ওলির কোনই হাত নেই। তবে যারা তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য আল্লাহর নিকট সরাসরি চায়, তারা হবে তাঁর উপাসনাকারী ও তাঁর রুবূবিয়্যাতকে সম্পূর্ণভাবে স্বীকৃতিদানকারী। আর যারা অপর কারো কাছে চায় বা কোনো মৃত ওলিদের মধ্যস্থতা অবলম্বন করে, তারা হলো অন্যের উপাসনাকারী ও অন্যের রুবূবিয়্যাতের স্বীকৃতিদানকারী।

১১. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেটে বাঁধা পাথরের দ্বারা উপকারে বিশ্বাস :

হাদীস এবং ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খন্দকের যুদ্ধে পরিখা খননের সময় ক্ষুধা নিবারণের জন্য পেটে পাথর বেধেছিলেন।[১০০] প্রয়োজন শেষে এ পাথর দু'টিকে তিনি কোথায় ফেলে দিয়েছিলেন, তাঁর কোনো সাহাবী তা সংরক্ষণ করেছিলেন কি না, এ সবের কোনো বর্ণনা কোনো হাদীস অথবা ইতিহাস কিংবা কোনো সীরাত গ্রন্থেও পাওয়া যায় না। অনুরূপভাবে আবু জেহেল একটি বড় পাথর দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাথায় আঘাত করে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল বলেও ইতিহাসের কিতাবাদিতে প্রমাণ পাওয়া যায়।[১০১] তবে আবু জেহেলের হাতে এ পাথর তখন কালিমা পাঠ করেছিল কি না এবং আবু জেহেল তা ফেলে দেয়ার পর কেউ তা সংরক্ষণ করেছিল কি না, এ সবেরও কোনো বর্ণনা

---

[100]. আবু ত্বালহা রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত, আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট ক্ষুধার কথা জানালাম। আমরা পেটের কাপড় সরিয়ে একটি করে পাথর দেখালাম। তখন তিনি কাপড় সরিয়ে দু'টি পাথর দেখালেন। দেখুন : সফিয়্যুর রহমান আল-মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ.৩০৪; ওয়ালী উদ্দিন, আল-খতীব, প্রাগুক্ত; ২/৪৪৮।

[101]. সফিয়্যুর রহমান আল-মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৯।

কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। কেউ তা সংরক্ষণ করে থাকলেও যে পাথরটি আবু জেহেল একটি ঘৃণিত উদ্দেশ্যে তার হাতে নিয়েছিল, সে পাথর কোনো অবস্থাতেই কোনো মুবারক পাথর হতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে হক্কানী আঞ্জুমান নামে আজানগাছী পীরের একটি দরবার রয়েছে। সে দরবারে রয়েছে দু'টি পাথর। কুষ্টিয়া জেলার রাজারহাট বাজারের পশ্চিম পার্শ্বে এ দরবারের অনুসারীদের একটি মসজিদ রয়েছে। সে মসজিদের দেয়ালে উক্ত দরবারের একটি প্রচারপত্র ঝুলানো রয়েছে। তাতে এ পাথর দু'টির পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে :

'এ পাথর দু'টির একটি হচ্ছে আবু জেহেলের হাতে কালিমা পাঠকারী পাথর। আর অপরটি হচ্ছে সেই পাথর যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ক্ষুধার তাড়নায় তাঁর পেট মোবারকে বেঁধেছিলেন। এ পাথর দু'টি পীর পরম্পরায় মক্কা শরীফের দ্বীন মুহাম্মদ নামের এক মুআল্লিমের কাছে সংরক্ষিত ছিল। তিনি স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে তা আজানগাছী পীরকে দান করেছিলেন।'

আমাদের দেশেও এ পীরের ভক্তবৃন্দ রয়েছেন। তারা ঢাকাস্থ হাইকোর্টের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত শাহবাগ শাহী মসজিদে

এবং বায়তুল মুকাররম মসজিদে প্রতি সপ্তাহের মঙ্গলবারে একত্রিত হন বলে এ প্রচার পত্রে লিখিত রয়েছে। এ পাথর দু'টি সংরক্ষিত হওয়ার ঐতিহাসিক কোনো ভিত্তি না থাকা সত্ত্বেও আজানগাছী পীর সাহেব এদু'টি পাথরকে সে মু'আল্লিমের হাত থেকে মহা মূল্যবান পাথর হিসেবে গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার হক্কানী আঞ্জুমানে রেখে এর জন্য যিয়ারতের একটি বেদ'আত জারী করেন। তিনি এ দু'টি পাথরকে বিভিন্ন মারাত্মক রোগ থেকে মুক্তি, বিপদাপদ দূরীকরণ ও রূহানী শক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে মহা উপকারী বলে ঘোষণা দেন। বাজার থেকে লবঙ্গ ক্রয় করে এ পাথর দু'টির সাথে মিলিয়ে রাখলে এ লবঙ্গের মধ্যে পাথর দু'টি অস্বাভাবিক প্রভাব বিস্তার করে বলে তিনি ও তার ভক্তরা বিশ্বাস করতেন এবং এখনও এ বিশ্বাস করা হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্যে আল্লাহর নাম নিয়ে এ লবঙ্গে ঘ্রাণ নিলে উপকার পাওয়া যায় বলেও তারা বিশ্বাস করেন। এভাবে তিনি ও তার ভক্তরা এ পাথর দু'টিকে আরবের মুশরিকদের 'যাতে আনওয়াতের' সমতুল্য করে নিয়েছেন। লবঙ্গে ঘ্রাণ নেওয়ার সময় আল্লাহর নাম নিয়ে থাকলেও পাথর দু'টির ব্যাপারে তা অলৌকিকভাবে উপকারী হওয়া এবং লবঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে এর প্রভাব বিস্তার করার ধারণা পোষণ করার ফলে তারা শির্কে আকবার বা শির্কে আসগারে পতিত হচ্ছেন; কেননা, কোনো বস্তুর ব্যাপারে এ ধরনের উপকারী

প্রভাব বিস্তারকারী হওয়ার ধারণা করা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্ক করার শামিল।

১২. নিম্নজগতের উপর উর্ধ্বজগতের তারকারাজির প্রভাবে বিশ্বাস করা :

তারকারাজি সৃষ্টির পিছনে মহান আল্লাহর কী উদ্দেশ্য রয়েছে, প্রথম অধ্যায়ে জ্ঞানগত শির্কের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তা আলোচনা করেছি। এখানে যে কথাটি বলতে চাই তা হলো- নিম্ন জগতের উপর উর্ধ্বজগতের তারকা ও গ্রহের প্রভাবের এ ধরনের বিশ্বাস যে শুধু জ্যোতির্বিদ ও সাধারণ মানুষের মধ্যেই রয়েছে তা নয়, অনেক পীর ও দরবেশগণের মাঝেও এ-জাতীয় বিশ্বাস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ চরমোনাই এর প্রথম পীর জনাব সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক (রহ.)-এর কথাই বলা যায়। তিনি মুরীদের প্রতি পীরের দৃষ্টির প্রভাবের কথা প্রমাণ করা প্রসঙ্গে বলেন :

“প্রত্যেকটি জমীনের ক্ষমতা আছে স্বর্ণ পয়দা করার, কিন্তু ঐ জমীনেই স্বর্ণ পয়দা হইবে যেই জমীনের প্রতি ঐ তারকার দৃষ্টি পড়িয়াছে, যেই তারকার দৃষ্টিতে স্বর্ণ পয়দা হয়।”[১০২]

---

[102]. সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, ভেদে মা’রেফত; (ঢাকা : আল-এছহাক প্রকাশনী, সংশোধিত সংস্করণ, ১৪০২ বাংলা), পৃ. ৪৪।

পীর সাহেবের উক্ত কথার দ্বারা সহজেই প্রমাণিত হয় যে, কোনো একটি তারকার প্রভাবে জমীনে স্বর্ণ সৃষ্টি হয় বলে তিনি বিশ্বাস করেন। অথচ এ বিষয়টি কোনোভাবেই শরী'আত স্বীকৃত নয়। যার প্রমাণ আমরা জ্ঞানগত শির্কের আলোচনা প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে দিয়ে এসেছি। যারা এ জাতীয় বিশ্বাস পোষণ করে, তাদের ব্যাপারে ড. বরীকান বলেন :

"কেউ যদি মনে করে যে তারকা নিজেই কিছু পরিবর্তন করে বা নিজেই কোনো কিছুর উপরে প্রভাব বিস্তার করে অথবা মনে করে যে, তা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে কোনো কিছুতে প্রভাব বিস্তার করে, তা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি মুশরিক হয়ে যাবে এবং তার এ জাতীয় ধারণা শির্কে আকবার হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি মনে করে যে, তারকার উদয় বা অস্ত ইত্যাদির সাথে পৃথিবীতে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহ হয়ে থাকে, তা হলে তার এ শির্কটি শির্কে আসগার হিসেবে গণ্য হবে, যা পূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী। শির্কে আসগর হিসেবে গণ্য হবে এ কারণে যে, তারকারাজি যে নিম্ন জগতের উপর প্রভাব বিস্তার করে, এ-কথাটি শরী'আত দ্বারা স্বীকৃত নয়। অতএব তারকার ব্যাপারে এ ধরনের কথা বলা আল্লাহর উপর না জেনে কথা বলার শামিল।"[১০৩]

---

[103]. ড. ইব্রাহীম আল-বরীকান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৬।

মানুষের উপর কোনো গ্রহের প্রভাব থাকা মিথ্যা হওয়ার বাস্তব প্রমাণ :

২০০৪ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন তিনজন। তন্মধ্যে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় জর্জ ডব্লিউ বুশ আর চেলেঞ্জার জন কেরির মধ্যে। সকল মানুষেরই ধারণা ছিল এ নির্বাচনে জন কেরিই জয়ী হবেন। এ অবস্থা দৃশ্যে ভারতীয় জ্যোতিষীরাও বিশ্বজনমতের সাথে সুর মিলিয়ে এ কথাই বলেছিলেন। এ প্রসঙ্গে দিল্লীর এষ্ট্রোলজি ষ্টাডি এণ্ড রিসার্চ ইন্সটিটিউটের প্রধান জ্যোতিষী শাস্ত্র লেখক লক্ষণ দাস মদন জানান:

“মাস খানেক ধরে যুক্তরাষ্টের জনগণের মতামত জরিপে প্রেসিডেন্ট বুশ ও তার প্রতিদ্বন্দ্বী জন কেরির পক্ষে সমর্থন প্রায় কাঁধে কাঁধ সমান রেখে চলছে। কিন্তু গ্রহরাশির পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বুশ পুনরায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ফিরে আসতে পারবেন না। অন্যদিকে জন কেরির রাশিফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে শনি গ্রহ বর্তমানে চাঁদ থেকে সরে তৃতীয় কক্ষে অবস্থান করছে যা তার জন্য সর্বাধিক অনুকূলে। তিনি আরো বলেন, কেরির উপর প্রভাব বিস্তারকারী বুধ ও মঙ্গলগ্রহ যথাক্রমে পঞ্চম এবং তৃতীয় অক্ষ থেকে সাফল্যজনকভাবে পারস্পরিক অবস্থান

পরিবর্তন করেছে। এটা মার্কিন নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রতি ইঙ্গিতবহ। এতে উপলব্ধি হচ্ছে জন কেরি হবেন আগামী মার্কিন প্রেসিডেন্ট।"[১০৪]

এই হচ্ছে একজন বিশিষ্ট জ্যোতিষীর মার্কিন নির্বাচন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল তার এ ভবিষ্যদ্বাণী সম্পূর্ণ মিথ্যা। নির্বাচনে জন কেরির পরিবর্তে বুশই পুনরায় বিপুল ভোটের ব্যবধানে নির্বাচিত হলেন। এতে প্রমাণিত হয়ে গেল যে, মানুষের উপর গ্রহের প্রভাব থাকার ব্যাপারে জ্যোতিষীরা আবহমান কাল থেকে যা বলে আসছে তা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

উপাসনাগত শির্ক

আমরা প্রথম অধ্যায়ে এ-কথা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, আরবের মুশরিকরা মহান আল্লাহকে এ মহাজগতের সৃষ্টিকর্তা, জীবিকা দানকারী, জীবন ও মৃত্যুদাতা এবং পরিচালক বলে স্বীকৃতি দিত। এ স্বীকৃতির পাশাপাশি তারা বিভিন্নভাবে আল্লাহর উপাসনাও করতো। সে-জন্য তারা নিজেদেরকে দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলেও দাবী করতো। তবে সৃষ্টি, রেযেক, জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে তারা যেভাবে আল্লাহর তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল, উপাসনার

---

[104]. দেখুন : দৈনিক ইনকিলাব, ৩০ অক্টোবর, শনিবার, ২০০৪ খ্রি., পৃ.৬।

ক্ষেত্রে তারা সেরকম বিশ্বাসী ছিল না। তারা বাহ্যিক কিছু উপাসনাদি বিশেষভাবে আল্লাহর জন্যে করলেও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অন্তরের সাথে সম্পর্কিত আল্লাহর উপাসনাদিতে আল্লাহর সাথে অতীতের কিছু ওলিদের নামে নির্মিত মূর্তি এবং ফেরেশতাদের উদ্দেশ্য করে নির্মিত কিছু গাছ ও পাথরের প্রতিমা ও দেবীদেরকে শরীক করে নিয়েছিল। আমাদের দেশের মুসলিমদের আউলিয়া কেন্দ্রিক যে বিশ্বাস ও তাঁদের কবর কেন্দ্রিক যে সব কর্ম রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তাদের অনেকেই আল্লাহর উপাসনায় ওলিগণ কে শরীক করে নিয়েছেন। এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে তারা আরবের মুশরিকদেরকেও অতিক্রম করে গেছেন। নিম্নে তাদের কতিপয় শির্কী কর্মের উদাহরণ বর্ণিত হলো :

১. আল্লাহ তা'আলার নামের যিকরের সাথে বা এককভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামের যিকর করা :

এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ইয়া আল্লাহ, ইয়া রহমানু[105] ইত্যাদি বলে মুখে জপ করাকে আল্লাহর যিকির ও তাঁর উপাসনা

---

[105] যদিও শুধু আল্লাহ বা শুধু রাহমান অথবা শুধু রাহীম নামের যিকির কুরআন ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত নয়। অবশ্যই সাথে থাকতে হবে কি জন্য তাঁকে ডাকা হচ্ছে সেটার উল্লেখ। [সম্পাদক]

বলা হয়। এ জাতীয় যিকির কেবল তাঁর নাম ও গুণাবলী ব্যতীত অপর কারো নাম নিয়ে করা শির্কের অন্তর্গত। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক যিকিরকারীকে 'ইয়া আল্লাহু' বলে যিকির করার পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসার আতিশয্যে 'ইয়া রাহমাতুল্লিল আলামীন' বলে তাঁর নামেও যিকির করতে দেখা যায়। অনেককে আবার **'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বা 'নূরে রাসূল নূরে খোদা'** বলেও যিকির করতে দেখা যায়। এ জাতীয় যিকির করার প্রচলন কুমিল্লা জেলার কোতয়ালী উপজেলার মুহাম্মদ আলী দরবেশের ভক্তদের মধ্যে রয়েছে। অনুরূপভাবে **'হক বাবা হক বাবা'** বলেও কোনো কোনো কবরের ভক্তদেরকে তাদের পীর সাহেবের নামে জিকির করার প্রচলন রয়েছে।

২. কবরমুখী হয়ে বা কবরের পার্শ্বে নামায আদায় করা :

আল্লাহর উপাসনাকে শির্কমুক্ত রাখার জন্য কবরমুখী হয়ে বা কবরের পার্শ্বে নামায আদায় করা থেকে নিষেধ করে দিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«لاَ تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُوْرِ»

"তোমরা কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করবে না।"[১০৬]

যদি কেউ তা করে তবে তার এ সালাত দ্বারা আল্লাহর তা'যীম আদায় না হয়ে কবরবাসীরই তা'যীম প্রকাশিত হয়ে থাকবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোনো কবরের ভক্তদের মধ্যে এমনটি করার প্রচলন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ শরীয়তপুর জেলার 'শুরেশ্বর' কবরের ভক্তদের কথাই বলা যায়। তাদের অনেকেই তাদের পীরের কবরকে ক্বিবলার মত গণ্য করে সে দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে থাকে। কবরের পার্শ্বে কবরের তা'যীম করার উদ্দেশ্য ছাড়া সালাত আদায় করা হারাম, শির্ক নয়। তবে কেউ যদি কবরের তা'যীম করার উদ্দেশ্যে এর পার্শ্বে সালাত আদায় করে, তা হলে শির্ক হিসাবে গণ্য হবে। মুল্লা আলী ক্বারী হানাফী উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন :

ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر و لصاحبه لكفر المعظم

"এ তা'যীম যদি কবর ও কবরস্থ ব্যক্তির জন্যে হয়ে থাকে, তা হলে তা'যীমকারী কাফের হয়ে যাবে।"[১০৭]

---

106. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানাইয, ২/৬৬৮;নাসাঈ, প্রাগুক্ত; ২/৬২; আহমদ, প্রাগুক্ত; ৪/১৩৫।

৩. দ্রুত দো‘আ কবুল হওয়ার আশায় মুরশিদ বা পীরের বৈঠকখানার দিকে মুখ করে দো‘আ করা :

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ﴾ [البقرة: ١١٥]

“তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাওনা কেন সে দিকেই আল্লাহর দিক রয়েছে”[১০৮]

এ আয়াতের ভিত্তিতে যে কোনো দিকে মুখ করে আল্লাহকে ডাকা যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি আল্লাহর দিকে মুখ না করে দ্রুত দো‘আ কবূলের জন্য তার মুরশিদ বা পীরের বৈঠকখানার দিকে মুখ করে, তা হলে এ উপাসনা আল্লাহর জন্য না হয়ে তার মুরশিদ বা পীরের জন্যেই হবে। এ জাতীয় কর্মের প্রচলন ফরিদপুর জেলার আটরশির বিশ্বজাকির মঞ্জিলের ভক্তদের মাঝে রয়েছে। অথচ আল্লাহর নিকট কিছু চাইতে হলে সরাসরি তা তাঁরই কাছে চাওয়ার নির্দেশ করে তিনি বলেছেন :

---

[107]. মুল্লা আলী ক্বারী আল-হানাফী, আল-মিরক্বাত ফী শরহিল মিশকাত; ২/৩৭২।

[108]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাঃ :১১৫।

﴿ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ ﴾ [غافر: ٦٠]

"তোমরা আমাকে আহ্বান কর, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব"।[১০৯] আমরা যদি আল্লাহ- মুখী হয়ে তাঁর কাছে সরাসরি না চেয়ে অপর কোনো মৃত মানুষের মাধ্যমে তাঁর কাছে কিছু চাই, তা হলে এ চাওয়া আল্লাহর কাছে না হয়ে মধ্যস্থ সে ব্যক্তির কাছেই চাওয়া হিসেবে গণ্য হবে। কেননা; এ জাতীয় চাওয়া আল্লাহর নিকট সরাসরি চাওয়ার উপাসনায় তাঁর সাথে মধ্যস্থ ব্যক্তিকে শরীক করে নেয়া হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আর এ জাতীয় উপাসনার ব্যাপারে হাদীসে কুদসীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً وَأَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَ شِرْكَهُ وَجَعَلْتُ الْعَمَلَ لِلَّذِيْ أَشْرَكَهُ»

109. আল-কুরআন, সূরা গাফির : ৬০।

"যে ব্যক্তি কোনো কাজে আমার সাথে অপর কাউকে শরীক করে, আমি তাকে ও তার কর্মকে ছেড়ে দেই এবং এ কাজে যাকে সে শরীক করেছে, তাকেই সে কাজটি দিয়ে দেই।"[১১০]

৪. ওলীদের নিকট কিছু কামনা করা :

মানুষের জীবনে এমন অনেক প্রয়োজন রয়েছে যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কেউ পূরণ করতে পারে না। সে সব প্রয়োজনের মধ্যে রয়েছে : সন্তান দান, রোগ মুক্তি, ব্যবসায় উন্নতি ইত্যাদি। এ জাতীয় বিষয় প্রাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কর্ম ক'রে তা আল্লাহ তা'আলার কাছেই কামনা করতে হয়। কিন্তু অনেক কবর যিয়ারতকারী এ জাতীয় বিষয়াদিও অলিগণের নিকট কামনা করে থাকেন, যা সুস্পষ্ট শির্ক।

৫. ওলীদেরকে সাহয্যের জন্য আহ্বান করা :

স্বাভাবিক অবস্থায় কাউকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করাকে বলা হয় ইস্তে'আনাহ (استعانة), আর বিপদমুহূর্তে সাহায্যের জন্য কাউকে আহ্বান করাকে বলা হয় 'ইস্তেগাছাহ' (استغاثة), এ উভয়

---

110. মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুয যুহদ, বাব নং: ৫, হাদীস নং ২৯৮৫; ৪/২২৮৯; আহমদ, প্রাগুক্ত; ২/২০১।

অবস্থায় সাহায্যের জন্য কেবল সে মানুষকেই আহ্বান করা যেতে পারে যিনি জীবিত এবং উপস্থিত। কোনো অনুপস্থিত বা মৃত মানুষকে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাদের নিকট সাহায্য চেয়ে আহ্বান করা যায় না; যদি কেউ তা করে, তবে ধরে নিতে হবে যে, সে তাদের প্রতি গায়েব সম্পর্কে জানার ধারণা পোষণ করে এবং আল্লাহর ন্যায় অলৌকিকভাবে তারা মানুষের সাহায্য করতে পারেন বলেও বিশ্বাস করে, যা সুস্পষ্ট শির্ক। আমাদের দেশের সাধারণ লোকেরা ওলীদেরকে উপর্যুক্ত দুই ধারণার ভিত্তিতেই 'ইয়া গউছ, ইয়া খাজা, ইয়া গরীব নেওয়াজ' ইত্যাদি বলে দূর-দূরান্ত থেকে তাঁদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে থাকেন[111]।

৬. ওলীদের কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে বিনয় প্রকাশ করা :

নামায হচ্ছে আল্লাহর সাথে বান্দার সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ ও মুনাজাত। এর মাধ্যমে বান্দা যেমন আল্লাহর তা'যীম প্রকাশ

---

[111] সুতরাং দেখা গেল যে, এ ধরনের আহ্বান ও সাহায্যপ্রার্থনা দু'দিক থেকে শির্ক। এক. সে মনে করছে যে এ ব্যক্তি তার আহ্বান সম্পর্কে দূরে থেকেও জানছে, যা ইলমে গায়েবের জ্ঞানের অংশ, আবার ধারণা করছে যে এমন সময়ে সে সাহায্য করতে সক্ষম, যা আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ শক্তির সাথে শরীক করা। এ দুটোই শির্ক ফির রবুবিয়্যাহ। আর সে যে আল্লাহ ব্যতীত অন্যদের আহ্বান করছে সেটা উলুহিয়্যতে শির্ক। [সম্পাদক]

করে, তেমনি অত্যন্ত সংগোপনে আল্লার কাছে তার মনের আকুতি, মিনতি ও প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করে। এ জন্য প্রয়োজন হয় বিনয় ও একাগ্রতার। সে জন্য আল্লাহ তা'আলা নামাযে তাঁর সম্মুখে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়াবার নির্দেশ করে বলেছেন :

﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَٰنِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]

"তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে (সালাত আদায় করার সময় তাঁর সামনে) অত্যন্ত বিনয়ের সাথে দাঁড়াও।"[১১২] কেউ নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে বিনয়ের সাথে কেবলামুখী হয়ে দাঁড়ালে বাহ্যিক দৃষ্টিতে তা উপাসনার মত দেখালেও প্রকৃত অর্থে তা নামায হিসেবে তখনই গণ্য হবে যখন এর সাথে ভালবাসা ও এখলাসের সংমিশ্রণ হবে। নামাযে দাঁড়িয়ে একজন নামায আদায়কারী এভাবে আল্লাহর সম্মান ও তা'যীম প্রকাশ করে থাকে। মানুষের পক্ষে এ ধরনের তা'যীম প্রকাশ একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্যে করা শির্ক। কিন্তু অনেক পীর ও আউলিয়া ভক্তদের দেখা যায় তারা নিজ পীর ও ওলিদের তা'যীম করার জন্য তাঁদের পীরের সামনে বা ওলিদের কবরে অনুরূপ

---

[112]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ২৩৮।

বিনয় প্রকাশের মাধ্যমে তাঁদের তা'যীম করে থাকেন। সাথে সাথে কবরস্থ ওলিদের নিকট তাদের প্রয়োজনের কথাও অত্যন্ত বিনয়ের সাথে পেশ করে থাকেন যা সম্পূর্ণ শির্ক।

৭. আল্লাহর ইবাদতের জন্য কবরের পার্শ্বে ই'তেকাফ বা অবস্থান করা

ই'তিকাফ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোনো উদ্দেশ্যে কোথাও অবস্থান গ্রহণ করা। শর'য়ী পরিভাষায় আল্লাহর উপাসনার উদ্দেশ্যে দশ দিন বা এর কম-বেশী সময়ের জন্য কোনো মসজিদে অবস্থান গ্রহণ করাকে ই'তিকাফ বলা হয়। এটি আল্লাহর একটি বিশেষ ধরনের উপাসনা। যা মসজিদেই কেবল করা সম্ভব। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿ وَطَهِّرۡ بَيۡتِيَ لِلطَّآئِفِينَ وَٱلۡقَآئِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلسُّجُودِ ﴾ [الحج: ٢٦]

"তুমি আমার গৃহ (মাসজিদুল হারাম)-কে ত্বাওয়াফকারী, অবস্থান তথা ই'তিকাফকারী, রূকূ' ও সেজদাকারীদের জন্য পবিত্র রাখ।"[১১৩]

[113]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ১২৫।

কোনো কবর বা দরবার যেহেতু মসজিদ নয়, সুতরাং আল্লাহর উপাসনার জন্য সেখানে অবস্থান গ্রহণ করা জায়েয নয়। কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমনটি করলে তা বেদ‘আতী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। কেউ যদি কোনো কবরে অবস্থানের দ্বারা কবরস্থ ওলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চায়, তা হলে তার এ অবস্থান শির্কী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে; কেননা যুগে যুগে মুশরিকরা তাদের দেবতাদের পার্শ্বে এ জাতীয় উদ্দেশ্যেই অবস্থান গ্রহণ করতো।[১১৪] এর প্রমাণ আমরা প্রথম অধ্যায়ে দিয়ে এসেছি। তাওহীদকে যথাযথভাবে অনুধাবন করে থাকলে কোনো মু’মিনের পক্ষে এ ধরনের কর্ম করা কখনও সম্ভব হতে পারে না। তবে আমাদের দেশের অনেক মুসলিমকে এ-ধরনের কর্ম করতে

---

[114]. ইব্রাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর জাতির মুশরিকদের লক্ষ্য করে বলেন,

﴿ مَا هَٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِيٓ أَنتُمۡ لَهَا عَٰكِفُونَ ﴾ [الانبياء: ٥٢]

“এ মূর্তিগুলো কি যে তোমরা এর পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করছো।” সূরা ত্বা-হা : ৯১। মুসা আলাইহিস সালাম-এর জাতির মুশরিকরা গরু পূজা করা উপলক্ষ্যে বলেছিল :

﴿ قَالُواْ لَن نَّبۡرَحَ عَلَيۡهِ عَٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرۡجِعَ إِلَيۡنَا مُوسَىٰ ٩١ ﴾ [طه: ٩١]

“মূসা আলাইহিস সালাম ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা এর পার্শ্বে অবস্থান করেই যাব।” সূরা আম্বিয়া : ৫২।

দেখা যায়। শাহজালাল (রহ.) বা হাইকোর্টে অবস্থিত শরফুদ্দিন চিশ্তি বেহেশতী (রহ.)-এর কবরে গেলে অসংখ্য লোককে এ জাতীয় কর্ম করতে দেখা যায়। এমনকি কোনো কোনো কবরে যিয়ারতের সময় কিভাবে, কতদূরে বসতে হবে, তাও বোর্ডে লিখিত দেখতে পাওয়া যায়।

৮. কবরের চার পার্শ্বে প্রদক্ষিণ করা :

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হজ্জ এবং 'উমরা পালনের সময় ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়েও কেবলমাত্র মসজিদুল হারামের চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ বা প্রদক্ষিণ করার অনুমতি দিয়েছেন। এ কাজটি তাঁর সম্মান ও তা'যীম প্রকাশের একটি বিশেষ মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে বলেছেন :

﴿ وَلۡيَطَّوَّفُواْ بِٱلۡبَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩]

"তোমরা সম্মানিত গৃহ অর্থাৎ কা'বা শরীফের চার পার্শ্বে ত্বওয়াফ কর।"[১১৫]

---

115. আল-কুরআন, সূরা হজ্জ : ২৯।

ত্বওয়াফের এ উপাসনাটি কা'বা শরীফের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ার ফলে তা কোনো কবরে করা বৈধ হওয়া তো দূরের কথা, অপর কোনো মসজিদের চার পাশে করারও কোনো অনুমতি নেই। কেউ যদি আল্লাহর উপাসনার উদ্দেশ্যে তা কোনো মসজিদে করে তবে তা বেদ'আত হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি কোনো ওলির কবরে করে, তবে তা শির্কী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষদেরকে বিভিন্ন সময়ে ওলীদের কবরে এ ধরনের কর্ম করতে দেখা যায়। বিশেষ করে তথাকথিত শবে বরাতের সময় হাইকোর্ট কবরে এ ধরনের কর্ম অত্যন্ত বেশী হয়ে থাকে।

৯. কবরকে সামনে রেখে রুকূ' ও সেজদা করা:

রূকু' ও সেজদার মাধ্যমে আমাদের ভক্তি ও সম্মান লাভের একক অধিকারী হলেন মহান আল্লাহ। মানুষ কোনো মানুষকে এভাবে সম্মান করলে এটি একটি প্রত্যক্ষ শির্কী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। অনুসরণীয় ব্যক্তিবর্গের সম্মানের শর'য়ী পন্থা হচ্ছে-তাঁদের আগমনের সংবাদ পেলে তাঁদেরকে এগিয়ে নিয়ে আসা, বা আসতে দেখলে এগিয়ে যেয়ে সালাম, মুসাফাহা ও আলিঙ্গন করা, কপালে ও হাতে চুমু দেওয়া। সাধ্যানুযায়ী আদর ও আপ্যায়ন

করা। তাঁদের বিদায়ের সময় তাঁদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া ও সম্মানের সাথে বিদায় করা। কিন্তু ওলি ও পীরদের ভক্তগণ মানুষকে সম্মান প্রদর্শনের এ বৈধ পন্থা অতিক্রম করে অলিগণের কবরে সেজদা করে থাকেন এবং পীরদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তাদের পায়ে পড়ে সেজদা করে থাকেন; কেননা তাদের দৃষ্টিতে ওলি ও পীরদের মন জয় করাই হলো প্রকৃত কাজ। তা করতে পারলেই সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! এ উদ্দেশ্যেই দেওয়ানবাগের পীরকে তার ভক্তরা সেজদা করে থাকে।

১০. কবর, মাযার, দরবার ও মুকামে মানত করা:

অসুখ-বিসুখ নিবারণ, কিছু প্রাপ্তি বা পার্থিব যে কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য আল্লাহর নামে কিছু প্রদান করার নিয়ত করাকে মানত বলা হয়। এর দ্বারা আল্লাহর সম্মান প্রদর্শিত হয় বিধায়, তা আল্লাহর একটি বিশেষ উপাসনা। মানতের মাধ্যমে মূলত নির্দিষ্ট কোনো ব্যাপারে তড়িৎ গতিতে আল্লাহর রহমত ও করুণা প্রাপ্তির আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। সে জন্য তা একনিষ্টভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে- যে স্থানে তা প্রদান করা হবে সে স্থানটি অবশ্যই যাবতীয় ধরনের শির্কী কর্মকাণ্ড

থেকে এবং তা মুশরিকদের বার্ষিক মেলা, ঈদ বা ওরস পালন করা থেকে পবিত্র হতে হবে।[১১৬]

মানত দেওয়ার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে- মসজিদ, মাদ্রারাসা, অসহায় এতীম, বিধবা, ফকীর, মিসকীন, অভাবী ও সমাজ কল্যাণমূলক খেদমতের স্থানসমূহ। ওলিদের কবরে তিনটি কারণে কোনো মানত দেয়া বৈধ নয় :

প্রথমত :

মানতের উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দ্রুত আল্লাহর রহমত কামনা করা। মানতের উদ্দেশ্য যদি তা-ই হয়, তা হলে তা যেমন হতে হবে সরাসরি আল্লাহর কাছে, তেমনি তা হতে হবে এমন এক স্থানে যেখানে কেবল আল্লাহ ব্যতীত তাঁর কোনো সৃষ্টির কাছে কিছু কামনা করা হয় না। যারা ওলিদের কবরে মানত করে তারা সংশ্লিষ্ট উদ্দেশ্যটি হয় সরাসরি ওলিদের নিকটেই কামনা করে অথবা তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে কামনা করে। যদি তাঁদের কাছে চেয়ে থাকে তা হলে তারা প্রকাশ্যই শির্ক করে। আর যদি তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চেয়ে থাকে, তা হলে তারা

---

[116]. এ সম্পর্কে দাহ্হাক রহ. থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা প্রথম অধ্যায়ে মানত সম্পর্কিত আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহকে এই বলে অভিযুক্ত করে যে, তিনি তাঁর সাধারণ বান্দাদের অভাব ও অভিযোগের কথা অপর কোনো মাধ্যম ব্যতীত গ্রহণ করতে চান না। অথচ আল্লাহ তা'আলা এ-জাতীয় অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। পাপী-তাপী নির্বিশেষে সকলের জন্যেই তাঁর দরজা উন্মুক্ত। কোনো মৃত ওলি ও দরবেশদেরকে তাঁর এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতা করার জন্য তিনি নিযুক্ত করেন নি। এটি মূর্খ ও ভণ্ডপীর এবং সাধারণ মানুষদের একটি সাজানো কল্পকথা বৈ আর কিছুই নয়। ওলিদের কবরে মানত করলে যেখানে এতো কথা রয়েছে, সেখানে মানত করা কি করে বৈধ হতে পারে।

দ্বিতীয়ত :

কবর বা কবরে মানতকারীর উদ্দেশ্য যদি সঠিকও হয়, তিনি যদি তার উদ্দেশ্যের কথা সরাসরি আল্লাহর কাছেই আবদার করে থাকেন, তবুও কোনো কবর বা কবরে মানত করা বৈধ নয়; কেননা, কবর বা কবরে মানতকারী সাধারণ ও মূর্খ লোকেরা উপর্যুক্ত এ অভিযোগদ্বয় থেকে মুক্ত নয়। আর যাহ্হাক রহ. এর হাদীস অনুযায়ী যেখানে শির্ক হয় সেখানে কোনো মানত করা বা করে থাকলেও সেখানে তা পূর্ণ করা বৈধ নয়।

তৃতীয়ত :

ওলিদের কবরে বার্ষিক যে ওরস পালিত হয়, তা আরবের মুশরিকদের বার্ষিক সে ঈদেরই সমতুল্য, যা তারা বছরান্তে পালন করতো। এ জাতীয় ঈদ পালন শরী'আতে নিষিদ্ধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কবরকে এ জাতীয় ঈদ পালনের স্থান বানাতে তাঁর সাহাবীদের তথা আমাদের নিষেধ করেছেন, যার প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে প্রদত্ত হয়েছে। এমতাবস্থায় কোনো ওলির কবরে মানত দেয়া কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। দিলেও তা সেখানে পূর্ণ করা জায়েয নয়। তা সত্ত্বেও দেশের সাধারণ মুসলিমরা ওলিদের কবর এমনকি তাঁদের স্মৃতি বিজড়িত কবর ও মুকাম তথা অবস্থানসমূহে মানত দিয়ে থাকে। সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তা পাওয়া যায় কি না, এ সন্দেহে তারা যে-সব স্থানে মানত দেয়া বৈধ, সেখানে মানত না দিয়ে ওলিদের কাছে অথবা তাঁদের মধ্যস্থতায় চাওয়ার জন্য তাঁদের কবরে মানত দিয়ে থাকে। معاذ الله

১১.গায়রুল্লাহের নামে পশু যবাই করা:

আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করে এসেছি যে, পশু যবাই তা কোনো মানতের হোক আর না হোক সর্বাবস্থায় তা যবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে তা যবাই করা হচ্ছে তাঁর একটি বিশেষ উপাসনা। এতে

যেমন আল্লাহর তাওহীদ ঘোষিত হয় তেমনি এর দ্বারা তাঁর মর্যাদা সমুন্নত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও আমাদের দেশে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে। বিভিন্ন কবরে যারা মানত বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে পশু নিয়ে যায়, সেখানে তা যবাই করার সময় অনেকে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করার বদলে পীর বা পীরের দরগার নাম উচ্চারণ করে থাকে। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা মতে ফরিদপুর জেলার বিশ্ব জাকের মঞ্জিলে এমনি ধরনের কর্ম হয়ে থাকে। সেখানে গরু যবাই করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণের পরিবর্তে 'জয় বিশ্ব জাকের মঞ্জিল' বলে তা যবাই করা হয়। অথচ এ ধরনের যবাই যে কুরআনে বর্ণিত (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّٰهِ بِهِ) "আর যা গায়রুল্লাহের নামে উৎসর্গকৃত হয়"[১১৭] এ আয়াতের মর্মানুযায়ী গায়রুল্লাহের নামে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে এবং সে অনুযায়ী এ ধরনের যবাইকৃত গরুর মাংস খাওয়া সন্দেহাতীতভাবে হারাম হয়ে যায়।

১২. আল্লাহ তা'আলাকে ভালবাসার ন্যায় নিজের পীরকে ভালবাসা:

আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে ভালবাসার অর্থ হচ্ছে- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বর্ণিত ও প্রদর্শিত আল্লাহ তা'আলার

---

[117]. আল-কুরআন; সূরা আল-মায়িদাহ : ৩।

শরী‘আতকে আন্তরিকতা ও আগ্রহের সাথে সাধ্যানুযায়ী পালন করা। শরী‘আতের আদেশ ও নিষেধসমূহকে নিজের পছন্দ ও অপছন্দের উপরে স্থান দেয়া। আল্লাহর হুকুম পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য প্রয়োজনে নির্দ্বিধায় নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকা। শরী‘আতের এ-জাতীয় নিঃশর্ত অনুসরণ ও আনুগত্য করাকেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালবাসা বলা হয়। এ জাতীয় ভালবাসা আল্লাহর এক ধরনের উপাসনা। যা তিনি ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতায় অন্য কারো আদেশ বা নিষেধ পালনের ক্ষেত্রে প্রকাশ করা শির্ক। আমাদের দেশে পীর ও কবর ভক্ত এমন অনেক মানুষ রয়েছে যাদেরকে শরী‘আত বিহীন তরীকত ও মা‘রিফাত নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। তারা তাদের পীরের নির্দেশে শরী‘আতের বিধি-বিধান পালন করা থেকে বিরত থাকে এবং পীরের নির্দেশকে শরী‘আতের নির্দেশের উপরে ভালবেসে থাকে। আমার জানা মতে সমাজে এমন লোকও রয়েছে যারা নিজের পীরের ভালবাসার আতিশয্যে পীরের হাতে অন্যায়ভাবে নিজের জীবনটুকুও বিলিয়ে দিয়েছে। শরী‘আতের বিধি-বিধান পালন না করে এভাবে তাদের পীর বা কোনো কবরের ওলিকে ভালবাসার মাধ্যমে যারা আখেরাতে নাজাত পেতে চায়, তারা

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের চেয়ে তাদের পীর বা ওলিকেই অধিক ভালবেসে থাকে। আর এভাবেই তারা আল্লাহর নিঃশর্ত ভালবাসার ক্ষেত্রে নিজেরদের পীর বা ওলিকে শরীক করে থাকে। এদের ব্যাপারেই মহান আল্লাহ বলেছেনঃ

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمۡ كَحُبِّ ٱللَّهِۖ﴾ [البقرة: ١٦٥]

"মানুষের মাঝে এমনও কিছু লোক রয়েছে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে (তাঁর উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে) অসংখ্য সমকক্ষ নির্ধারণ করে, তাদেরকে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসে।"[১১৮]

তারা যে তাদের পীর বা ওলিকে আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালবাসে এর জ্বলন্ত প্রমাণ হলো- যে সেজদার মাধ্যমে আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর সম্মান প্রদর্শিত হয়, তারা তা আল্লাহকে না করে তাদের পীর ও ওলিদেরকে করে থাকে।

১৩. অন্তরে পীর ও ওলিদের অনিষ্টের গোপন ভয় করা :

---

118. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ১৬৫।

শত্রুর ষড়যন্ত্র, সাপের দংশন ও হিংস্র জীব-জন্তু ইত্যাদির আক্রমণের ভয় করাকে মানুষের স্বভাবসুলভ ভয় বলা হয়। এ জাতীয় ভয় থেকে সাধারণ মানুষ কেন স্বয়ং নবীগণও মুক্ত থাকতে পারেন না। তাই শর'য়ী দৃষ্টিতে এমন ভয় কোনো দূষণীয় ব্যাপার নয়। তবে কোনো মানুষের প্রতি তিনি শত্রু আর মিত্র যা-ই হোন না কেন এমন ভয় করা যাবে না যে, তিনি বাস্তব কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা ছাড়াই কারো অনিষ্টের ইচ্ছা করলেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনিষ্ট করতে পারেন; কেননা আমাদের অন্তরে এ জাতীয় ভয় কেবল আল্লাহ ব্যতীত আর কারো জন্যে থাকতে পারে না। কিন্তু আমাদের দেশে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন যারা ওলীদের ব্যাপারে এমন গোপন ভয় করে থাকেন। যেমন সিলেট জেলায় অবস্থিত শাহ পরান ওলির ব্যাপারে সাধারণ জনমনে এমন ধারণা রয়েছে যে, তিনি খুবই গরম, তাঁর কবরে কেউ বেআ'দবী করলে তিনি সে ব্যক্তির যে কোনো অনিষ্ট করতে পারেন। অনুরূপভাবে দিনাজপুর জেলার 'চেহেলগাজী' কবরের ব্যাপারে সে এলাকায় এমন ধারণা রয়েছে যে, সেখানে কেউ বেআদবী করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে কোনো মুহূর্তে কোনো দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে। বেআদবী হলে বিপদের আশংঙ্কায় সাধারণ যিয়ারতকারীরা সেখানে যিয়ারত শেষে মুখ সামনে রেখে পিছু হেঁটে বের হয়। গাড়ী চালকেরা দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচার জন্য কবরের নিকটে গাড়ী

নিয়ে আসলে গাড়ীর গতি কমিয়ে নেয়।[১১৯] এ ছাড়াও অনেকে কোনো কবরে গেলে কবরের নিকটস্থ গাছের ডাল ও পাতা কাটতে ও ছিঁড়তে অন্তরে গোপন একটি ভয় অনুভব করে। এ জাতীয় ভয় করা শির্ক। আরবের মুশরিকদের মধ্যে তাদের দেবতাদের ব্যাপারে এ জাতীয় গোপন ভয় বিদ্যমান ছিল। সে জন্য তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে তাদের দেবতাদের অনিষ্টের গোপন ভয় প্রদর্শন করতো। যার প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

১৪. আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর ভরসা করা:

ইহ-পরকালীন যে কোনো বিষয় অর্জিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত কর্ম করার পর তা অর্জিত হওয়ার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করা হচ্ছে অন্তরের একটি অন্যতম উপাসনা। কোনো কর্ম করা বা উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ার ক্ষেত্রে মানুষ মানুষের সাহায্যকারী হতে পারে। তবে কোনো অবস্থাতেই কেউ কারো ভরসা হতে পারে না, কেননা কোনো কাজ আরম্ভ করা এবং সফলভাবে তা সম্পন্ন করা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কোনো মানুষ কাউকে সাহায্যের জন্য ইচ্ছা করলে তার ইচ্ছা ও কর্ম বাস্তবে কেবল তখনই রূপ নিতে পারে

---

[119]. গোলাম ছাকলায়েন, প্রাগুক্ত; পৃ.৪৮।

যখন এর সাথে আল্লাহর ইচ্ছার সংমিশ্রণ ঘটে, অন্যথায় নয়। তাই আল্লাহই হলেন আমাদের যাবতীয় কর্মের একক ভরসা। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোনো কোন কর্মের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষদের মুখে এমন কথা বলতে শুনা যায় যে, ‘একাজে আপনিই আমার একমাত্র ভরসা’, ‘আপনার উপর আমি ভরসা করেছি’, আবার অনেককে আখেরাতে মুক্তির জন্য সঠিক ঈমান ও সৎকর্ম করে আল্লাহর রহমতের উপর ভরসা না করে ওলি ও পীরদের শাফা‘আতের উপর ভরসা করতে দেখা যায়।

১৫. আল্লাহ ও রাসূল ব্যতীত কোনো মানুষের মত ও পথের অন্ধ আনুগত্য ও অনুসরণ করা :

কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত যাবতীয় বিধানের যথাসাধ্য অনুসরণ ও আনুগত্য করা হচ্ছে আল্লাহর বিধানের আনুগত্যের উপাসনা। এ উপাসনার প্রতি নির্দেশ করে মহান আল্লাহ বলেছেন:

﴿ٱتَّبِعُواْ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكُم مِّن رَّبِّكُمۡ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِۦٓ أَوۡلِيَآءَۗ﴾ [الاعراف: ٣]

“তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো অভিভাবকদের অনুসরণ করো না।”[১২০]

আল্লাহর বিধানের অনুসরণ ও আনুগত্যের এ উপাসনা মানুষের যাবতীয় চিন্তা, চেতনা, কাজ-কর্ম ও কথার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবে। আর সে-জন্যে জ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সবাইকে তাকলীদ বা অনুসরণের যে সঠিক পদ্ধতির কথা প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে তা অনুসরণ করতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এক্ষেত্রেও দেশের সাধারণ লোকদের মত অনেক জ্ঞানী লোকেরাও অনেকটা নিজেদের অজান্তেই অনুসরণের বৈধ নীতিমালা লঙ্ঘন করে চলেছেন। সাধারণ লোকজন অন্ধভাবে তাদের পীরদের আনুগত্য ও অনুসরণ করে থাকেন। কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা তাদের কোনো কর্মের ত্রুটি প্রমাণ করে দিলেও তারা তাদের পীর সাহেবের নির্দেশ ব্যতীত তা পরিত্যাগ করেন না।

ধর্মীয় ক্ষেত্রে জ্ঞানী অধিকাংশ আলেমগণ নিজ মাযহাবের নিঃশর্ত ও নির্বিচারে অনুসরণ করেন। কোনো বিষয়ে নিজের ইমাম বা মাযহাবে প্রচলিত আমলের বিপরীতে সহীহ হাদীসের

---

[120]. আল-কুরআন, সূরা আ‘রাফ : ৩।

সন্ধান পেলেও বিভিন্ন অনর্থক যুক্তি ও তর্ক দাঁড় করিয়ে তারা নিজের ইমামের মত বা মাযহাবের অনুসরণ করেন এবং সহীহ হাদীসকে আমলের অযোগ্য বা তা শাফিঈ মাযহাবের অনুসারীদের জন্য প্রযোজ্য বলে পরিত্যাগ করেন। এভাবে তারা নিজ মাযহাবে প্রচলিত যাবতীয় আমলকেই নির্বিচারে ও অন্ধভাবে অনুসরণ করে থাকেন। যদিও মাযহাবের কিতাবাদির ব্যাখ্যা গ্রন্থে বা টীকা-টিপ্পনীতে অনেক সত্যানুরাগী আলেমগণ নিজ মাযহাবে প্রচলিত কিছু কিছু আমলের বিপরীতে অবস্থিত সহীহ হাদীসসমূহের উপর আমল করাকেই সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লামা সুন'উল্লাহিল হালাবী আল-হানাফী (মৃত ১০৫০হি:) তাঁর 'আল-কাউলুস সদীদ ফী মাসাইলিত তাকলীদ' নামক রিসালায় বলেন :

"لا علينا أن لا نأخذ بما ظهر لنا صواب خلافه إذ أنعم الله علينا بحصول ضرب من النظر ، يمكن الوقوف به على الصواب ، هذا ونحن مع ذلك لا نخرج عن درجة التقليد لإمامنا الأعظم أبي حنيفة المقدم"

"নিজ ইমামের মতের বিপরীত কোনো সঠিক বিষয় আমাদের নিকট প্রমাণিত হলে তা গ্রহণ করাতে আমাদের কোনো দোষ নেই কারণ, আল্লাহ আমাদেরকে কিছু চিন্তা-ভাবনা করার নেয়ামত দান করেছেন, যদদ্বারা আমাদের পক্ষেও সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব।

ইমামের মতের বিপরীতে সঠিক কথা গ্রহণ করলেও এতে আমরা আমাদের অগ্রবর্তী ইমামে আ'যম আবু হানীফা (রহ.)-এর তাকলীদ করা থেকে মুক্ত হবো না।''[১২১]

এমনকি তাঁরা সে সব হাদীসের উপর মাযহাবের অতীতের বহু মীষীগণের আমল থাকার কথাও অকপটে স্বীকার করেছেন। সহীহ হাদীস নিজ ইমামের ফতোয়ার বিপরীতে পাওয়া গেলে তা পরিত্যাগ করে হাদীসের উপর আমল না করলে নিজ ইমামকে নিজের প্রতিপালক বানিয়ে নেয়া হবে বলেও ক্বাযী মাওলানা সানাউল্লাহ পানিপথী হানাফী নিজ মাযহাবের অনুসারীদের সতর্ক করেছেন।[১২২] নির্দিষ্ট কোনো এক মাযহাবের অন্ধ তাকলীদ ও

---

121. দেখুন : মাওলানা আবুল হাসানাত আব্দুল হাই হানাফী, **ফতাওয়া আব্দুল হাই;** (মাকতাবাহ থানবী : দেওবন্দ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি.), পৃ. ১৫৭।

122 তিনি তাঁর তাফছীরে মাযহারী গ্রন্থে وَ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ الله ''আমরা আল্লাহকে ব্যতীত পরস্পরকে অসংখ্য রব বানিয়ে না নেই'' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

ومن هنا يظهر أنه إذا صح عند أحد حديث مرفوع من النبي صلى الله علية وسلم سالما من المعارضة، ولم يظهر له ناسخ و كان فتوى أبي حنيفة رحمه الله مثلا خلافه، وقد ذهب على وفق الحديث أحد من الآئمة الأربعة، يجب عليه اتباع الحديث الثابت، و لا يمنعه الجمود على مذهبه من ذلك ، لئلا يلزم اتخاذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله

অর্থাৎ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, যখন কারো নিকট কোনো প্রকার বিরোধ ছাড়াই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমন কোনো

একচ্ছত্র অনুসরণ করা জরুরী বলে কেউ কেউ মত পোষণ করে থাকলেও আসলে যাঁরা তা জরুরী নয় বলে মত দিয়েছেন, তাঁদের কথাই অধিক সঠিক।''[১২৩] হানাফী মাযহাবের উসূলে ফিকহের গ্রন্থ

মারফু' হাদীস প্রমাণিত হয়, যা মানসূখ হয়ে গেছে বলে তার নিকট কোনো প্রমাণ থাকে না থাকে, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর কোনো ফতোয়া উদাহরণত সে হাদীসের বিপরীত প্রমাণিত হয়, আর চার ইমামের কোনো ইমাম এ হাদীসটি গ্রহণ করে থাকেন। তবে উক্ত প্রমাণিত হাদীসের অনুসরণ করা সে ব্যক্তির উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে। তার মাযহাবকে কঠিনভাবে অনুসরণ করা যেন তাকে এ হাদীসের উপর আমল করা থেকে বিরত না রাখে। কেননা; এতে পরস্পরকে অসংখ্য রব বানানোর শামিল হবে।'' দেখুন: মাওলানা সানাউল্লাহ পানিপতী, তাফসীরে মাযহারী; (এদারাতু এশা'আতিল ইসলাম : দিল্লী, সংস্করণ ও সন বিহীন), ২/৬৩-৬৪।

[123]. যেমন ইবনে আবিদীন তাঁর হাশিয়াতু রদ্দিল মুহতার গ্রন্থে বলেছেন :

أنه لو التزم مذهبا معينا كأبي حنيفة و الشافعي، فقيل: يلزمه، وقيل : لا، وهو الأصح.

''কেউ যদি ইমাম আবু হানীফা অথবা ইমাম শাফি'ঈ এর মাযহাব অনুসরণ করে, তা হলে সে ব্যক্তির উপর সকল ক্ষেত্রে সে মাযহাবই অনুসরণ করা কি জরুরী হয়ে যাবে? কারো কারো মতে তা জরুরী হয়ে যাবে, আবার কারো কারো মতে তা জরুরী হবে না এবং জরুরী না হওয়ার মতই অধিক সঠিক।'' তদেব; পৃ.১৪৪; অন্ধ তাকলিদের সমালোচনা করতে গিয়ে শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন :

‘আত-তাহরীর’ এর ব্যাখ্যা ‘আত-তায়সীর’ নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে : “কেউ কেউ বলেছেন: সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট এক মাযহাব অনুসরণ করা জরুরী নয়। তাঁদের কথাই অধিক সঠিক; কেননা, আল্লাহ তা‘আলা যা ওয়াজিব করেছেন তা ব্যতীত ওয়াজিব বলতে আর কিছু নেই।”[১২৪] যারা নির্দিষ্ট মাযহাবের নির্বিচারে অনুসরণ করার কথা বলেন এবং কেউ নিজ ইমামের মাযহাব ত্যাগ করলে তাকে শাস্তি দেয়ার কথা বলেন, তাদের ব্যাপারে মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী হানাফী বলেন :

"والحق أنه تعصب لا دليل عليه أصلا.و إنما هو تشريع من عند نفسه"

وفيمن لا يجوز أن يستفتي الحنفي مثلا فقيها شافعيا و بالعكس، ولا يجوز أن يقتدي الحنفي بإمام شافعي مثلا فإن هذا قد خالف إجماع القرون الأولى و ناقض الصحابة والتابعين.

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যিনি কোনো হানাফী ব্যক্তিকে কোনো শাফিঈ ফকীহ এর নিকট এবং কোন শাফিঈ ব্যাক্তিকে কোনো হানাফী ফকীহ এর নিকট ফতোয়া জিজ্ঞাসা করাকে জায়েয মনে না করেন, কোনো হানাফীকে কোনো শাফিঈ মাযহাবের অনুসারী ইমামের পিছনে নামায পড়াকে জায়েয মনে না করেন, তিনি উম্মতের প্রথম যুগে অনুষ্ঠিত ইজমা‘ এর বিরুদ্ধাচরণ করে থাকবেন এবং সাহাবা ও তাবেঈনদের অনুসৃত রীতির বিরোধিতা করবেন। দেখুন : **শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ;** ১/১৫৪-১৫৬।

[124]. আবুল হাসানাত আব্দুল হাই আল-লক্ষ্ণৌভী আল-হানাফী, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫০।

“সঠিক কথা হচ্ছে- নির্দিষ্ট কোনো মাযহাবের অনুসরণ করা একটি গোঁড়ামি বিশেষ। প্রকৃতপক্ষে এর যথার্থতার কোনো দলীল নেই। এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব বানানো শরী‘আত বৈ আর কিছুই নয়।”[১২৫]

নির্দিষ্ট মাযহাব অনুসরণের সম্ভাব্য স্থান :

কোথাও যদি এমন কোনো স্থান পাওয়া যায় যেখানে একটি মাত্র মাযহাবের প্রচলন থাকে, আর অপর মাযহাবসমূহে কী রয়েছে তা অবগত হওয়ার ব্যাপারে সেখানকার আলেম বা সাধারণ মানুষদের কোনো সুযোগ না থাকে, তা হলে সে স্থানের লোকদের উপর নিজ এলাকায় প্রচলিত মাযহাবের অনুসরণ করাই জরুরী হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু সেখানে যদি অন্য মাযহাবের প্রচলন কমবেশী থাকে, বা অন্য মাযহাব সম্পর্কে জানার সুযোগ থাকে, তা হলে তা জরুরী হবে না। এ-সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী বলেন :

“একজন মানুষ যদি ভারত অথবা ফুরাত নদীর ওপারের (মধ্য এশিয়ার) দেশসমূহে বসবাস করে, সেখানে কোনো শাফিঈ, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবের কোনো অনুসারী না থাকে, এ সব

---

[125]. আবুল হাসানাত আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী আল-হানাফী , প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫০।

মাযহাবের কোনো কিতাবাদিও সেখানে না থাকে, তা হলে সে লোকের উপর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব অনুসরণ করা ওয়াজিব হবে এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাব থেকে তার বের হওয়া হারাম হবে; পক্ষান্তরে সে লোকটি যদি মক্কা ও মদিনার দেশে থাকে তা হলে তার উপর ইমাম আবু হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের তাকলীদ করা ওয়াজিব হবে না। কেননা, সেখানে সকল মাযহাব সম্পর্কে অবহিত হওয়া সহজ।"[১২৬]

শাহ ওয়ালী উল্লাহ (রহ.) যে সময়ে এ কথাগুলো বলেছেন তখন উপর্যুক্ত অঞ্চলের অবস্থা এরকমই ছিল। এখানে যেমন হানাফী মাযহাব ব্যতীত অপর কোনো মাযহাবের প্রচলন ছিল না, তেমনি সেখানে থেকে মাযহাব সম্পর্কে জানারও কোনো সুযোগ ছিল না। তাই তখনকার মানুষের জন্য এককভাবে হানাফী

---

[126].এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

" فإذا كان إنسان جاهل في بلاد الهند و ماوراء النهر و ليس هناك عالم شافعي و لا مالكي و لاحنبلي و لا كتاب من كتب هذه المذاهب وجب عليه أن يقلد بمذهب أبي حنيفة ويحرم عليه أن يخرج من مذهبه...، بخلاف ما إذا كان في الحرمين فإنه يتيسر له هناك معرفة جميع المذاهب."

দেখুন : শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী, আল-ইনসাফ ফী মাসাইলিল খিলাফ; (দিল্লী : মাত্বা' মুজতবাঈ, ১৯৩৫ইং), পৃ. ৭০; মাওলানা আবুল হাসানাত আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৫১।

মাযহাব অনুসরণ করা ছাড়া কোনো উপায়ান্তর ছিল না। তবে আল্লাহর রহমতে বর্তমানে অবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট সুবিধার মাধ্যমে বিশ্ব এখন মানুষের হাতের মুঠোয়। হাদীস ও অন্যান্য মাযহাব সম্পর্কে জানার কোনো সুযোগই এখন আর আমাদের নাগালের বাইরে নয়। ইচ্ছা করলেই যেমন আমরা পবিত্র মক্কা ও মদীনায় যেতে পারি, তেমনি দেশে বসেই ইন্টারনেটের মাধ্যমে হাদীসের গ্রন্থ সমূহ এবং অন্য মাযহাবের কিতাবাদির কোথায় কী আছে তাও দেখে নিতে পারছি। এ-ছাড়া হাদীসের গ্রন্থসমূহ এবং অন্য মাযহাবের কিতাবাদি বর্তমানে আমাদের দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিদ্যমান থাকায় প্রয়োজনে আমরা যখন ইচ্ছা তা দেখে নিতে পারি। এক কথায় মতবিরোধপূর্ণ বিষয়াদিতে কার দলীল অধিক সঠিক ও যুক্তিযুক্ত তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে নেয়া এখন খুবই সহজ। ইচ্ছা করলেই তা করা যায়। তাই আমাদের দেশের আলেমগণের পূর্বের ন্যায় নিজ মাযহাবের যাবতীয় বিষয়াদি অন্ধভাবে মেনে চলার কোনই সুযোগ নেই; কেননা, এমনটি করা চোখ থাকতে অন্ধ হওয়ার শামিল।

সকল বিষয়ে নির্দিষ্ট করে এক মাযহাব পালন করা জরুরী না হওয়ার কারণ:

নির্দিষ্ট কোনো এক মাযহাবের নির্বিচারে অনুসরণ করা ঠিক না হওয়ার কারণ হলো : মানুষ মাত্রেরই ভুল হওয়াই স্বাভাবিক। সে-জন্য ইজতেহাদী বিষয়াদিতে কোনো মাযহাবই এককভাবে সকল ক্ষেত্রে সঠিক মত ও পথের উপর হতে পারে না। তাই মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে সত্য যেখানে বা যে মাযহাবেই থাকুক না কেন সঠিক ও সবল দলীল এবং গ্রহণযোগ্য যুক্তির ভিত্তিতে তা খোঁজ করে নিয়ে এর অনুসরণ করা এবং সাধারণ জনগণকেও তা পালন করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে আলিম সমাজের দায়িত্ব। কেননা, চোখ থাকতে অন্ধ না হয়ে দেখে শুনে ও বুঝে সুঝে কিছু অনুসরণ করার মধ্যেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণের পাশাপাশি নিজ মাযহাবের ইমামেরও অনুসরণ নিহিত রয়েছে। কোনো কিছু অনুসরণ করার পূর্বে তা বুঝে সুঝে অনুসরণ করতে হবে এবং সে অনুযায়ী জনগণকে সেদিকে আহ্বান করতে হবে, এটিই হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক অনুসরণের নির্দেশিত সরল ও সঠিক পন্থা। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

﴿ قُلۡ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ١٠٨ ﴾ [يوسف: ١٠٨]

“বলুন : এ হচ্ছে আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে বুঝে সুঝে দাওয়াত দেই- আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।”[১২৭]

আরবের মুশরিকরা না বুঝে বাপ দাদার অন্ধ অনুসরণ করতো বলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা এ মর্মে ঘোষণা করতে বলেন যে, না বুঝে কিছু অনুসরণ করা আমার ও আমার অনুসারীদের পথ নয়। যারা এমনটি করে তারা মুশরিক। সুতরাং আমি মুশরিকদের অন্তর্গত নই। এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যারা বিভিন্ন অসার যুক্তি তর্ক উপস্থাপন করে অন্ধভাবে কারো মত ও পথের অনুসরণ করতে গিয়ে কুরআন ও বিশুদ্ধ হাদীসের কথার উপরে নিজের ইমাম বা মাযহাবের কথাকে গুরুত্ব দান করেন, তারা নিজেদেরকে আল্লাহর অনুসরণের উপাসনায় নিজ ইমাম বা মাযহাবকে শরীক করার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন।

অন্ধ তাকলীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে দারুল উলূম দেওবন্দের প্রখ্যাত শিক্ষক সাঈদ আহমদ বলেন : যিনি ভুল-ত্রুটির উর্ধে নন এমন কারো অন্ধ তাকলীদ করা শির্কের শামিল । এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন :

---

[127]. আল-কুরআন, সূরা ইউসুফ : ১০৮।

“যিনি ভুল-ত্রুটির উর্ধে নন সাধারণ মানুষের মাঝে তাঁর অন্ধ তাকলীদ করার প্রকৃতি ও স্বরূপ এমন যে, কোনো বিষয়ে মুসলিম উম্মাহের কোনো একজন জ্ঞানী ব্যক্তি ইজতেহাদ করে থাকবেন। তাঁর অনুসারীগণ তাঁর ইজতেহাদের ব্যাপারে এ-ধারণা পোষণ করে বসবেন যে, তাঁর যাবতীয় ইজতেহাদই একশ’ভাগ সঠিক অথবা অধিকাংশই সঠিক। এ ধারণার ভিত্তিতে তারা তাঁর ইজতেহাদী সিদ্ধান্তের দ্বারা কোনো সহীহ হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করবেন। অথচ রহমাতপ্রাপ্ত এ উম্মতে যে তাকলীদের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছিলেন[128], উপর্যুক্ত ধরনের তাকলীদটি সে তাকলীদের অন্তর্গত নয়। কেননা; তারাতো এ বিষয়টি জানার ভিত্তিতে মুজতাহিদগণের তাকলীদ করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে একমত হয়েছিলেন যে, ইজতেহাদকৃত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো ‘নাস’ আছে কী না, তা জানার ব্যাপারে মুজতাহিদগণের অন্তরে অধীর আগ্রহ থাকার পাশাপাশি সে বিষয়ে ইজতেহাদ করতে গিয়ে তাঁরা ভুল ও শুদ্ধ উভয়ই করে থাকবেন এবং এ সংকল্পের ভিত্তিতে তাঁদের তাকলীদ করা হবে যে, যখন কোনো বিষয়ে তাকলীদ করার পর এর বিপরীতে

---

[128] সম্ভবত লেখক এখানে যার বক্তব্য বর্ণনা করছেন তার মত তুলে ধরেছেন, নতুবা তাকলীদের ব্যাপারে ঐকমত্য হওয়ার বিষয়টি প্রসিদ্ধ কথা নয়। [সম্পাদক]

কোনো সহীহ হাদীস প্রমাণিত হবে, তখন তাকলীদকে বর্জন করা হবে এবং হাদীসের অনুসরণ করা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم ...الآية} এর ব্যাখ্যায় বলেছেন : ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানী ও ধর্মযাজকদের উপাসনা করতো না, কিন্তু তারা যখন তাদের জন্য কিছু হালাল বলতো তারা তা হালাল মনে করতো, আর যখন কিছু হারাম বলতো তখন তারা তা হারাম মনে করতো ।"[১২৯]

ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বা তাঁর নামে প্রচলিত মাযহাবের অন্ধ তাকলীদের মাঝে যে আমাদের পরকালীন মুক্তি নয় তা স্বয়ং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর একটি স্বপ্নের দ্বারাও আমরা

---

[129]. মূল আরবী হচ্ছে,

أن يجتهد واحد من علماء الأمة في مسئلة فيظن متبعوه أنه على الإصابة قطعا أو غالبا، فيردوا به حديثا صحيحا. و هذا التقليد غير ما اتفق عليه الأمة المرحومة؛ فإنهم اتفقوا على جواز التقليد للمجتهدين، مع العلم بأن المجتهد يخطئ و يصيب، مع الاستشراف لنص النبي صلى الله عليه وسلم في المسئلة، والعزم على أنه إذا ظهر حديث صحيح خلاف ما قلد فيه ، ترك التقليد و اتبع الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) أنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم إذا أحلوا لهم شيئا استتحلوه و إذا حرموا عليهم شيئا حرموه.

দেখুন: সাঈদ আহমদ বালনপুরী, **আল-আউনুল কবীর ফিল ফাওযিল কবীর;** (দেওবন্দ : মাকতাবাতু হেজায, সংস্করণ বিহিন, সন বিহীন), পৃ. ৮৩।

অবগত হতে পারি। কথিত আছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহ.) একদা আল্লাহ তা‘আলাকে স্বপ্নে দেখেন। তাতে আল্লাহ তাঁকে বলেন: “আমি তোমাকে এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা তোমার মাযহাবের অনুসরণ করে তাদেরকেও ক্ষমা করলাম”। ইমাম ইবনে আবিদীন আল-হানাফী (ولمن اتبعك) এ কথার ব্যাখ্যায় বলেন : এর অর্থ হচ্ছে- দ্বীনের খেদমত ও তা জানার ক্ষেত্রে অথবা তোমার ইজতেহাদ দ্বারা তুমি যে সব আদেশ ও নিষেধ অবগত হয়ে থাকবে, সে সব ক্ষেত্রে যারা তোমার অনুসরণ করবে, এখেকে বিচ্যুত হবে না, **তোমার অনুসরণ স্রেফ (অন্ধ) তাকলীদের মাধ্যমে করবে না,** (বরং যারা বুঝে শুনে তোমার তাকলীদ করবে) আমি তাদেরকেও ক্ষমা করলাম।[১৩০]

---

[130] ঘটনাটির মূল ভাষ্য হচ্ছে,

و نقل قصة رأى أبو حنيفة في المنام ، وفيه قال الله له: قد غفرنا لك و لمن اتبعك من كان على مذهبك إلى يوم القيامة. قوله : ولمن اتبعك أى في الخدمة و المعرفة أو فيما أدى إليه اجتهادك من الأوامر و النواهي و لم يزغ عنها ، لا بمجرد التقليد

দেখুন : ইবন ‘আবিদীন, **রাদ্দুল মুহতার**; (পাকিস্তান : এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ১/৫২।

(তবে এ ধরণের কিসসা-কাহিনী ও স্বপ্ন দ্বারা দলীল পেশ করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা‘আতের আলেমদের সঠিক পদ্ধতি নয়। [সম্পাদক])

বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতে কারো মত ও পথের অনুসরণ ও তাকলীদের চর্চা অনেক আলেমগণের দ্বারা স্বীকৃতি না পাওয়ার ফলে, অনুসরণ ও আনুগত্য সম্পর্কে আমাদের প্রতি আল্লাহর যে নির্দেশ রয়েছে, তা তাদের দ্বারা অগ্রাহ্য হওয়ার পাশাপাশি, অনুসরণ সম্পর্কে তাদের প্রতি নিজ ইমামেরও যে নির্দেশ রয়েছে, তাও তারা অসতর্কতা হেতু অমান্য করে চলেছেন; কেননা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) নিজেই তাঁর অনুসারীদের লক্ষ্য করে বলেছেন:

إذا صح الحديث فهو مذهبي

“হাদীস যখন সহীহ পাওয়া যাবে তখন সেটাই আমার মাযহাব হিসেবে গণ্য হবে।”[১৩১] অনুসরণ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর এত সুস্পষ্ট বক্তব্য থাকা সত্ত্বেও আমাদের অনেক আলেমগণ তা পালন করেন না। তবে আশার কথা হলো : অতীতের কিছু সংখ্যক জ্ঞানীদের ন্যায় অধুনা দেশের প্রখ্যাত কিছু আলেমগণকে সাধারণ আলেমদের চেয়ে কিছু ব্যতিক্রম করতে দেখা যাচ্ছে। তাঁরা বেসরকারী কোনো কোনো প্রচার মাধ্যমের প্রশ্নোত্তর অনুষ্ঠানে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে নিজ মাযহাবে প্রচলিত কোনো কোনো আমল পরিত্যাগ করে এর বিপরীতে

131. ক্বাযী সানাউল্লাহ পানিপথী, প্রাগুক্ত; ২/৬৫।

সহীহ অথবা অধিক সহীহ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত কিছু আমল করার প্রতি দেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করছেন। فلله الحمد و المنة

বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে অন্ধভাবে মাযহাব পালনের বাস্তব উদাহরণ:

কোন বিষয়ে পরস্পর বিরোধী বিশুদ্ধ হাদীস থাকলে এ জাতীয় হাদীসের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী, সে ব্যাপারে হাদীসবিদগণ বলেন :

1) যদি উক্ত ধরনের উভয় হাদীসের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করা যায়, তা হলে তা করে উভয় হাদীসের উপর 'আমল করতে হবে।

2) আর যদি উভয়ের মাঝে কোনো সামঞ্জস্য বিধান করা না যায়, তা হলে দেখতে হবে যে, এর মধ্যকার কোনো একটি অপরটির জন্য নাসিখ তথা রহিতকারী কি না। তা জানা গেলে রহিতকারী হাদীসকে অগ্রাধিকার দিয়ে সেটির উপর 'আমল করতে হবে এবং মানসূখ তথা রহিতকৃত হাদীসকে বাদ দিতে হবে।

3) তা জানা সম্ভব না হলে একটিকে অপরটির উপর অগ্রাধিকার দানের নিয়মানুযায়ী একটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৪) তাও যদি সম্ভব না হয়, তা হলে কোনো একটিকে অগ্রাধিকার দেয়ার মত কোনো কারণ না পাওয়া পর্যন্ত উভয় হাদীসের উপর 'আমল করা থেকে বিরত থাকতে হবে।[১৩২]

কোন বিষয়ে যদি পরস্পর বিপরীতমুখী বিশুদ্ধ হাদীস থাকে অথবা একটি হাদীস থেকে দু'রকমের অর্থ গ্রহণের সম্ভাব্যতা থাকে, আর সে কারণে যদি তা নিয়ে ইমামগণের ইজতেহাদের মাঝেও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এবং পরবর্তী আলেমগণও যদি কোনোভাবেই সে ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়ে দু'রকম 'আমল করেন, আর তাঁদের অনুসরণে আমরাও সে রকম করি, তা হলে আশা করি এতে তাঁরা এবং আমরা সবাই আল্লাহর কাছে উপযুক্ত উজরখাহী করতে পারবো। কিন্তু যে বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে অপর কোনো বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায় না এবং এর বাহ্যিক অর্থেরও ভিন্ন কোনো ব্যাখ্যা করা যায় না, এমন হাদীসের উপর 'আমল করার ক্ষেত্রে কারো ভিন্ন মত পোষণ করার কোনই এখতিয়ার থাকে না। অনুরূপভাবে একটি কর্ম যদি সাহাবীদের যুগ থেকে দু'ভাবে করা জায়েয হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়, তা হলে এর একটিকে গ্রহণ করে অপরটিকে না জায়েয বা মকরূহ

---

[132]. ড. মাহমূদ ত্বহ্হান, তাইছীরু মুসত্বলাহিল হাদীস; (করাচী : ক্বদীমী কুতুবখানা, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), পৃ. ৫৭।

বলারও কারো কোনো অধিকার নেই। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, মাযহাবের অন্ধ অনুসরণের কারণে আমাদের সমাজে এমনও কিছু ‘আমলের প্রচলন রয়েছে যার মধ্যে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ‘আমলের বিরোধিতা রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। পাঠক সমাজের বুঝার সুবিধার্থে নিম্নে এর তিনটি উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

এক. এক মিছলের পর দ্বিতীয় মিছলের শুরু থেকেই আসর নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় :

ইবনে ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা বর্ণিত হয়েছে যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে নামাযের সময় শিক্ষাদান উপলক্ষে দু’দিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইমামত করেছিলেন। প্রথম দিনে আসরের নামায প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক মিছিল[133] পূর্ণ হওয়ার সময় অথবা পূর্ণ হওয়ার পর অর্থাৎ দ্বিতীয় মিছিলের প্রারম্ভে আদায় করেছিলেন এবং দ্বিতীয় দিনে তা প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দুই মিছিল হওয়ার পর অর্থাৎ তৃতীয় মিছিলের প্রারম্ভে আদায় করেছিলেন। এর পর তিনি বলেছিলেন : নামাযের ওয়াক্ত

---

[133] মিছল বলতে বুঝায়, অনুরুপ হওয়াকে। অর্থাৎ যে কোনো বস্তুর ছায়া তার অনুরূপ দৈর্ঘ্যে লম্বা হয়ে মাটিতে পড়া। [সম্পাদক]

এ দুই ওয়াক্তের মধ্যে।[১৩৪] এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আসরের নামাযের ওয়াক্ত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দুই মিছল হওয়ার পর তৃতীয় মিছলের প্রারম্ভে আরম্ভ না হয়ে দ্বিতীয় মিছিলের প্রারম্ভ থেকেই হয়ে যায়। অথচ আমাদের মাযহাবে বিষয়টি এর সম্পূর্ণ বিপরীত রয়েছে। দ্বিতীয় মিছলের প্রারম্ভ থেকে আসরের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা মাযহাবের কথানুযায়ী তা স্বীকার করি না।

ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর মুওয়াত্ত্বা গ্রন্থে আসরের নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পেশ করেছেন। তাতে রয়েছে: ‘আব্দুল্লাহ ইবনে রাফে‘ আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নামাযের ওয়াক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। এতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : যখন তোমার নিজের ছায়া এক মিছল হয় তখন তুমি যোহরের নামায পড় এবং যখন তোমার ছায়া দু’ মিছল হয় তখন আসরের

---

134. ইমাম তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুস সালাত ‘আন রাসূলিল্লাহ, বাব নং ১১৩, হাদীস নং ১৪৯, ১/২৭৯; ইবনে হিববাস, প্রগুক্ত; কিতাবুস সালাত, বাব নং ২, হাদীস নং ১৪৭২, ৪/৩৩৫।

নামায পড় ...।”[১৩৫] এরপর ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) বলেন : এটিই হচ্ছে ‘আসরের নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মত।

‘আসরের নামাযের ওয়াক্তের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর উপর্যুক্ত মত হলেও তাঁর এ মতের সাথে তাঁর কোনো শিষ্যই ঐকমত্য পোষণ করেন নি। সে জন্য ইমাম মুহাম্মদ ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মত বর্ণনা করার পর বলেন :

“আমরা বলি : যখন ছায়া এক মিছলের চেয়ে একটু বেশী হয় তখন পশ্চিম দিকে সূর্য ঢলা থেকে যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক মিছলের চেয়ে একটু বেশী হয়, তখনই ‘আসরের ওয়াক্ত এসে যায়”।[১৩৬]

ইমাম মুহাম্মদের উক্ত কথার উপর টীকা লিখতে গিয়ে মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী বলেন :

“আসরের ওয়াক্ত আগমন সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ যা বলেছেন সে-কথাটি ইমাম আবু ইউসুফ, হাসান, যুফার, ইমাম শাফিঈ,

---

[135]. আশ-শায়বানী, ইমাম মুহাম্মদ ইবনে হাসান, মুওয়াত্ত্বা; (দেওবন্দ : আশরাফী বুক ডিপো, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন) পৃ. ৪২।

[136]. তদেব; পৃ. ৪৪।

আহমদ, ত্বহাবী ও অন্যান্যরাও বলেছেন। এমনকি সাধারণ কিতাবাদির বর্ণনানুযায়ী এটি ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর দ্বিতীয় মত হিসেবে তাঁর শিষ্য হাসান কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। আল-মাবসূত্ব গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী ইমাম মুহাম্মদও ইমাম আবু হানীফা (রহ.) থেকে এ মতটি বর্ণনা করেছেন। এ-কথাগুলো মুহাম্মদ ইবন আমীর আল-হাজ্জ আল-হালাবী কর্তৃক রচিত 'মুনইয়াতুল মুসল্লী' নামক গ্রন্থের ব্যাখ্যা 'হিলয়াতুল মুহাল্লা' নামক গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে। হানাফী মাযহাবের বিভিন্ন ফিকহের কিতাবসমূহেও এ মতের অগ্রগণ্যতার স্বীকৃতি পাওয়া যায়। যেমন 'গারারাতুল আযকার' নামক গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে :

"هو المأخوذ به"

'আসরের ওয়াক্তের ব্যাপারে ইমাম মুহাম্মদ ও অন্যান্যরা যা বলেছেন সেটাই গৃহীত হয়েছে। 'আল-বুরহান' নামক গন্থে রয়েছে:

"هو الأظهر لبيان جبريل"

জিবরাঈল (আ.) এর বর্ণনার কারণে এটাই সবচেয়ে বেশী সুস্পষ্ট কথা। কীরকি কর্তৃক লিখিত 'ফয়েয' নামক গ্রন্থে রয়েছে :

" وعليه عمل الناس اليوم وبه يفتى كذا في الدر المختار".

“এ মতের উপরেই বর্তমান সময়ের লোকজনের ‘আমল রয়েছে, এ মতের দ্বারাই ফতোয়া প্রদান করা হয়ে থেকে। অনুরূপ কথা ‘দুররে মুখতার’ গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে”।[১৩৭]এ-সব উদ্ধৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, অতীতে হানাফী মাযহাবের গণ্যমান্য মনীষীগণ আছরের নামায দুই মিছলের পরে আদায় না করে এক মিছলের পরেই আদায় করতেন।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর উপর্যুক্ত হাদীস নিয়ে একটু চিন্তা করলে দেখা যায় যে, তিনি তাঁর এ বক্তব্যের দ্বারা মূলত যোহর বা ‘আসরের নামাযের প্রারম্ভিক সময়ের কথা বলতে চান নি, বরং এর দ্বারা তিনি নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্তের শেষ সময়সীমার বর্ণনা দিতে চেয়েছিলেন। সে-জন্যে ইমাম ত্বাহবী হানাফী বলেন:

“আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম তাঁর ইমামতে দ্বিতীয় দিনে নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্তের সর্বশেষ সীমা পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য যে যে সময়ে নামায আদায় করেছিলেন, তা বর্ণনা করা। কেননা, বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে যে, জিব্রাঈল (আ.) দু’দিন

---

[137].আবুল হাসানাত আব্দুল হাই, **আত-তা‘লীকুল মুমাজ্জদ আলা মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মদ;**পৃ.৪৪। টীকা নং (১); শরহুল বেক্কায়াঃ; পৃ.৩০।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নামাযের ইমামত করেছিলেন ...তখন তিনি প্রথম দিনে সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলার পর যোহরের নামায পড়েছিলেন এবং প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক মিছিল হওয়ার পর 'আসরের নামায আদায় করেছিলেন ...অতঃপর দ্বিতীয় দিনে তিনি তাঁর সাথে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া এক মিছল পূর্ণ হওয়ার সময়ে যোহরের নামায আদায় করেছিলেন এবং প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দু' মিছল হওয়ার সময় 'আসরের নামায আদায় করেছিলেন। ...আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর উক্ত কথার দ্বারা এদিকেই ইঙ্গিত করেছেন।"[১৩৮]

আব্দুল হাই লক্ষৌভী তাঁর টীকাতে ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মতের সহায়ক দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। যার একটি সুনানে আবী দাউদ ও ইবনে মা-জাঃতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে 'আলী ইবনে শায়বান রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন : আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট মদীনায় আগমন করলাম এবং তাঁকে 'আসরের নামায উজ্জ্বল ও পরিষ্কার থাকা পর্যন্ত বিলম্ব করতে দেখলাম"। অপরটি মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বাঃতে বর্ণিত হয়েছে। তাতে রয়েছে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে

---

[138]. তদেব;পৃ.৪২। ৭ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

দু'মিছিল হওয়ার পর নামায আদায় করেন''। এর পর বলেন: ইমাম 'আইনী তাঁর 'উমদাতুল ক্বারী' গ্রন্থে এ' দুটি হাদীস প্রসঙ্গে বলেছেন: এ দু'টি হাদীস দু' মিছলের সময় নামায আদায় করা জায়েয হওয়ার কথা প্রমাণ করে, এ-সময়ের পূর্বে 'আসরের ওয়াক্ত হয় না-এ-কথাটি প্রমাণ করে না''।[১৩৯]

এরপর লক্ষ্ণৌভী বলেন: ''এ-ক্ষেত্রে ইনসাফের কথা হচ্ছে: এক মিছলের হাদীসসমূহ সুস্পষ্ট ও সহীহ এবং দু' মিছলের হাদীসসমূহ দু' মিছল না হলে 'আসরের ওয়াক্ত হয় না এ-কথা বর্ণনার ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট নয়। যারাই দুই মিছলের কথা গ্রহণ করেছেন তাদের অধিকাংশই তাদের বক্তব্য তুলে ধরার ক্ষেত্রে কিছু হাদীস বর্ণনা করে তাথেকে দু' মিছলের বিষয়টি ইজতেহাদ করে বের করেছেন, অথচ ইজতেহাদ করে বের করা বিষয় সুস্পষ্ট বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে না। 'বাহরুর রা-ইক্ব' এর লেখক এ-বিষয়ে পৃথক একটি গ্রন্থে অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, তবে এর দ্বারা তিনি তার দাবী প্রমাণিত হতে পারে এমন কিছু উপস্থাপন করতে পারেন নি''।[১৪০]

---

[139]. তদেব; টীকা নং ২।

[140]. তদেব; পৃ.৪৪।

দু’ মিছলের প্রারম্ভ থেকেই ‘আছরের নামাযের ওয়াক্ত এসে যাওয়ার কথা জিব্রাঈল আলাইহিস সালামের নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত শিক্ষাদান সংক্রান্ত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও এবং ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর দ্বিতীয় মত ও হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট মনীষীদের মতামতের দ্বারা তা স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও আমরা ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর প্রথম মতকেই ধরে রয়েছি। আর দু’ মিছল শেষে তৃতীয় মিছল শুরু হওয়ার পূর্বে ‘আছরের নামাযের ওয়াক্ত হয় না- এ-কথা বলার কারণে আমরা সাধারণ ও আলেম নির্বিশেষে নিম্নে বর্ণিত অভিযোগে অভিযুক্ত হচ্ছি:

1) এতে আমরা বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট হাদীস দ্বারা প্রমাণিত বিষয়ের বিরোধিতা করছি।

2) নিজ মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা ও মূল প্রচারকদের মতের অনুসরণ না করে মাযহাবের দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু আলেমদের অনুসরণ করছি।

3) জিব্রাঈল কর্তৃক বর্ণিত “নামাযের ওয়াক্ত এ’ দুই ওয়াক্তের মাঝখানে” এ-কথার অনুসরণে রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ও তাঁর সাহাবীগণ অধিকাংশ সময়ে দ্বিতীয় মিছলের মাঝামাঝি সময়ে

‘আসরের নামায পড়ার কারণে আমরা তাঁদেরকে ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে নামায আদায় করেছেন বলে অভিযুক্ত করছি।

4) বিশুদ্ধ হাদীসে আউয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করার অনেক গুরুত্ব ও ফযীলত থাকার কথা বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও আমরা ‘আসরের নামায সর্বদা মুস্তাহাব ওয়াক্তের সর্বশেষ সময়ে আদায় করছি, যা আউয়াল ওয়াক্তে নামায আদায় করার ফজীলত সংক্রান্ত সহীহ হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত।

5) ‘আসরের ওয়াক্ত আগমনের ব্যাপারে নিজ মাযহাবের ফতোয়ারও বিরোধিতা করছি।

দুই, নামাযের কাতারে পরস্পর কাঁধ ও পা মিলিয়ে দাঁড়ানো:

1) সহীহ বুখারী শরীফে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। তিনি রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

“তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করো, কেননা, আমি তোমাদেরকে আমার পিঠের পিছন থেকে (বাঁকা অবস্থায়) দেখতে পাই। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন: (রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে) আমাদের

একজন তাঁর কাঁধ ও পা তাঁর পার্শ্বের জনের কাঁধ ও পায়ের সাথে মিলিয়ে রাখতো"।[১৪১]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- তাঁর সাহাবীগণকে নামাযে কাতার সোজা করার ব্যাপারে নির্দেশ করেছিলেন। তিনি তাঁর সাহাবীগণকে এ-জন্য পরস্পরের সাথে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়াতে না বললেও তাঁরা কাতার সোজা করার জন্য এমনটি করেছিলেন। তবে ইবনে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর এ সংক্রান্ত অপর একটি নির্দেশ পালন করতে গিয়েই এমনটি করেছিলেন। রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেছেন:

"কাতার সোজা করো, কাঁধের সাথে কাঁধ বরাবর করো, ফাঁক বন্দ করো, শয়তানের জন্য কোনো ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি কাতারের সংযোগ স্থাপন করে আল্লাহও তার সাথে সংযোগ স্থাপন করেন, আর যে কাতার ছিন্ন করে, আল্লাহও তার সাথে সংযোগ

---

[141].বুখারী, প্রাগুক্ত;কিতাবুল আ-যান, বাব নং ৪৭, হাদীস নং ৬৯২, ১/২৫৪;ইবনে হাজার, ফতহুল বারী; কিতাবুল আ-যান, বাব নং ৭৬, হাদীস নং ৭২৫, ২/২১১।

ছিন্ন করেন"।[১৪২] এ হাদীসটি ইমাম ইবনে খুযায়মাঃ ও ইমাম হাকিম সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।[১৪৩]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কাতার সোজা করে দাঁড়ানোর নির্দেশ করার পাশাপাশি দু'জনের পায়ের মধ্যখানে কোনো ফাঁক না রাখার ব্যাপারেও তাঁর সাহাবীদের প্রতি নির্দেশ করেছিলেন। আর সে-জন্যেই তাঁরা পরস্পরের সাথে কাঁধে কাঁধ বরাবর করার পাশাপাশি পায়ের সাথে পা-ও মিলিয়ে দাঁড়াতেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, নামাযের কাতারে পরস্পরের সাথে কাঁধ ও পা যথাসম্ভব লাগিয়ে দাঁড়ানো সুন্নাত। এ বিষয়টি অন্যান্য মাযহাব দ্বারা সমর্থিত হলেও হানাফী মাযহাবে শুধু পরস্পর মিলিয়ে ও কাঁধের সাথে কাঁধ বরাবর করে দাঁড়ানোর বিষয়টি সমর্থিত হয়েছে। পায়ের সাথে পা মিলানোর বিষয়টি সমর্থিত হয় নি। যেমন, হানাফী

---

[142].হাদীসটি নিম্নরূপ: عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب و سدوا الخلل و لا تذروا فرجات للشيطان ، و من وصل وصله الله ، ومن قطع قطعه الله". দেখুন:আবু দাউদ, প্রাগুক্ত;কিতাবুস সালাত, বাব নং ৯৫, হাদীস নং ৬৬৬, ১/১৭৮।

[143]. দেখুন: ইবনে হাজার 'আসক্বলানী, ফতহুল বারী; প্রাগুক্ত; ২/২১১।

মাযহাবের ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘বাদাই‘উস সানয়ে‘উ-তে এ-প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

“আর যখন কাতারে দাঁড়াবে তখন পরস্পর মিলে দাঁড়াবে এবং কাঁধের সাথে কাঁধ বরাবর করবে; কেননা; রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেছেন: তোমরা পরস্পর মিলে দাঁড়াও এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলাও”।[১৪৪]

এ হাদীসে পায়ের সাথে পা মিলাও, এ-কথাটি না থাকায় আমাদের মাযহাবে পায়ের সাথে পা মিলানোর বিষয়টি কোনো গুরুত্ব পায় নি। যদিও তা উপর্যুক্ত আনাস ও ইবনে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, মাযহাবে যেটুকু করার নির্দেশ রয়েছে আমাদের সমাজে সেটুকু করারও প্রচলন নেই। নামাযে দাঁড়ালে প্রতি দু’জন নামাযীর মাঝখানে বিস্তর ফাঁক পরিলক্ষিত

---

[144]. যেমন কিতাবে এসেছে,

وإذا قاموا في الصفوف تراصوا وسووا بين مناكبهم، لقوله صلى الله عليه وسلم : تراصوا و ألصقوا المناكب بالمناكب.

দেখুন: আল-কা-সানী, ‘আলাউদ্দীন আবু বকর ইবন মাস‘উদ, বাদাই‘উস সানায়ে‘; (করাচী: এস.এম.সাঈদ কম্পানী, ১ম সংস্করণ, ১৯১০ ইং), ১/১৫৯।

হয়। কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো তো দূরের কথা একটু কাছে আসতে বললেও তারা আসতে চান না। উল্লেখ্য যে, ‘সাহাবীগণ পায়ের সাথে পা লাগাতেন’ এ-কথাটিকে আমাদের মাযহাবের কোনো কোনো বিদ্বান ‘পায়ের গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলাতেন’ মর্মে ব্যাখ্যা করেছেন। সে-কারণেই আমরা পায়ের সাথে পা মিলাতে চাই না। যদিও ইমাম ইবনে হাজার ‘আসক্বলানী এর বর্ণনানুযায়ী এ-ব্যাখ্যাটি একটি অনুল্লেখযোগ্য মত, যা মাযহাবের মুহাক্বিক বিদ্বানদের দ্বারা সমর্থিত নয়।[১৪৫]

উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের বিভিন্ন শব্দ ও বাক্যের প্রতি লক্ষ্য করলে পায়ের সাথে পা মিলানোর কথাই সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। কেননা, রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- দু’জনের মধ্যে শয়তানের দাঁড়ানোর স্থান রাখতে নিষেধ করেছেন। কাঁদের সাথে কাঁধ বরাবর করে দাঁড়ালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উক্ত নির্দেশটি আংশিকভাবে পালিত হলেও পায়ের সাথে পা লাগিয়ে দাঁড়ালে তা পূর্ণভাবে পালিত হয়। এ ছাড়া সহীহ বুখারীতে নু‘মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন:

---

[145]. ইবনে হাজার ‘আসক্বলানী, ফতহুলবারী;২/২১১।

“আমি আমাদের একজনকে তাঁর পাশের জনের পায়ের গ্রন্থির সাথে তাঁর পায়ের গ্রন্থি মিলাতে দেখেছি”[১৪৬]।

বস্তুত পায়ের সাথে পা মিলানো কথাটি হাদীসে সুস্পষ্টভাবে থাকা সত্ত্বেও গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলানোর দ্বারা এর ব্যাখ্যা করা আদৌ সমীচীন নয়। কেননা, ‘কা‘ব’ (كعب) শব্দটির আভিধানিক অর্থ: টাখনু বা গ্রন্থি। তা পায়ের গোড়ালির অর্থ প্রকাশ করার কথা কোনো অভিধানে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া এর দ্বারা যদি গোড়ালির অর্থই উদ্দেশ্য হয়ে থাকতো, তা হলে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু ও নু‘মান ইবনে বশীর এর হাদীসে বর্ণিত ‘ক্বাদাম’ ও ‘কা‘ব’ শব্দের পূর্বের ক্রিয়াপদটি (يُلْزِقُ) না হয়ে (يُسَوِّيْ) ব্যবহৃত হতো। অর্থাৎ কথাটি এভাবে হতো: ‘আমাদের একজন তাঁর পায়ের গোড়ালী অপরজনের গোড়ালির বরাবর করতো’। কিন্তু কথাটি এভাবে না হয়ে হয়েছে: ‘আমাদের একজন তাঁর পা অপরজনের পায়ের সাথে লাগাতেন’। এতে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবীগণ আসলে পায়ের সাথেই পা মিলাতেন। কেননা, এতে দু’জনের মাঝে ফাঁক না রাখা সংক্রান্ত রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নির্দেশ পূর্ণভাবে পালিত হয়; যা গোড়ালির সাথে গোড়ালি বরাবর করলে সঠিকভাবে পালিত হয়

---

[146]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল আযান, বাব নং ৪৭;১/২৫৪।

না। তবে আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, এ ব্যাখ্যাটি হাদীস বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও এবং মাযহাবের সকলের দ্বারা সমর্থিত না হয়ে কারো কারো দ্বারা সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও এটাই আমাদের নিকট অনুসরণীয় হয়ে রয়েছে। যা আদৌ উচিত নয়।

তিন, জানাযার নামাযে সূরায়ে ফাতিহাঃ পাঠ:

সহীহ বুখারীতে ত্বলহা ইবন 'আব্দিল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে- তিনি বলেন: ''আমি ইবনে 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর পিছনে একটি জানাযার নামায আদায় করলাম, তিনি তখন তাতে সূরায়ে ফাতিহাঃ পাঠ করলেন। তিনি বললেন: এটি পাঠ করা সুন্নাত''।[১৪৭] সুনানে নাসাঈ এর বর্ণনায় রয়েছে: ''তিনি তখন তাতে সূরা ফাতিহাঃ এবং অপর একটি সূরা সশব্দে পাঠ করলেন, এমনকি আমরা তা শুনতে পেলাম। জানাযা শেষ হলে পরে আমি তাঁর হাত ধরে তাঁকে তা সশব্দে পাঠ করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন: তোমরা যাতে

---

147. হাদীসটি নিম্নরূপ: " عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال :صَلَّيْتُ خَلْفَ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَلَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .قَالَ لِتَعْلَمُوْا أَنَهَّا سُنَّةٌ. দেখুন: বুখারী, প্রাগুক্ত;কিতাবুল জানাইয, বাব: নং ৬৪, হাদীস নং ১২৭০, ১/৪৪৮; ইবনে হাজার আসক্কালানী, ফতুহুতল বারী; বাব নং ৬৫, হাদীস নং ১৩৩৫; ৩/২০৩।

অবগত হতে পারো যে, এটা পাঠ করা সুন্নাত ও হক, সে-জন্যেই আমি তা সশব্দে পাঠ করলাম''।[১৪৮]

উপর্যুক্ত এ-হাদীস দু'টি দ্বারা জানাযার নামাযে সূরায়ে ফাতিহাঃ পাঠ করার কথা প্রমাণিত হয়। ইমাম ইবনে হাজার 'আসক্বলানী বলেন:

''জানাযার নামাযে সূরায়ে ফাতিহাঃ পাঠ করার বিষয়টি বিরোধপূর্ণ। ইমাম ইবনুল মুনযির রহ. ইবনে মাস'উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু, হাসান ইবনে 'আলী ও আব্দুল্লাহ ইবনে যুবায়র রাদিয়াল্লাহু আনহুম থেকে তা পাঠ করার বিধানের কথা বর্ণনা করেছেন। আর এটাই ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাক্বের মত। তবে আবু হুরায়রা ও ইবনে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর 'আমল থেকে জানাযার নামাযে কোনো কিরাত না থাকার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এটি ইমাম মালিক ও কূফাবাসীদের মত।[১৪৯]

---

[148]. সুনানে নাসাঈর বর্ণনাটি নিম্নরূপ: فِقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ سُوْرَةً، وَجَهَرَ حَتَّى أَسْمَعنَا، فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ ، فَسَأَلْتُهُ ؟ قَالَ: إِنَّمَا جَهَرْتُ لِتَعْلَمُوْا أَنَّهَا سُنَّةٌ وَ حَقٌّ." - **দেখুন:**ইমাম নাসাঈ, প্রাগুক্ত;কিতাবুল জানাইয, বাব: আদ-দু'আ, হাদীস নং১৯৮৭, ৪/৭৬; ইবনে হিববান, প্রাগুক্ত;৭/৩৪০।

[149]. ইবনে হাজার, ফাতহুল বারী; ৩/২০৩।

ইমাম নাসাঈ কর্তৃক উপরে বর্ণিত হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করার পর বলেন:

“এ হাদীসটি হাসান-সহীহ। রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কতিপয় সাহাবী এবং অন্যান্য কিছু বিদ্বানগণের এ হাদীসের উপর ‘আমল রয়েছে, তাঁরা প্রথম তকবীরের পর সূরায়ে ফাতিহাঃ পাঠ করাকে পছন্দ করেন। এটাই ইমাম শাফিঈ, আহমদ ও ইসহাকের মত। আবার কোনো কোনো বিদ্বান বলেছেন: জানাযার নামাযে কুরআন পাঠ করা হবে না। কেননা, জানাযার মূল উদ্দেশ্য আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা করা, তাঁর রাসূলের প্রতি দরূদ পাঠ করা এবং মৃত ব্যক্তির জন্য দো‘আ করা বৈ আর কিছুই নয়। এটিই ইমাম ছাওরী ও অন্যান্য কূফাবাসীদের মত”।[১৫০]

আমাদের দেশে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহাঃ পাঠ করার প্রচলন নেই। কারণ, আমাদের মাযহাবে এটি পাঠ করার অনুমোদন নেই। যেমন ইমাম মুহাম্মদ (রহ.) তাঁর মুওয়াত্ত্বা গ্রন্থে লিখেছেন:

---

[150]. তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানাইয, বাব নং ৩৯, হাদীস নং ১০২৭; ৩/৩৪৬।

" لا قراءة على الجنازة ، و هو قول أبي حنيفة"

“জানাযার নামাযে কোনো কিরাত নেই, এটিই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মত”।[১৫১] দলীল হিসেবে তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ‘আমল সম্বলিত একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রয়েছে তিনি বলেন: যখন জানাযা রাখা হয় তখন আমি তকবীর পাঠ করি, অতঃপর আল্লাহর প্রশংসা করি এবং তাঁর রাসূলের উপর দরূদ পাঠ করি। এরপর মৃতের জন্য দো‘আ করি...”।[১৫২]

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহাঃ পাঠ করার বিধান হানাফী মাযহাব ও অপর কোনো কোনো ইমামদের মতে না থাকলেও নিম্নে বর্ণিত কারণে আমাদের পক্ষে তা পাঠ করা উচিত:

1. জানাযার নামাযে তা পাঠ করা সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি উপর্যুক্ত বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। না পাঠ করার বিষয়টি কোনো কোনো সাহাবীদের ‘আমল দ্বারা প্রমাণিত হলেও

---

[151].আশ-শয়বানী, ইমাম মুহাম্মদ ইবন হাসান, প্রাগুক্ত;পৃ.১৬৯; সারখাসী, আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আহমদ, আল-মাবসূত; (করাচী: এদারাতুল কুরআন ওয়াল ‘উলূমিল ইসলামিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮৭ইং), ২ / ৬৪।

[152]. ইমাম মুহাম্মদ, প্রাগুক্ত; পৃ.১৬৮।

যেহেতু তা পাঠ করাও সাহাবীদের ‘আমল দ্বারা সুন্নাত বলে প্রমাণিত, সেহেতু মৃতের কল্যাণের দিক বিবেচনা করে তা পাঠ করাই উত্তম।

2. কোন সাহাবী যদি কোনো বিষয়ে এ-কথা বলেন: “এমনটি করা সুন্নাত”, তা হলে হানাফী মাযহাবের অগ্রবর্তী ফিকহের উসূলবিদ[১৫৩] ও শাফিঈ মাযহাবের উসূলবিদদের[১৫৪] মতে এ-কথাটি মুসনাদ মুরফূ‘ হাদীস হিসেবে গণ্য হবে। এ নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকেও তা পাঠ করা সুন্নাত বলে প্রমাণিত হয়। যদিও হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ফকীহগণ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এ হাদীসকে উক্ত নিয়মের আওতাধীন মনে করেন না। তাঁরা এটাকে বেদ‘আতের বিপরীত যে সুন্নাত রয়েছে, সে রকম সুন্নাত বলে মনে করেন। অর্থাৎ

---

[153].হানাফী ফিকাহবিদদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি ইমাম ইবনুল হুমাম তাঁর ‘আত-তাহরীর’ গ্রন্থে এবং এর ভাষ্যকার ইবনে আমীর আল-হাজও এ-জাতীয় কথাকে মুসনাদ মরফূ‘ হাদীস হিসাবে গ্রহণ করার বিষয়টিকে সঠিক মাযহাব বলে স্বীকার করেছেন। দেখুন:ইবনে আমীর আল-হাজ্জ, শরহুত তাহরীর; ২/২২৪।

[154].দেখুন: ইমাম নববী, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ, আল-মাজমূ‘ শরহুল মুহায্যাব; (স্থান বিহীন: দারুল ফিকর, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ৫/২৩২।

তাঁদের মতে জানাযার নামায সূরায়ে ফাতিহাঃ পাঠ ক'রে এবং না ক'রে দু'ভাবে আদায় করাই সুন্নাত।

3. ইমাম আছরামের বর্ণনামতে বিশিষ্ট তাবে'ঈ মুজাহিদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমি তা পাঠ করার বিষয়টি ১৮ জন সাহাবীকে জিজ্ঞেস করেছি, তাঁরা সকলেই তা পাঠ করার কথা বলেছেন।[১৫৫]

4. তা পাঠ করার বিষয়টি উম্মে শুরাইক রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত একটি মুসনাদ হাদীস দ্বারাও সমর্থিত। তিনি বলেন: "রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- আমাদেরকে জানাযার নামাযে সূরায়ে ফাতিহাঃ পাঠ করার নির্দেশ করেছেন।"[১৫৬] এ হাদীসের সনদে সামান্য দুর্বলতা থাকলেও[১৫৭] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক

---

[155].আল-লক্ষ্ণৌভী, আবুল হাসানাত মুহাম্মদ আব্দুল হাই আল-হানাফী, আত-তা'লীকুল মুমাজ্জাদ 'আলা মুওয়াত্তা ইমাম মুহাম্মদ; (দেওবন্দ: আশরাফী বুক ডিপো, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), পৃ.১৬৯।

[156]. ইবনে মা-জাঃ, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানাইয, বাব নং ২২, হাদীস নং ১৪৭৬, ৩/৪৭৯। [(এর সনদ দুর্বল), সম্পাদক]

[157].ইমাম ইবনে হাজার 'আছক্বালানী এ হাদীসের সনদে সামান্য দুর্বলতা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। দেখুন : আবুল হাসানাত আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত; পৃ.১৬৯। [শাইখ আলবানীও হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন]

বর্ণিত এবং অন্যান্য সাহাবীদের মতামত দ্বারা এ হাদীসের বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার ফলে তা পাঠ করার বিষয়টি রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নির্দেশ দ্বারা প্রমাণিত হয়।

5. তা পাঠ না করার বিষয়টি কোনো কোন সাহাবীর ব্যক্তিগত 'আমল দ্বারা প্রমাণিত হলেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কোনো সহীহ বা দুর্বল হাদীস দ্বারা তা পাঠ না করার বিষয়টি প্রমাণিত নয়।

6. সাহাবীদের মধ্যে যারা তা পাঠ না করার পক্ষে ছিলেন, তাঁরা হয়তো তা পাঠ করা সুন্নাত এ কথাটি অবগত হতে পারেন নি। পরবর্তীতে যখন সাহাবাদের মাঝে এ বিষয়টি নিয়ে দ্বিমত দেখা দেয়, তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা তা সশব্দে পাঠ ক'রে এর সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর এ ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে বর্ণিত বিভিন্ন হাদীস দ্বারা এ-কথাই প্রমাণিত হয়।

7. ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এবং অন্যান্য ইমামগণের নিকট ইবনে আব্বাসের হাদীস পৌঁছে থাকলে তাঁরা অবশ্যই তা পাঠ করার ব্যাপারে মত দিতেন। কেননা, তাঁরা বলেছেন : "হাদীস যখন সহীহ হিসেবে পাওয়া যাবে তখন সেটাই হবে

আমাদের মত"।[158] অথবা অন্তত তাঁরা এমনটি বলতেন : তা পাঠ করা উত্তম, তবে না করলেও কোনো অসুবিধা নেই।

8. জানাযার নামাযে রুকু‘ ও সেজদা না থাকলেও তা ফরয নামাযের ন্যায় ক্বিবলা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমার সাথে আদায় করতে হয়। এর উদ্দেশ্য মৃত মানুষের জন্য দো‘আ হয়ে থাকলেও শর‘য়ী দৃষ্টিকোণ থেকে এটি এক ধরনের নামায। সে জন্যে তাতে সূরা ফাতিহাঃ পাঠ করা আবশ্যক। কেননা, "যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহাঃ পাঠ করে নি তার কোনো নামায নেই"[159], এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক যে সব সাধারণ হাদীস রয়েছে, জানাযার নামাযও সে সব সাধারণ হাদীসের আওতায় পড়ে।

9. তা ক্বিরাত হিসেবে না পাঠ করলেও অন্তত আল্লাহ তা‘আলার প্রশংসা ও দো‘আ হিসেবে পাঠ করা-ই উত্তম। হানাফী

---

[158].ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেছেন: إذا صح الحديث فهو مذهبي . "হাদীস যখন সহীহ হবে সেটাই আমার মাযহাব হবে"। দেখুন:ইবনে ‘আবিদীন, হাশিয়াতু রদ্দিল মুহতার ‘আলাদ দুররিল মুখতার; ১/৬৭।

[159].বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাব নং ১৬, সিফাতিস সালাত, বাব নং ১৩, হাদীস নং ৭২৩, ১/২৬৩; মুসলিম, প্রাগুক্ত; ১/২৯৫;তিরমিযী, প্রাগুক্ত; ২/২৫।

মাযহাবের প্রখ্যাত ইমাম ত্বহাবী[১৬০] এবং ইমাম ইবনুল হুমাম দো‘আ হিসেবে তা পাঠ করার পক্ষে মত দিয়েছেন।[১৬১]

10. কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করা জায়েয হওয়ার পক্ষে কোনো দলীল না থাকা সত্ত্বেও আমরা কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কবরস্থ ব্যক্তির কল্যাণের জন্য ফাতেহা পাঠ করার একটি সুন্নাত জারি করেছি, অথচ জানাযা করার সময় তা পাঠ করা জায়েয হওয়ার প্রমাণে এত সব দলীল ও যুক্তি প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মাযহাবের দোহাই দিয়ে আমরা তা পাঠ করাকে জায়েয মনে করি না।

11. জানাযার নামাযে ফাতিহাঃ পাঠ করার প্রমাণে এত সব দলীল প্রমাণাদি থাকার কারণে তা পাঠ করা জায়েয হওয়ার বিষয়টি বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ হাসান ইবন হাসান শরম্বুলালী (মৃত ১৮২৭ খ্রি.) ও মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী স্বীকার করেছেন। যারা তা পাঠ করাকে মকরূহ বলেন তাদের কথার প্রতিবাদ করার জন্য শরম্বুলালী

---

[160].ইবনে হাজার ‘আসক্বালানী, ফতহুলবারী;৩/২০৪।

[161].ইবনুল হুমাম, কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ আব্দুল ওয়াহিদ, শরহে ফতহুল ক্বাদীর; (দ্বার এহইয়াউত তুরাছিল ‘আরাবী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ১/৪৫৯।

(النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأم الكتاب)

নামে একটি পুস্তকও রচনা করেছেন এবং মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌভী বলেছেন : তা পাঠ করা মকরূহ বলার কোনই যুক্তি নেই।[১৬২]

উপর্যুক্ত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আমরা যদি সত্যিকার অর্থে কুরআন ও হাদীসের যথার্থ অনুসারী হয়ে থাকি, তা হলে আমাদেরকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ও উম্মে শুরাইক রাদিয়াল্লাহু আনহার হাদীসের উপর 'আমল করা উচিত বলে বিবেচিত হবে। জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা : পাঠ করার বিধান আমাদের মাযহাবে নেই, এ কথা বলে 'আলেম সমাজের পার পাবার কোনো সুযোগ নেই। কেননা, এর অর্থ হচ্ছে : আমরা দু'টি জায়েয কর্মের মধ্যে যে কাজটি উত্তম, সেটিকে উত্তম বলে স্বীকৃতি না দিয়ে যে কাজটি করা শুধুমাত্র জায়েয সেটির উপর 'আমল করে সেটিকে উত্তমের পর্যায়ে উন্নীত করছি, আর উত্তম কর্মকে না জায়েয ও মকরূহ বলে তা পরিত্যাগ করছি এবং এ-সব করছি কেবল নিজ মাযহাবের দোহাই দিয়ে অন্ধভাবে তা অনুসরণ করার কারণেই। আবার অনেককে এ-সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে এবং সহীহ হাদীস অনুযায়ী যা পালন করা

162. আবুল হাসানাত আব্দুল হাই, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬৯।

উত্তম তা পালন না করার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তারা বলেন : এ সব বিষয়ের ফয়সালা বহু পূর্বেই শেষ হয়ে গেছে। এ সব নিয়ে আমাদের চিন্তা করার কোনই অবকাশ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হলো : এ সব নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ যদি না-ই থাকে, তা হলে আমাদের মাযহাবেরই বিশিষ্ট মনীষীগণ কেনইবা আমাদের মধ্যে প্রচলিত এসব 'আমলের বিপরীত 'আমলকে সঠিক বলে মন্তব্য করলেন? এতে প্রমাণিত হয় যে, আমাদের মাঝে প্রচলিত কোনো কোনো 'আমলের ব্যাপারে চিন্তা ভাবনা করার অবকাশ রয়েছে। আর সে জন্যেই তাঁরা উপর্যুক্ত ধরনের মন্তব্য করেছেন। এতে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমাদের মাঝে এমনও কিছু কর্ম রয়েছে যা প্রচলিত নিয়মে না হয়ে অন্যভাবে হওয়াই উচিত ও উত্তম ছিল। কিন্তু মাযহাবে অনুত্তম কর্ম প্রচলিত হয়ে গেছে বলেই আমরা আর সঠিক ও উত্তম 'আমলে ফিরে যেতে চাই না। অনুসরণের ক্ষেত্রে এমন মানসিকতা পোষণ করা কি সঠিক তা আমাদের ভেবে দেখা উচিত। এ-ভাবে মাযহাবের অন্ধ তাকলীদ করার কথা বলে বিশুদ্ধ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত সঠিক বা উত্তম 'আমল পরিত্যাগ করলে আখেরাতে কি পরিত্রাণ পাওয়া যাবে? এতে কি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যথার্থ অনুসরণ ও আনুগত্য হবে?

অনুসরণের ব্যাপারে সাধারণ ও আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের অবস্থা:

এ তো গেলো দেশের ‘আলেম সমাজের অনুসরণ সংক্রান্ত দূরবস্থার কথা। তারা অনেকটা চোখ থাকতে অন্ধ এর অবস্থার মত হয়ে রয়েছেন। **অপর** দিকে দেশের সাধারণ শিক্ষিত জনগণ ধর্মীয় উপাসনা ও অনুষ্ঠানাদি পালনের ক্ষেত্রে সাধারণ ‘আলেমদের অনুসরণে মাযহাবে প্রচলিত বিষয়াদির অন্ধ অনুসরণ করে থাকেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা অপারগও বটে। তবে দুনিয়া অর্জন ও শাসনের ক্ষেত্রে তারা ধর্মীয় বিধানের কোনো তোয়াক্কা করেন না। সে-জন্য রাজনীতি থেকে শুরু করে অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের অথবা পশ্চিমাদের তৈরী বিধি-বিধানের অনুসরণ করে চলেছেন। দেশ পরিচালনার জন্য আল্লাহর দেয়া নির্দেশিকা আল-কুরআনের আলোকে দেশ পরিচালনার জন্য সংবিধান রচনা না করে নিজেদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী সংবিধান তৈরী করে দেশ পরিচালনা করছেন। চুরি, ডাকাতী, হত্যা, সন্ত্রাস ও ব্যভিচার ... ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে কুরআনুল কারীমে সুস্পষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও এর প্রতি কোনরূপ ভ্রুক্ষেপ না করে তারা সে-সব ক্ষেত্রে নিজেদের পক্ষ থেকে আইন ও বিধান রচনা করে সংসদে তা পাশ করে নিয়ে বিচার কার্য পরিচালনা করছেন। যারা দেশ ও বিচার বিভাগ পরিচালনার ক্ষেত্রে আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও

বিধানকে বর্তমান সময়ে তা বাস্তবায়নের অযোগ্য বলে উপেক্ষা করেন এবং দেশ ও বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে পশ্চিমাদের অনুসরণ করেন অথবা নিজেদেরকে সে-জন্যে প্রয়োজনীয় আইন রচনা করার যোগ্য বলে মনে করেন, তারা আল্লাহর রুবুবিয়্যাতে শির্কে নিমজ্জিত হয়ে রয়েছেন। আর যারা আল্লাহ প্রদত্ত আইন ও বিধানকে বর্তমানে বাস্তবায়নের যোগ্য মনে করা সত্ত্বেও পারিপার্শ্বিক বিবিধ কারণে তা বাস্তবায়ন করতে না পেরে মানব রচিত আইনের দ্বারা দেশ ও বিচার বিভাগ পরিচালনা করেন, তারা সর্বদাই কবিরা গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন।[১৬৩] নিজেদের পরকালীন জীবনের কল্যাণের স্বার্থে এ কাজ থেকে তাদের তাওবা করা একান্ত প্রয়োজন।

১৬.পীরের নিকট রহমত ও করুণা কামনা করা :

মানুষ কোনো অপরাধ করুক আর না-ই করুক, সর্বাবস্থায় তার মন আল্লাহর কাছে তাঁর রহমত ও করুণার ভিখারী হয়ে থাকবে। নিজের জানা বা অজানা সকল অপরাধের মার্জনা লাভের জন্য সর্বদা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণকারী হয়ে থাকবে। কেননা,

---

[163]. শায়খ মুহাম্মদ ইবন ইব্রাহীম আ-লুশয়খ, **তাহকীমুল কাওয়ানীন;** (মদীনা : মারকাযু সুউনিদ দাওয়াতি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা, ৩য় সংস্করণ, ১৪০৪ হি:), পৃ.১১।

সর্বদা তাঁর করুণাকামী হয়ে থাকা হচ্ছে অন্তরের একটি উপাসনা বিশেষ, যা মৃত বা জীবিত কোনো পীর বা ওলির নিকট প্রকাশ করা যায় না। এ জাতীয় উপাসনার নির্দেশ করে আল্লাহ বলেছেন:

﴿ وَأَنِيبُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّكُمۡ وَأَسۡلِمُواْ لَهُۥ﴾ [الزمر: ٥٤]

"তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দিকে ফিরে আসো এবং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর"।[১৬৪] আল্লাহর দিকে ফিরে আসার পদ্ধতি সম্পর্কে কারো জানা না থাকলে তা জানার জন্য তিনি জীবিত লোকদের মধ্যে যারা তা জানেন, তাদের নিকট থেকে তা জেনে নিবে, এটাই শরী'আতের নির্দেশ। তা জেনে নিয়ে আল্লাহর কাছে সে তার মনের কথা বলবে, তাঁর কাছেই অনুনয় বিনয় করে নিজের যাবতীয় কৃত অপরাধের জন্য মার্জনা কামনা করে তাঁর রহমত কামনা করবে। কিন্তু পীর ভক্তদেরকে এর ব্যতিক্রম করতে দেখা যায়। তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের পীর বাবার কাছেই বিনয় প্রকাশ করেন। তারই কাছে ক্ষমা ও করুণা ভিক্ষা করেন। উদাহরণস্বরূপ নিম্নের কথাগুলো লক্ষ্য করা যায়। এক ব্যক্তি একটি বই এর প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় লিখেছে :

---

[164]. আল-কুরআন, সূরা যুমার: ৫৪।

"হে চাঁদপুরীশাহ! হে আমার বাবা ও পীর এবং ক্বিবলা! আমার উপর রহম করুন"।[১৬৫]

অপর এক কবিতায় একজন লিখেছে:

"আশা পুরাও ওহে চাঁদপুরী মাওলা দু'জাহান

তা না হলে দুই অধমে করো না কুরবান।"[১৬৬]

অপর এক ব্যক্তি বলেছে:[১৬৭]

"আমার গউছুল আ'জম চাঁদপুরী শাহ হাকীকে রাসূল

রহম নজরে বাবায় তরায় দুই কুল"।

অপর একজন তার পীরকে খেতাব করে বলেছে:" তুমি তোমার ভক্তদের জন্য ক্ষমাশীল ও দয়ালু ছিলে"।[১৬৮]

---

[165]. চাঁদপুরী শাহ পীরের ভালবাসা প্রকাশার্থে লিখিত "প্রেমের শুরা-এক্কের খনী" নামক পুস্তিকার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় একথাগুলে লিখিত রয়েছে। (বইটির প্রকাশক: চাঁদপুরী শাহ দরবার শরীফ: খাদেম মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ১ম সংস্করণ)।

[166]. তদেব; কবিতা নং- ১৯।

[167]. তদেব; কবিতা নং- ২০।

নোয়াখালী জেলার হাফিজ মহিউদ্দিন নামক পীরের দরবার থেকে প্রচারিত এক পত্রে জনৈক ভক্ত লিখেছে : "ওহে বাবা! তুমি যদি আমার উপর রহম না কর, তা হলে আমার কী অবস্থা হবে।"

এভাবে পীর ভক্তগণ তাদের পীরকেই আল্লাহর গুণে গুণান্বিত করে নিয়েছেন। তাই আল্লাহর পরিবর্তে তারা তাদের পীরের কাছেই আত্মসমর্পণ করে তার করুণা ও দয়া ভিক্ষা করে থাকেন।

---

[168]. কুমিল্লা জেলার গাজীউল হক মাইজভান্ডারীর কোন এক ভক্তের কথা, যা তার কবরের প্রচার পত্র থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যাসগত শির্কের উদাহরণ (شرك العادات)

উপরে উদাহরণস্বরূপ যে সব কর্মের বর্ণনা প্রদান করা হলো, এর দ্বারা স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, আমাদের দেশের অসংখ্য মুসলিম আল্লাহর উপাসনা তথা তাঁর উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে শির্কে নিমজ্জিত রয়েছেন। এবার যদি আমরা তাদের অভ্যাস বা ব্যবহারিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য করি, তা হলে দেখতে পাব যে, মহান আল্লাহ মানুষের জীবনের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক হওয়া সত্ত্বেও অনেক মুসলিমদেরকে কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণার্থে এমন সব পন্থা অবলম্বনে অভ্যস্ত দেখা যায়, যা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টির নিকট কল্যাণার্জন ও অকল্যাণদূরীকরণ কামনা করার শামিল। নিম্নে এর কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরা হলো:

1. **রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে ধাতব দ্রব্য দ্বারা নির্মিত আংটি বা বালা পরিধান করা :**

আমাদের দেশের রাজধানীর ফুটপাতে এবং বড় বড় পাইকারী বাজারে এমন কিছু ব্যবসায়ের দোকান পাওয়া যায়, যারা ধাতব নির্মিত আংটি বা বালা বিক্রি করে থাকেন। অনেক লোকদেরকে তা বাত রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকারী বিশ্বাস করে আংগুলে ও হাতে ব্যবহার করতে দেখা যায়।

আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে কোনো বস্তুই নিজস্ব গুণে কোনো রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী হতে পারে না। তাই কোনো বস্তুকে কোনো ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী বলা বা এ ধারণা করে তা ব্যবহার করা শির্কে আসগার হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। আরব সমাজে এ-জাতীয় রোগে এ ধরনের বালা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। এতে রোগীর অন্তরে ধাতব বস্তুর প্রতি উপকারী হওয়ার ধারণার সৃষ্টি হয় এবং রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে আল্লাহর পরিবর্তে বস্তুর উপর ভরসা করা হয়। এ কারণে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ ধরনের বালা ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। যার প্রমাণ প্রথম অধ্যায়ে আরব সমাজে প্রচলিত অভ্যাসগত শির্কের বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রদান করা হয়েছে।

২. জিন বা অপর কোনো রোগের অনিষ্ট থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীরে তা'বীজ ব্যবহার করা :

জিনের অশুভ দৃষ্টি এবং বিভিন্ন রোগের অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য আমাদের দেশের সাধারণ মুসলিমদের মাঝে তা'বীজ ব্যবহার করা একটি সাধারণ রীতিতে পরিণত হয়েছে। তারা এ-সব তা'বীজ কোনো জিন সাধক বা পেশাদার কোনো পীর-ফকীর বা কবিরাজ, উলঙ্গ ও মাথায় জটধারী পাগল বা পাগলের ভানকারী লোকদের নিকট থেকে তাদেরকে ওলি বা দরবেশ জ্ঞান করে

নিয়ে থাকেন। এদের চটকদার কোনো কোন কথাকে তারা তাদের কারামত মনে করে ধোকায় পড়ে যান। অথচ তারা জানেন না যে, এ-জাতীয় তা'বীজদানকারী জিন সাধক, কবিরাজ ও পাগলেরা আসলে শয়তান। এভাবে যারা প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ সম্পদ উপার্জন করতে চায় এদের সাথে যে শয়তানের গোপন সখ্যতা গড়ে উঠে, সে সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন:

﴿ هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ۝٢٢١ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝٢٢٢ ﴾ [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢]

"কাদের উপর শয়তান অবতীর্ণ হয়, সে সম্পর্কে আমি কি তোমাকে সংবাদ দেব? শয়তানতো প্রত্যেক মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠ ব্যক্তির উপরেই অবতীর্ণ হয়ে থাকে"।[১৬৯]

তা'বীজ ব্যবসায় কোনো কোনো মসজিদের ইমাম ও মাদরাসার কোনো কোনো শিক্ষকগণও পিছিয়ে নেই। তারা কুরআনের আয়াত অথবা তা'বীজের কিতাব থেকে তা'বীজ দিয়ে একদিকে কুরআনের আয়াত বিক্রি করে দুনিয়া হাসিল করছেন, অপরদিকে এর মাধ্যমে তারা জনগণকে শির্কে আসগারে নিমজ্জিত

---

169. আল-কুরআন, সূরা শুআরা: ২২২।

করছেন। অথচ আল্লাহ তা'আলা তাঁর আয়াতসমূহ বিক্রি করতে নিষেধ করে বলেছেন:

﴿ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلۡتُ مُصَدِّقٗا لِّمَا مَعَكُمۡ وَلَا تَكُونُوٓاْ أَوَّلَ كَافِرِۢ بِهِۦۖ وَلَا تَشۡتَرُواْ بِـَٔايَٰتِي ثَمَنٗا قَلِيلٗا وَإِيَّٰيَ فَٱتَّقُونِ ٤١ ﴾ [البقرة: ٤١]

"তোমরা আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে অল্পমূল্য অর্থাৎ দুনিয়া হাসিল করোনা"।[১৭০]

বাজারে তা'বীজ দানের সহায়ক কিতাব অনেক রয়েছে। তন্মধ্যে নকশে সুলায়মানী ও চরমোনাই এর পীর মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক এর তা'বীজের কিতাব উল্লেখযোগ্য। মানুষের জীবনের বিবিধ রোগ-ব্যাধি নিবারণের জন্য তাতে অনেক ধরনের পথ্য দেয়া রয়েছে। যার কোনোটি কুরআনের আয়াতের, কোনোটি ফেরেশতাদের নামের, কোনোটি আসহাবে কাহাফের নামের, কোনোটি খুলাফায়ে রাশেদার নামের, কোনোটি ফেরাউন, হামান, শয়তান ও ইবলিসের নামের। নিম্নে সর্বশেষটির চিত্র তুলে ধরা হলো:[১৭১]

---

170. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাঃ : ৪১।

171 .সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, **তাবিজের কিতাব**; (ঢাকা: আল-এছহাক প্রকাশনী, সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৯৭ বাংলা), ৭ নং তদবীর , পৃ. ৩৮।

إبليس	هامان	شيطان	فرعون
شيطان	فرعون	إبليس	هامان
فرعون	شيطان	هامان	إبليس
هامان	إبليس	فرعون	شيطان

কুরআন ও হাদীস থেকে তা'বীজ দিলে বা ব্যবহার করলে তা জায়েয বা না জায়েয, এ নিয়ে কিছু কথা থাকলেও উপরে চিত্রসহ যে তা'বীজের বর্ণনা দেয়া হলো, তা মুসলিম মনীষীদের সর্ব সম্মতিক্রমে অবৈধ। কেননা, এমন তা'বীজ গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে- গায়রুল্লাহের নিকট রোগ নিরাময়ের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করা যা প্রকাশ্য শির্ক। এ-ছাড়া এতে তা'বীজ ব্যবহারকারীর ভরসা আল্লাহর উপর থাকার বদলে তার মনের অজান্তেই তা'বীজের উপর নেমে আসে। সে-জন্য রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেছেন:

«مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ»

“যে ব্যক্তি কোনো কিছুকে (তা‘বীজ হিসেবে) শরীরে ঝুলালো, তার রক্ষণাবেক্ষণের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব তাকেই বুঝিয়ে দেয়া হয়”।[১৭২] এমতাবস্থায় সে আল্লাহর হেফাজতে না থেকে নিজের হেফাজতে চলে আসে। অপর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেন:

«مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»

“যে ব্যক্তি তা‘বীজ ঝুলালো সে শির্ক করলো”।[১৭৩]

তা‘বীজের প্রকারভেদ:তা‘বীজ দু’প্রকার:

এক.এমন সব তা’বীজ যা কুরআন শরীফের আয়াত বা দো‘আয়ে মা’ছূরা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা প্রদান করা হয়। শর‘য়ী দৃষ্টিতে এ-জাতীয় তা‘বীজ প্রদান করা ও ব্যবহার করা উভয়টাই হারাম। এ-জাতীয় তা‘বীজ দানকারী বা ব্যবহারকারী যদি এ মনে করে যে, রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে এ-তা‘বীজ নিজেই কাজ করে এবং নিজেই রোগকে প্রভাবিত করে, তা হলে তা শির্কে আকবার হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি অনুরূপ ধারণা না করে আল্লাহর

---

[172].তিরমিযী, প্রাগুক্ত;কিতাব নং-২৯, বাবনং-২৪, হাদীসনং ২০৭২, ৩/৪০৩; বায়হাক্বী.প্রাগুক্ত;২/৩০৭; হাকিম, প্রাগুক্ত;৪/৪৪১।

[173].আহমদ, প্রাগুক্ত;৪/১৫৬; আল-হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ; ৫/১০৩।

অনুগ্রহে উপকারী হয়ে থাকে এ-কথা অন্তরে রেখে মুখের দ্বারা শুধু তা'বীজকে উপকারী বলে বা তা'বীজের দ্বারা রোগের উপকার হয়েছে এমনটি বলে, তা হলে তা শির্কে আসগার হিসেবে গণ্য হবে।

এ-জাতীয় তা'বীজ হারাম হওয়ার কারণ:

এতে গায়রুল্লাহের সাথে অন্তরের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। আল্লাহর উপর ভরসা না থেকে গায়রুল্লাহের উপর ভরসা হয়। যাবতীয় উপকারের মালিক আল্লাহ হওয়া সত্ত্বেও এতে গায়রুল্লাহকে উপকারের মালিক বানিয়ে নেয়া হয়। আর যে বস্তু আল্লাহর উপর থেকে মানুষের ভরসাকে নষ্ট করে এবং গায়রুল্লাহকে উপকারী নির্দিষ্ট করে, তা শির্ক। এ-জন্যেই এ-জাতীয় তা'বীজ ব্যবহার করা হারাম। এতে উপকার থাকলেও শর'য়ী দৃষ্টিতে সে উপকার গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন জাদু আল্লাহর ইচ্ছায় উপকারী হলেও সে উপকার গ্রহণ করা হারাম ও শির্ক।

দুই. এমন সব তা'বীজ যা কুরআনুল কারীমের আয়াত দ্বারা প্রদান করা হয়। এ-জাতীয় তা'বীজের ব্যাপারে মুসলিম মনীষীদের মাঝে দু'টি মত পরিলক্ষিত হয়। কেউ এটাকে জায়েয বলেন, আবার কেউ এটাকে না জায়েয ও হারাম বলেন।

আমার মতে যারা এ-জাতীয় তা'বীজকেও হারাম বলে মনে করেন, সত্য তাঁদের কথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। দলীল ও যুক্তি তাঁদের মতকেই সঠিক বলে প্রমাণ করে। কেননা;

ক) তা'বীজ ব্যবহার করা শির্ক সম্বলিত যে সব হাদীস রয়েছে তা সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। তাতে কুরআন আর অ-কুরআনের তা'বীজ বলে কোনো পার্থক্য করা হয় নি।

খ) এতে তা'বীজ ব্যবহারকারীর ভরসা আল্লাহর উপর না থেকে তা'বীজের উপরে নেমে যায়। তা'বীজই তাকে বিপদ থেকে রক্ষা করবে-এ ধরনের একটি ভাবধারা ব্যবহারকারীর অন্তরে তার অজান্তেই সৃষ্টি হয়ে যায়, যা সুস্পষ্ট শির্ক।

গ) তা'বীজ ব্যবহার করে উপকার পেলে আল্লাহর পরিবর্তে তা'বীজকেই উপকারী বলে মনে করা হয়। অথচ কোনো বস্তুর প্রতি অনুরূপ ধারণা করা শির্ক।

ঘ) এ ছাড়া কুরআনের আয়াত দ্বারা তা'বীজ দেয়া জায়েয হলে অবৈধ তা'বীজ ব্যবসায়ীরা এর দ্বারা আসকারা পাবে।

ঙ) অনুরূপভাবে এর দ্বারা অবৈধ তা'বীজ ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্তির শিকার হবে। তারা এটাকে অবৈধ তা'বীজের মতই মনে করবে। এটাকে ফকীর ও কবিরাজদের দেয়া তা'বীজই মনে করবে।

চ) এছাড়া এতে কুরআনের অবমাননা করা হয়। কুরআন বিক্রি করে দুনিয়া উপার্জনের একটি হীন পন্থা উন্মোচিত হয়।

ছ) সর্বোপরি রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাণী অনুযায়ী এতে মানুষের উপর আল্লাহর কোনো রক্ষণাবেক্ষণ থাকে না।

জ) তা'বীজ ব্যবহারকারীর প্রতি রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বদ দো'আ থাকায় তা'বীজের দ্বারা মূলত কোনো উপকার পাবার কথা নয়।[১৭৪] তা'বীজ ব্যবহার করার পর আল্লাহর ইচ্ছায় কোনো উপকার হয়ে থাকলেও এর মধ্যে তা'বীজ ব্যবহারকারী

---

[174]. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

مَنْ عَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ

"যে তা'বীজ ব্যবহার করে আল্লাহ যেন তার উদ্দেশ্য পূর্ণ না করেন"। ইবনে হিববান, প্রাগুক্ত; ১৩/৪৫০; বায়হাক্বী, প্রাগুক্ত; ৯/৩৫০।

ব্যক্তির ঈমানী পরীক্ষা নিহিত থাকবে। সুতরাং যা ব্যবহার করলে শির্ক সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তা ব্যবহার না করাই শ্রেয়।

৩. দুধের গাভী ও নতুন বাচ্চার গলায় তা'বীজ, জুতা ও জালের টুকরা ঝুলানো :

দেশের কৃষকগণ মানুষের চোখের অশুভ দৃষ্টি থেকে দুধের গাভী ও তার নবজাত বাচ্চাকে রক্ষা করার জন্য গাভী ও বাচ্চার গলায় তা'বীজ ঝুলিয়ে রাখেন। অনেক সময় উক্ত উদ্দেশ্যে গলায় প্লাষ্টিকের সেন্ডেল ও জালের টুকরাও ঝুলিয়ে রাখেন। আরব সমাজে এ-জাতীয় উদ্দেশ্যে উটের গলায় তারের মালা ঝুলিয়ে রাখার প্রচলন ছিল। এতে ভরসাগত উপাসনায় শির্ক হয় বিধায়, রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- তা কেটে দিতে নির্দেশ করেছিলেন।[১৭৫]

4. স্বামীকে বাধ্য করার জন্য গোপনে ঘরের চুলা, বিছানা, বালিশ বা অন্য কোথাও তা'বীজ রাখা:

এ-জাতীয় কর্মকেও রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- শির্কের মধ্যে শামিল করে বলেছেন:

---

[175]. আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; ৩/৫২।

«إِنَّ الرُّقَى وَ التَّمَائِمَ وَ التِّوَلَةَ شِرْكٌ»

"মন্ত্রের ঝাড়ফুঁক, তা'বীজ ও তেওলা শির্ক।"[১৭৬] 'তেওলা' হচ্ছে ঐজাতীয় জাদু-টোনা যা মহিলারা স্বামীকে বাধ্য করার জন্য করে থাকে। আমাদের দেশেও এর বহুল প্রচলন রয়েছে। মহিলারা হিন্দু জাদুকর, কবিরাজ ও জিন সাধকদের নিকট থেকে তা'বীজ এনে এ জাতীয় কর্ম করে থাকেন।

5. **আগুন, রক্ত, খাদ্য দ্রব্য, সন্তান ও মাটি ইত্যাদির নামে বা তাতে হাত রেখে শপথ গ্রহণ করা :**

এ-জাতীয় কর্মের প্রচলনও সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে। অথচ শরী'আতে এ জাতীয় শপথ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»

---

[176]. তদেব; ৪/২১২।

“যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহের নামে শপথ করলো, সে কুফরী অথবা শির্ক করলো।”[১৭৭]

6. ওলীদের কবরের মাটি ও সেখানে জালানো মোম বিভিন্ন রোগের জন্য উপকারী বলে মনে করা :

এ-জাতীয় কর্মও দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অহরহ পরিলক্ষিত হয়। তারা বিভিন্ন রোগের ক্ষেত্রে ওলীদের কবরের মাটি ও সেখানে জালানো মোমবাতি অনেক উপকারী মহৌষধ মনে করে অত্যন্ত যত্নের সাথে বাড়ীতে নিয়ে যেয়ে তা ব্যবহার করে থাকেন এবং এর দ্বারা কোনো রোগ মুক্তি হলে তা কবরস্থ ওলির দান বা তাঁর ফয়েয ব’লে মনে করে থাকেন, অথচ এমন মাটি ও মোমকে উপকারী মনে করা শির্ক।

7. কোন ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য নিরবে দাঁড়িয়ে থাকা :

ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধ মানুষ বা অপর কোনো প্রাণীর আকৃতিতে নির্মাণ করা এমনিতেই শরী‘আতে হারাম, কেননা এতে আল্লাহর সৃষ্টির সাথে পাল্লা দেয়া ও সাদৃশ্য প্রকাশ করা হয়। যারা

---

[177].হাদীসটি হাসান সনদে ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিরমিযী, প্রাগুক্ত; ৪/১১০; ইবনে হিববান, প্রাগুক্ত; ১০/২০০।

এমনটি করে হাদীসের বর্ণনানুযায়ী আখেরাতে তাদেরকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।[১৭৮] কারো স্মরণার্থে কোনো প্রাণীর আকৃতি ব্যতীত অন্যভাবে কোনো উপায়ে ভাস্কর্য বা স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা যেতে পারে, তবে এ শর্তে যে, সেখানে কোনো ফুল দিয়ে বা নীরবে দাঁড়িয়ে সেটাকে কোনো প্রকার সম্মান প্রদর্শন করা যাবে না। কেননা; এটি মানুষকে সম্মান প্রদর্শনের ইসলামী পদ্ধতি নয়। বরং এ-জাতীয় সম্মান প্রদর্শনকে ইসলাম বাড়াবাড়ি বলে মনে করে এবং এটাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির পূজা হিসেবে গণ্য করে। এ-ছাড়া এটি খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি, যা অনুসরণ করা থেকে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- মুসলিমদেরকে নিষেধ করেছেন।

৪. শিখা অনির্বাণের পাশে দাঁড়িয়ে আগুনকে সম্মান প্রদর্শন করা:

মানুষের উপকারের জন্য আল্লাহ আগুনকে সৃষ্টি করেছেন। তাই আগুনের কাজ হচ্ছে তা মানুষের উপকারে ও তাদের খেদমতে ব্যবহৃত হবে। মানুষ কোনো অবস্থাতেই আগুনের খাদেম

---

[178] হাদীসে এসেছে, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেন :

«إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ»

“কেয়ামতের দিন সবচেয়ে অধিক শাস্তি ভোগ করবে মূর্তি নির্মাণকারীগণ”। বুখারী, প্রাগুক্ত; ৫/২২২০; মুসলিম, প্রাগুক্ত; ৩/১৬৭০।

হতে পারে না। এক সময় পারস্যে অগ্নিপূজা হতো। তাই তাদেরকে অগ্নিপূজক বলা হতো। তারা আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে সেটাকে সম্মান প্রদর্শন করতো। অগ্নিপূজারী না হয়েও যারা আগুনকে সম্মান প্রদর্শন করবে, তারা অগ্নিপূজারীদেরই একজন হিসেবে গণ্য হবে। অথচ এ-কাজটিও বর্তমানে আমাদের দেশের রাজধানীর সেনাকুঞ্জে ও সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে হয়ে থাকে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে দেশের রাজনীতিবিদগণ এমনকি অনেক সময় সেনাবাহিনীর উর্ধতন অফিসারগণ সেখানে অবস্থিত শিখা অনির্বাণে যেয়ে আগুনকে নির্দিষ্ট একটি কায়দায় সম্মান প্রদর্শন করে থাকেন।

9. ‘গারোভাত তৈরী করে ভক্ষণ করা :

হিন্দুদের অনুসরণে দেশের গ্রামাঞ্চলের মুসলিম কৃষকদের মাঝে এ কর্মের প্রচলন রয়েছে। হিন্দুরা তাদের লক্ষ্মী (হিন্দুদের ধনসম্পদ ও সৌভাগ্যের দেবী) মা এর পূজার জন্য আশ্বিন মাসের শেষ দিনে এ ভাত তৈরী করে কার্তিক মাসের প্রথম দিনে তা ভক্ষণ করে। মুসলিমরা যেহেতু হিন্দুদের অনুসরণে তা করে, তাই উভয়ের উদ্দেশ্য ভিন্নতর হলেও তা মুসলিম কর্তৃক লক্ষ্মী মা এর পূজারই শামিল।

10. কপালে টাকা স্পর্শ করে তা সম্মান করা:

টাকা-পয়সা মানুষের সম্পদ। তা মানুষের জীবনের প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সে হিসেবে টাকা মানুষের খাদিম। মানুষ টাকার খাদিম বা গোলাম নয়। সম্পদের সম্মান হচ্ছে তাকে সংরক্ষণ করা, তাকে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ জ্ঞান না করা। পায়ের নিচে ফেলে এটাকে দলিত-মথিত না করা। মাথা ও কপাল ঠেকিয়ে আল্লাহর উপাসনা ও তাঁকে সম্মান করতে হয়। তাই কপালে টাকা স্পর্শ করে টাকাকে সম্মান করা টাকাকে পূজা করারই শামিল। এ-কাজটিও অনেক মুসলিম ব্যবসায়ীদের মাঝে পরিলক্ষিত হয়। দোকান খোলার পর প্রথম বিক্রি হলেই তারা এ-কাজটি করে থাকেন।

11. 'মনসা পূজার জন্য ভাত ও টাকা দান করা:

এ-কাজটিও হিন্দুদের অনুসরণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অনেক মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে।

12. **'মনসা দেবীর** ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য গাছের নিচে খাদ্যদ্রব্য দান করা।

13. গাভীর গোবর অথবা নরম মাটিতে আঙ্গুল দ্বারা সাতটি গর্ত করে নতুন গাভী থেকে আহরিত প্রথম দিনের দুধ দ্বারা সে গর্ত পূর্ণ করে এর উপর এক প্রকার ঘাস রেখে 'মানিক'

নামের কোনো পীর অথবা দেবতাকে এই বলে সম্মোধন করা: “যেমন তোমাকে সাতটি গর্ত ভরে দুধ দিলাম, তেমনিভাবে তুমি আমাকে দুধ দান কর।” এই বলে সেই গোবর বা মাটি পানিতে নিক্ষেপ করা।

14. প্রচুর পরিমাণে দুধের গাভী প্রাপ্তির আশায় গোয়াল ঘরে পায়েশ তৈরী করে ‘মানিক’ পীর বা দেবতার নামে তা উপস্থিত জনতার মধ্যে বিলি করা।

15. খেজুর গাছের প্রথম রস দিয়ে গুড় তৈরী করে শেখ ফরীদ এর সন্তুষ্টি ও তাঁর বরকত প্রাপ্তির আশায় তাঁর নামে তা গরীবদের মধ্যে বন্টন করা।

16. লক্ষ্মী মা এর সন্তুষ্টি ও তার সুদৃষ্টিতে ভাল ফলন লাভের আশায় সোমবার ও শুক্রবারে চাষাবাদ আরম্ভ করা এবং তার ক্ষতির আশঙ্কায় অন্য দিনে চাষাবাদ আরম্ভ করা থেকে বিরত থাকা।

17. **জঙ্গলের জিনের কাছে আশ্রয় চাওয়া:** কাঠ বা গাছ কাটার জন্য জঙ্গলে যাওয়ার পূর্বে জঙ্গলের সরদারকে এই বলে আহ্বান করা : “মাগো! জঙ্গলে তোমার সন্তানরা এসেছে, মাগো! আশা করি তোমার অন্তরে দয়া থাকবে, হে জঙ্গলের সরদারিনী মা! তোমার সন্তানদের রক্ষা কর, তাদের তুমি

ভুলে যেওনা। জঙ্গলের সিংহ, বাঘ ও জিনদের এক পাশে রেখে দিও।”

18. **খাওয়াজ খিযির ও পীর বদরকে আহ্বান করা :** ভ্রমণে যাবার প্রাক্কালে নৌকায় আরোহণ করে পাঁচপীর, খাওয়াজ খিজির ও শেখ বদরকে আহ্বান করা। এ ধরনের আহ্বান দেশের সাধারণ মানুষদের মাঝে বহুল প্রচলিত রয়েছে। অনুরূপভাবে দুঃখজনকভাবে সাইমুম শিল্পীগোষ্টির শিশু-কিশোরদের গাওয়া একটি গানের কেসেটেও বদর বদর বলে বদর পীরকে আহ্বান সম্বলিত একটি গান রয়েছে।

19. **জঙ্গলের কাঠ সরদারিনীকে ভয় করা :** কাঠ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নৌকা যোগে বের হয়ে নৌকায় শয়নের সময় মুখ নিচের দিকে দিয়ে শয়ন করা থেকে বিরত থাকা, এই ভয়ে যে, এতে কাঠ সরদারিনী রাগান্বিত হবে এবং কাঠ সংগ্রহ করা সম্ভব হবে না।

20. **মাটি ও গাছকে সালাম করা :** কাঠ সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে প্রবেশের সময় মাটি ও গাছকে সালাম করা, ললাট ও জিহ্বা দিয়ে মাটি স্পর্শ করা এবং মাগো মাগো বলে জঙ্গলে পদার্পণ করা।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সুন্দরবন এলাকার মানুষের মাঝে এছাড়াও আরো অনেক শির্কী কর্মকাণ্ড বিদ্যমান রয়েছে। তা জানার জন্য

প্রয়োজনে মো: বুরহানুদ্দিন রচিত 'শেরেক বিনাশ বা বেহেস্তের চাবি' ও মাওলানা সৈয়দ আহমদ রচিত 'শিরেক বর্জন' বই দু'টি দেখা যেতে পারে।[১৭৯]

সমাজে প্রচলিত শির্কে আসগার এর কতিপয় উদাহরণ

এ পর্যন্ত দেশে প্রচলিত যত শির্কের উদাহরণ তুলে ধরা হয়েছে, এর দু'একটি ব্যতীত অবশিষ্ট সবকয়টিই শির্কে আকবার এর অন্তর্গত। নিম্নে সমাজে প্রচলিত কতিপয় শির্কে আসগার এর উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

1. কারো ইচ্ছাকে আল্লাহর ইচ্ছার সমতুল্য করা। যেমন কাউকে এ-কথা বলা যে, 'আল্লাহ এবং আপনি যা চান'। এ জাতীয় কথাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শির্ক হিসেবে গণ্য করেছেন। যার প্রমাণ আমরা প্রথম অধ্যায়ে বর্ণনা করেছি।
2. আল্লাহর নাম ব্যতীত পিতা-মাতা, সন্তানাদি ও আগুন ইত্যাদির নামে শপথ গ্রহণ করা।

---

[179]. 'শেরেক বিনাশ' নামের বইটি ঢাকা থেকে আল-নাহদা প্রকাশনী কর্তৃক ১৩৯৫ বাংলা সনে এবং 'শেরেক বর্জন' বইটি সাতক্ষিরা থেকে হামিদিয়া লাইব্রেরী কর্তৃক ১৩৬৮ বাংলা সনে প্রকাশিত হয়েছে।

3. আব্দুর রাসূল, আব্দুন্নবী, গোলাম রাসূল, গোলাম মুস্তফা ও গোলাম সাকলায়েন ইত্যাদি নাম রাখা।

4. পত্র লেখার সময় আল্লাহর রহমত ও পত্র প্রাপকের দো'আকে সম মর্যাদাবান করে এমনটি বলা যে, 'আমি আল্লাহর রহমতে ও আপনার দো'আয় ভাল আছি। কথাটি এভাবে না বলে যদি বলা হয় : আমি আল্লাহর রহমতে অতঃপর আপনার দো'আয় ভাল আছি', তা হলে তাতে শির্ক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

5. চোখের অশুভ দৃষ্টি থেকে সন্তানকে রক্ষার জন্য সন্তানের ললাটে কালো টিপ বা দাগ দেয়া। এ-কাজটি আল্লাহর উপরে ভরসার পরিপন্থী বলে তা শির্কে আসগার।

6. একই ভাবে চোখের কুদৃষ্টি থেকে ক্ষেতের ফসল রক্ষার জন্য মাটির পাত্রের পিঠে চুনা লেপ দিয়ে তা ক্ষেতে রেখে দেয়া। এ-কাজটিও আল্লাহর উপর ভরসার পরিপন্থী।

7. লোক দেখানো ও তাদের প্রশংসা পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোনো কাজ করা।

8. ভ্রমণের প্রাক্কালে রাস্তায় খালি কলসি দেখলে এটাকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা।

9. কলেরা, দাদ, একজিমা, এইডস, প্লেগ ও যক্ষা ইত্যাদি রোগকে 'আল্লাহর ইচ্ছায় সংক্রামক রোগ' হতে পারে এমনটি

না বলে কথায় ও লেখনীতে এ-গুলোকে সংক্রামক রোগ বলা।

10. কোনো বস্তুকে আল্লাহর ইচ্ছায় ও তাঁর রহমতে কোনো রোগের ক্ষেত্রে উপকারী বা অপকারী এমনটি না বলে সরাসরি সে বস্তুকেই উপকারী বা অপকারী বলা। যেমন এমনটি বলা : নাপা ট্যাবলেট জ্বর সারানোর জন্য উপকারী।
11. কোনো ঔষধ খেয়ে আল্লাহর রহমতে রোগ সেরেছে এমনটি না বলে অমুক ঔষধ খেয়ে রোগ সেরেছে এমনটি বলা। যেমন এমনটি বলা যে, নাপা খেয়ে আমার জ্বর সেরে গেছে।
12. আল্লাহ অধিকাংশ জনগণের রায়ের মাধ্যমে ক্ষমতা দান ও তা ছিনিয়ে নেয়ার মালিক হওয়া সত্ত্বেও কথায় ও লেখনীতে দেশের জনগণকে ক্ষমতার মালিক ও উৎস বলে মনে করা।
13. কোনো কাজ সমাধা করার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা না করে কোনো মানুষের উপর ভরসা করে এমনটি বলা যে, 'এ কাজে আপনি আমার একমাত্র ভরসা'।

এ সব শির্কে আসগার ছাড়াও সমাজে প্রচলিত আরো কিছু বিষয়াদি রয়েছে যা বাহ্যত কুসংস্কারের মতই মনে হয়। কিন্তু এ সব ক্ষেত্রেও বস্তুর প্রতি অপকারের ধারণা থাকায় মানুষের মনের

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তা শির্কে আকবার বা শির্কে আসগারে পরিণত হতে পারে। নিম্নে এর কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হলো :

কুসংস্কার

1. বাড়ীর খাদ্য দ্রব্যের বরকত কমে যাওয়া এবং মৃত আপনজনদের রূহের উপর পানি পড়ে যাওয়ার ভয়ে রাতের বেলা ঘরের ব্যবহৃত পানি বাইরে না ফেলা।
2. ভ্রমণের প্রাক্কালে কোনো গাভী বা কুকুর হাঁচি দিলে এতে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার আশঙ্কা করা।
3. রবিবারে বাঁশ কাটাকে বাঁশ ঝাড়ের জন্য অশুভ মনে করা।
4. ভ্রমণের প্রাক্কালে বাড়ীর পিছনের দরজা দিয়ে বের হওয়াকে অশুভ বলে মনে করা।
5. কোন ভাল কাজের উদ্দেশ্যে বের হলে অকল্যাণ হতে পারে এ ভয়ে পিছনের দিকে ফিরে না তাকানো।
6. পরীক্ষায় শূন্য পাওয়ার ভয়ে পরীক্ষা দিতে যাওয়ার পূর্বে ডিম খাওয়া থেকে বিরত থাকা।
7. পেঁচা দেখলে বা এর আওয়াজ শুনলে এটাকে অশুভ মনে করা।

8. দিনের বেলা ঘরের চালে বসে কাক ডাকলে এটাকে কোনো মেহমান আগমনের পূর্বাভাস বলে মনে করা।
9. বরকত লাভের উদ্দেশ্যে নতুন বউ এর পিতার বাড়ী থেকে শাড়ীর আঁচলে বেঁধে কিছু চাউল এনে তা স্বামীর বাড়ীর গুদামে ছিটিয়ে দেয়া।
10. রাতের বেলা ঘরের চালে বসে পেঁচা ডাকলে এতে বিপদের আশঙ্কাবোধ করা।
11. নবজাত শিশুকে জিনের অশুভ দৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য বাচ্চার কানে ছিদ্র করা।
12. একই উদ্দেশ্যে বাচ্চার বালিশের নিচে জুতার টুকরা রাখা।
13. বাংলা বর্ষ পঞ্জিকার বর্ণনানুযায়ী সপ্তাহের শনিবার, মঙ্গলবার ও অমাবশ্যার দিনকে অশুভ মনে করা এবং তাতে কোনো বিবাহ অনুষ্ঠান না করা।
14. ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ার ভয়ে বেলা ডুবার পর চিটাগুড় ও হলুদ বিক্রি করা থেকে বিরত থাকা।
15. সোমবার ও শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিনসমূহে কৃষিকাজ আরম্ভ করলে ভাল ফলন হয় না বলে মনে করা।
16. কলার চারা রোপণের পূর্বে ঘরের আঙ্গিণা অতিক্রম করলে কলার ফলন ভাল হয় বলে মনে করা।

17. কাঁচা মরিচের চারা লাগিয়ে হাতের দ্বারা আগুনের তাপ নেওয়া এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে, এতে কাঁচামরিচ অধিক ঝাল হবে।

18. হালুয়া বা মিষ্টি খেয়ে মিষ্টি কুমড়ার বীজ বপন করলে এতে কুমড়ায় মিষ্টি বেশী হয় বলে মনে করা।

19. রাতের বেলা কাউকে টাকা দিলে এতে ভাগ্য খারাপ হবে বলে মনে করা।

20. পৃথিবী একটি ষাড়ের শিং এর উপর রয়েছে, যখনই উহা শিং নাড়া দেয় তখনই ভুমিকম্প হয় বলে মনে করা।

21. ভ্রমণের সময় রাস্তায় কোনো বিধবা মহিলার সাথে সাক্ষাৎ হলে বিপদের ভয়ে ভ্রমণ বাতিল করা।

22. নতুন পোশাক পরিধান করার পর হাঁচি আসলে এটাকে অশুভ বলে মনে করা।

23. বৈশাখ মাসের প্রথম দিনে দোকানে মাল বাকী বিক্রি করাকে অশুভ মনে করা।

24. সকাল বেলা দোকান খুলে সারাদিন বিক্রি না হওয়ার ভয়ে প্রথমে কারো কাছে বাকীতে কিছু বিক্রি না করা।

25. চল্লিশা পালন না করলে মৃত ব্যক্তির কবরে আযাব হয় বলে মনে করা।

26. নবজাত শিশুকে জিনের কুদৃষ্টি থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে শিশুর মাথার চুল না কাটা।

27. শনিবার ও মঙ্গলবারকে অশুভ মনে করে ভ্রমণে না যাওয়া।

28. সন্তান বিকলাঙ্গ জন্ম হওয়ার ভয়ে স্ত্রী গর্ভবতী থাকাবস্থায় গরু ও ছাগল যবাই করা থেকে বিরত থাকা।

29. পেট ব্যথা হলে তা নিবারিত হওয়ার আশায় বিরিয়ানী পাক করে তিন রাস্তার মাথায় একটি পাত্রের মাঝে কিছু খাবার রেখে আসা।

30. কোনো কলাগাছের কাঁদি সঠিকভাবে বের না হলে গর্ভবতী মহিলার সন্তান প্রসবের সময় সমস্যা হবার আশঙ্কায় তাকে সে কাঁদির কলা খেতে না দেয়া।

31. জমজ সন্তান হবার ভয়ে যুক্ত কলা খাওয়া থেকে বিরত থাকা।

উপর্যুক্ত বিষয়াদি ছাড়াও দেশের মানুষের মাঝে আরো অনেক বিষয়াদি রয়েছে যা শুনতে কুসংস্কারের মত মনে হয়। তবে মানুষের অন্তরের অবস্থা বিচারে এ সব ধ্যান-ধারণা শির্কে আকবার বা আসগারে পরিণত হতে পারে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

জাহেলী যুগে প্রচলিত কর্মের সাথে বাংলাদেশের মুসলিমদের কর্মের তুলনামূলক আলোচনা

তৃতীয় অধ্যায়ে আমাদের দেশের অসংখ্য মুসলিমদের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের মাঝে প্রচলিত যে সব শির্কী কর্মকাণ্ডের কথা আলোচিত হয়েছে, আশা করি এর দ্বারা চিন্তাশীল পাঠক মহলের নিকট এর সাথে জাহেলী যুগের মানুষের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের কী পরিমাণ মিল বা অমিল রয়েছে, তা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। এর পরেও বিষয়টি যাতে সর্ব সাধারণের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে যায় সে জন্যে নিম্নে উভয় সময়ের শির্কী কর্মকাণ্ডের একটি তুলনামূলক বর্ণনা ছক আকারে প্রদান করা হলো :

জাহেলী যুগের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাস	**বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিমদের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাস**
গণক ও কাহিনদের	গণক, টিয়া পাখি ও বানরের

ভবিষ্যদ্বাণীতে বিশ্বাস	মাধ্যমে ভাগ্য জানার চেষ্টা করা
আররাফদের গায়েব সম্পর্কীয় কথায় বিশ্বাস	জিন সাধকদের গায়েব সম্পর্কীয় কথায় বিশ্বাস
জ্যোতিষদের ভাগ্য সম্পর্কীয় কথায় বিশ্বাস	প্রফেসর হাওলাদার ও অন্যান্য জ্যোতিষদের ভাগ্য সম্পর্কীয় কথায় বিশ্বাস
--	আমাদের নাবী ও ওলিগণ গায়েব জানেন
পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের মঙ্গল ও অমঙ্গল জানার চেষ্টা করা	টিয়া পাখি ও বানরের সাহায্যে ভাগ্য জানার চেষ্টা করা
ওয়াদ, সুআ‘, য়াগুছ ইত্যাদি ওলিদের নামে নির্মিত মূর্তিসমূহ প্রয়োজন পূরণ করতে পারে বলে	আউলিয়াগণ বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা

বিশ্বাস করা	
--	খতমে নারী পড়ার মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম নিলেই তাঁর নামের বদৌলতে যাবতীয় সমস্যার সমাধান হয়ে যায় বলে বিশ্বাস করা
খ্রিস্টান ও হিন্দুদের ন্যায় অবতারবাদে বিশ্বাস করা	আল্লাহ নিজেই রাসূল হয়ে আগমন করেছিলেন বলে বিশ্বাস করা
--	আহমদ আর আহাদ এর মধ্যে কেবল ‘মীম’ অক্ষরের পাথ্যর্ক বলে বিশ্বাস করা
--	আরশে যিনি আল্লাহ ছিলেন মদীনায় তিনিই রাসূল হয়ে আগমন করেছিলেন বলে বিশ্বাস

	করা
দেবতারা ইহকালীন কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূর করতে পারে বলে বিশ্বাস করা	ওলীদের মধ্যকার গাউছ ও কুতুবগণ দুনিয়া পরিচালনা করেন এবং মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা
ওলি ও ফেরেশ্তাদের নামে নির্মিত মূর্তি ও দেবতাসমূহ আল্লাহর কাছে মানুষের জন্য শাফা‘আত করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা	আউলিয়াগণ নিজস্ব মর্যাদা বলে আল্লাহর কোনো পূর্বানুমতি ব্যতীত তাঁদের ভক্তদের জন্য শাফা‘আত করে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারবেন বলে বিশ্বাস করা
ফেরেশ্তা ও ওলিদের নামে নির্মিত দেবতাদেরকে সাধারণ মানুষদের জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে মনে করা	মৃত ওলীদেরকে আল্লাহর নিকটতম করে দেয়ার মাধ্যম হিসেবে মনে করা

--	মৃত ওলিগণ ভক্তদের সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা
--	ওলিগণ সাগরকে তার ধ্বংসযজ্ঞ থেকে বারণ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা
উয্যা ও যাতে আনওয়াত নামের গাছ সর্বস্ব দেবতা যুদ্ধে বরকত ও বিজয় এনে দিতো বলে বিশ্বাস করা	ওলীদের কবরের উপর অথবা পার্শবর্তী স্থানে উৎপন্ন বা লাগানো গাছের শিকড়, ফল ও পাতার মাধ্যমে বরকত ও বিবিধ কল্যাণ লাভ করা যায় বলে মনে করা
--	কবরের পুকুর ও কূপের পানি পান ক'রে এবং মাছ, কচ্ছপ ও কুমীরকে খাবার দিয়ে রোগ মুক্তি

	ও বরকত কামনা করা
‘মানাত’ নামের পাথর সর্বস্ব দেবতার নিকট প্রয়োজন পূরণের জন্য কামনা করা	আজানগাছী পীরের দরবারে রক্ষিত কথিত আবু জেহেলের হাতের পাথর দিয়ে রোগ মুক্তি কামনা করা
--	নারায়ণগঞ্জের কদমরসূল দরবারে রক্ষিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথিত কদম মুবারকের ছাপ বিশিষ্ট পাথর দ্বারা রোগ মুক্তি ও কল্যাণ কামনা করা
উপত্যকার জিন সরদারের নিকট আশ্রয় কামনা করা	কাঠ ও মধু সংগ্রহকারীদের দ্বারা জঙ্গলের জিন ও হিংস্র প্রাণীর অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য জঙ্গলের জিন সরদারিনীর নিকট

	আশ্রয় প্রার্থনা করা
--	বিল ও জলাশয়ের মাছ ধরার জন্য পানি সেচের পূর্বে ‘কাল’ নামক জিনকে শিরনী দিয়ে সন্তুষ্ট করা
পৃথিবীর ঘটনা প্রবাহের উপর তারকা ও নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাস করা	মানুষের ভাগ্যের উপর গ্রহ ও তারকার প্রভাবে বিশ্বাস করা
--	তারকার সুদৃষ্টিতে জমিতে স্বর্ণ জন্মে বলে বিশ্বাস করা
গোত্রীয় নেতাদের প্রবৃত্তি অনুযায়ী গোত্র শাসন করা	মানব রচিত বিধানের আলোকে দেশ শাসন করা
--	আল্লাহর পরিবর্তে দেশের জনগণকে ক্ষমতায় বসানোর

	সর্বময় ক্ষমতার মালিক মনে করা
দাদ ও প্লেগ রোগকে নিজ থেকে সংক্রামক রোগ বলে বিশ্বাস করা	কলেরা, বসন্ত, দাদ, এজিমা, যক্ষ্মা, প্লেগ ও এইড'স রোগকে নিজ থেকে সংক্রামক রোগ বলে মনে করা
দেবতাদের দিকে মুখ করে দো'আ করা	দো'আ গৃহীত হওয়ার জন্য মুরশিদ, পীর ও ওলিদের কবরের দিকে মুখ করে দো'আ করা
দেবতারা ছোট ছোট ব্যাপারে সাহায্য করতে পারে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাদের নিকট তা কামনা করা	মৃত ওলিগণ সাহায্য করতে পারেন, এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে তাঁদের নিকট সাহায্য চাওয়া
	ঝড়-তুফানের সময় আল্লাহর

--	বদলে পাঁচ পীর, খওয়াজ খিজির ও বদর পীরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা
ওলিদের মূর্তির সামনে বিনয়ের সাথে দাঁড়ানো	ওলিদের কবর ও পীরের সামনে বিনয়ের সাথে দাঁড়ানো
ভাল-মন্দ সর্বাবস্থায় মূর্তির নিকট সাহায্য চাওয়া	ওলীদের নিকট সাহায্য কামনা করা
ওয়াদ, সুয়া‘ ইত্যাদি অলিগণের প্রথমত কবর এবং পরে তাঁদের মূর্তির সামনে অবস্থান গ্রহণ করে আল্লাহর উপাসনায় মনোযোগ ও তাঁর নিকটবর্তী হতে চাওয়া	ওলীদের কবরে অবস্থান গ্রহণ করে তাঁদের বাতেনী ফয়েয হাসিল করা এবং তাঁদের মাধ্যমে আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চাওয়া
চাঁদ ও সূর্যকে সেজদা করা	ওলীদের কবরে সেজদা করা

বিপদাপদ দূর করার জন্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে নযর-নিয়াজ ও মানত করা	বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ওলীদের কবরের মানত করা।
দেবতাদেরকে আল্লাহর চেয়ে অধিক ভালবাসা	আল্লাহর হুকুমের উপরে পীরের হুকুমকে প্রাধান্য দেয়া
দেবতারা মানুষের ক্ষতি সাধন করতে পারে বলে মনে করা	ওলীদের কবরকে ভয় করা
দেবতাদের নিকট প্রয়োজন পেশ করা	ওলীদের নিকট প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়ার জন্য আবেদন করা
উদ্দেশ্য পূরণের জন্য দেবতাদের উপর ভরসা করা	উদ্দেশ্য পূরণের জন্য ওলিদের উপর ভরসা করা
প্রয়োজন নিয়ে দেবতাদের	প্রয়োজন নিয়ে ওলিদের

শরণাপন্ন হওয়া	স্মরণাপন্ন হওয়া এবং তাঁদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা
ধর্ম যাজকদেরকে হারাম ও হালাল নির্ধারণকারী বানিয়ে নেওয়া	শরী'আত পালনের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের উপর পীর ও মাযহাবের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া
--	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা পীরের নাম জপ করা
দেবতাদের সাথে সম্পর্কিত কথিত বরকতপূর্ণ স্থান সমূহ যিয়ারত করতে যাওয়া	ওলীদের কবর ও তাঁদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহ দূর-দূরান্ত থেকে যিয়ারত করতে যাওয়া
--	মৃত্যুর পর ওলিগণ রূহানী শক্তি বলে অনেক কিছু করতে পারেন

	বলে বিশ্বাস করা
দেবতাদের গায়ে হাত বুলিয়ে বরকত হাসিল করা	ওলীদের কবর, কবরের দেয়াল, গিলাফ ও তাঁদের স্মৃতিসমূহ স্পর্শ করে বরকত হাসিল করা
দেবতা ও বাপ-দাদার নামে শপথ গ্রহণ করা	আগুন, পানি ও মাটি ইত্যাদির নামে শপথ করা
দেবতাদের নামের সাথে মিলিয়ে সন্তানাদির নাম রাখা, বিশেষ করে তাদের দাস- আবদ, গোলাম ইত্যাদি বলা	রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কোনো ওলীর নামের সাথে মিলিয়ে সন্তানাদির নাম রাখা, বিশেষ করে তাদের দাস- আবদ, গোলাম ইত্যাদি বলা
বরকত হাসিলের জন্য সন্তানদেরকে দেবতাদের কাছে নিয়ে যাওয়া	ওলীদের কবর থেকে বরকত লাভ ও রোগ মুক্তির জন্য সন্তানদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়া এবং তাদের

	গায়ে কবরের কূপের পানি ছিটানো ও পান করানো
শির্কী পন্থায় অসুখ নিবারণের জন্য চেষ্টা করা	বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক করা
চোখের কুদৃষ্টি থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য গলায় ঝিনুক থেকে আহরিত মুক্তার মালা পরানো।	কারো চোখ লাগা থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য তাদের গলায় মাছের হাড়, শামুক ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখা।

উপর্যুক্ত তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে এ কথা পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, আমাদের দেশের অনেক মুসলিমদের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের সাথে জাহেলী যুগের মুশরিকদের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের যথেষ্ট মিল রয়েছে। তাদের মধ্যে এমনও অনেক শির্কী কর্ম রয়েছে যা জাহেলী যুগের মুশরিকদের মধ্যে ছিল না। বিশেষ করে নৌকা যোগে কোথাও যাওয়ার বিষয়টির কথা বলা যায়। জাহেলী যুগের লোকেরা কখনও নৌকা যোগে কোথাও যাওয়ার প্রাক্কালে ঝড় ও তুফানের কবলে পতিত হলে তারা বিপদ থেকে মুক্তির জন্য একনিষ্ঠভাবে

আল্লাহকেই স্মরণ করে তাঁকে আহ্বান করতো বলে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে।[১৮০] অথচ দেখা যায়, অনেক মুসলিমরা অনুরূপ বিপদে পতিত হলে সাহায্যের জন্য একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ তা'আলাকে আহ্বান না করে ওলিদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে থাবেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, জাহেলী যুগের মানুষেরা যতটুকু শয়তানের শিকারে পরিণত হয়েছিল আমাদের দেশের অনেক মুসলিমরা এর চেয়েও অধিক শিকারে পরিণত হয়েছে।

---

[180]. এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন : "তিনিই তোমাদের স্থলে ও সমুদ্রে ভ্রমণ করান। এমনকি যখন তোমরা নৌকাসমূহে আরোহণ করো এবং অনূকুল হাওয়ায় তা তাদেরকে বয়ে নিয়ে চলে, এতে তারা আনন্দিত হয়, ঠিক এমন সময় নৌকাগুলোর উপর তীব্র বাতাস এসে আঘাত হানে, আর সর্বদিক থেকে সেগুলোর উপর ঢেউ আসতে লাগে, তারা বুঝতে পারে যে, তারা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে, তখন তারা আল্লাহকে একনিষ্ঠভাবে আহবান করতে লাগে এই বলে যে, যদি তুমি আমাদেরকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর, তাহলে নিঃসন্দেহে আমরা কৃতজ্ঞ থকবো।" দেখুন : **আলকুরআন, সূরা ইউনুস : ২২। এ সম্পর্কে আরো দেখা যেতে পারে সূরা আন'আম : ৬৩; সূরা : আনকাবূত : ৬৫, সূরা ইসরা : ৬৭।**

তৃতীয় অধ্যায়

অধিকাংশ মুসলিমদের শির্কে পতিত হওয়ার কারণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

অধিকাংশ মুসলিমদের শির্কে পতিত হওয়ার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ

মানুষের প্রতিটি কাজের পিছনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কোনো না কোনো কারণ থাকে। সে অনুযায়ী আমাদের দেশসহ অন্যান্য দেশের যে সব মুসলিম বিভিন্ন শির্কী বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডে লিপ্ত রয়েছেন, তাদের সে সব বিশ্বাস ও কর্মের পিছনে কতিপয় পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে।

প্রথম পরোক্ষ কারণ : ইসলামের সঠিক আক্বীদা সম্পর্কে তারা অজ্ঞ

[السبب الأول غير المباشر لوقوع المسلمين في الشرك : **جهالتهم عن العقيدة الإسلامية الصحيحة**]

এ নিয়ে চিন্তা করলে পরোক্ষ কারণ হিসেবে যে বিষয়টিকে মৌলিকভাবে দায়ী করা যায় তা হলো : সঠিক ইসলামী আক্বীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও মূর্খ। ইয়াহূদী, খ্রিস্টান ও দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলে দাবীদার আরব জনপদের

লোকেরাও ঠিক এ পরোক্ষ কারণেই শির্কে নিমজ্জিত হয়েছিল বলে কুরআনুল কারীম ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِى هَٰٓؤُلَآءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا۟ ٱلسَّبِيلَ ۝١٧ قَالُوا۟ سُبْحَٰنَكَ مَا كَانَ يَنۢبَغِى لَنَآ أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَآءَ وَلَٰكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا۟ ٱلذِّكْرَ وَكَانُوا۟ قَوْمًۢا بُورًا ۝١٨ ﴾ [الفرقان: ١٧، ١٨]

"সে দিন আল্লাহ একত্রিত করবেন তাদেরকে এবং তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের এবাদত করত তাদেরকে, সে দিন তিনি উপাস্যদেরকে বলবেন: তোমরাই কি আমার এই বান্দাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলে, না তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? তারা বলবে- আপনি পবিত্র, আমাদের পক্ষে আপনার পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না;কিন্তু আপনিই তো তাদেরকে এবং তাদের পিতৃপুরুষদেরকে ভোগসম্ভার দিয়েছিলেন, ফলে তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল এবং তারা ছিল ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি।"[১৮১]

এখানে **"তারা আপনার স্মৃতি বিস্মৃত হয়েছিল"**এ কথার দ্বারা এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আত

---

[181] .আল-কুরআন, সূরা ফুরক্বান : ১৭-১৮।

সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণেই যুগে যুগে মানুষেরা শির্কে পতিত হয়েছিল। অতীতের মানুষেরা যেমন আল্লাহর শরী'আত সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়ার কারণে বিভিন্ন প্রত্যক্ষ শির্কী বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসে লিপ্ত হয়েছিল, কালের পরিক্রমায় অনেক মুসলিমরাও ধীরে ধীরে ইসলাম থেকে অজ্ঞ হয়ে যাওয়া বা মূল থেকেই ইসলামী আক্বীদা ও বিশ্বাসের ব্যাপারে সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা না পাওয়ার কারণে নানাবিধ শির্কী বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসে লিপ্ত হয়েছে। বর্তমানে যারা জন্ম সূত্রে মুসলিম, তারা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করে থাকলেও মহান আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাত সম্পর্কে যে চিন্তা ও চেতনা মনে প্রাণে লালন করে মু'মিন ও মুসলিম হতে হয়, সে সম্পর্কে তাঁদের অনেকেরই সঠিক ও স্বচ্ছ ধারণা নেই। তারা মুখে মুখে 'আল্লাহ আমার রব ও উপাস্য' এ কথা বিশ্বাসের স্বীকৃতি দিয়ে থাকলেও কার্যক্ষেত্রে তারা তাদের এ স্বীকৃতি বিনষ্টকারী বহু বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসে লিপ্ত রয়েছেন। মানব জাতির ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, নূহ আলাইহিস সালামের জাতি থেকে আরম্ভ করে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের শির্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য এ অজ্ঞতা ও মূর্খতাই হচ্ছে মূল ও প্রধানতম কারণ।

দ্বিতীয় পরোক্ষ কারণ : শয়তানের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র

মুসলিমদের শির্কে লিপ্ত হওয়ার দ্বিতীয় পরোক্ষ কারণ হচ্ছে- তাদের চিরশত্রু শয়তানের চতুর্মুখী ষড়যন্ত্র। শয়তান তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর সামনে যে প্রতিজ্ঞা করেছিল, তা সে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের অজ্ঞতার সুযোগে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে সে তাদেরকে এমন কিছু প্রত্যক্ষ কারণে জড়িয়ে ফেলেছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে তারা শির্কে নিমজ্জিত হয়। নিম্নে এর কয়েকটি কারণ বর্ণিত হলো।

মুসলিমদের শির্কে নিমজ্জিত হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণসমূহ :

প্রথম কারণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অলিগণের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন :

আল্লাহর পরে নবী, রাসূল, তাঁদে যোগ্য উত্তরসূরী আলেম ও মাশায়েখগণ হলেন সাধারণ মানুষদের প্রশংসা ও সম্মান পাবার যোগ্য। তাই তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান প্রদর্শনের বৈধ পন্থা হচ্ছে- ক্বুরআন ও হাদীসে যে সকল নবী ও রাসূলগণের বর্ণনা এসেছে, তাদের নবুওত ও রেসালতের প্রতি বিশ্বাস করা। আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করা। নিজের আত্মা, পিতা-মাতা, সন্তানাদি, সকল মানুষ ও সম্পদের ভালবাসার উপর তাঁর ভালবাসাকে স্থান দেয়া। সব কিছুর অনুসরণ ও আনুগত্য বাদ দিয়ে নিঃশর্তভাবে কেবল তাঁর রেখে যাওয়া কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ ও অনুকরণ

করা। কর্ম জীবনে তাঁর সুন্নাতের একচ্ছত্র অনুসরণ করা।[১৮২] নবী ও রাসূলগণকে অতিমানব হিসেবে মনে না করে এ বিশ্বাস পোষণ করা যে, তাঁরা আমাদের মতোই মানুষ ছিলেন। তাঁদের ও আমাদের মাঝে পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, তাঁদের আত্মাসমূহ পবিত্র হওয়ায় মহান আল্লাহ তাঁদেরকে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁর বাণী পৌঁছে দেয়ার জন্য বাছাই করে নিয়েছিলেন এবং তাঁদের নিকট তাঁর বাণী প্রদান করেছিলেন। নবুওত ও রেসালতের দায়িত্ব আদায়ের প্রয়োজনে আল্লাহ তাঁদেরকে যতটুকু অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞান দান করেছিলেন, এর বাইরে তাঁরা নিজ থেকে আর কোনো অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত হতে পারতেন না। তাঁরা তাঁদের সাধ্যের বাইরে অপ্রাকৃতিকভাবে কারো কোনো কল্যাণ করতে বা কোনো অকল্যাণ দূর করতে পারেন না।

তাঁদের সাথে আচরণগত সম্মান :

আচরণের দিক থেকে তাঁদেরকে যে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে তা হলো তাঁদের জীবদ্দশায় বা মুত্যুর পরেও তাঁদেরকে উচ্চ স্বরে নাম ধরে আহ্বান না করা। তাঁদের নাম আলোচনা করলে বা শ্রবণ করলে তাঁদের উপর সালাত ও সালাম পাঠ করা। আমাদের

---

[182]. ইবনু তাইমিয়াহ, একতেদাউস সিরাতিল মুসতাকীম; সম্পাদনা : হামিদ আল-ফক্বী, (বৈরুত : দারুল মারিফাহ, সংস্করণ বিহীন, সনবিহীন), পৃ. ৩৩৬।

নবীর জন্য বিশেষ করে সাধারণ সময়ে এমনিতেই এবং আজানের পর ও সালাতের মধ্যে দরূদ ও সালাম পাঠ করা। আজানের পর তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা এবং আল্লাহর নিকট 'ওসীলা' নামের একটি বিশেষ মর্যাদার স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করার জন্য দো'আ করা। মদীনায় বা তাঁর মসজিদ যিয়ারতে গেলে তাঁর কবর যিয়ারত করা। ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানরা যেমন তাঁদের নবী ও অলীদের কবরসমূহকে মসজিদ তথা গির্জায় রূপান্তরিত করেছিল তাঁদের কবরকে সেভাবে মসজিদে রূপান্তরিত না করা। মুশরিকরা যেমন কিছু সৎ মানুষের মূর্তির স্থানকে ঈদগাহ বা বার্ষিক ওরস ও মেলা বসানোর স্থানে পরিণত করেছিল তাঁদের কবরকে সেরূপ ঈদ পালনের স্থানে পরিণত না করা। নিকট ও দূর থেকে তাঁদের নিকট কিছু না চাওয়া। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র তাঁদের নাম বা তাঁদের মান ও মর্যাদার ওসীলায় আল্লাহর নিকট কিছু না চাওয়া। তাঁদের কবর বা তাঁদের কবরের দেয়ালে বরকত হাসিলের জন্য হাত না বুলানো। কবরের পার্শ্ব বা ভিতর থেকে মাটি বা অন্য কিছু বরকত বা ঔষধ হিসেবে ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ না করা।

ওলি ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ যেহেতু নবী ও রাসূলগণের উত্তরাধিকারী, তাই তাঁরাও নবী-রাসূলগণের ন্যায় বৈধ সম্মান ও মর্যাদা পাবার অধিকার রাখেন; তবে এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে যে,

তাঁরা আর নবীগণ অবস্থানগত দিক থেকে সমান মর্যাদার অধিকারী নন। নবীদের মত তাঁরাও জীবিত বা মৃত কোনো অবস্থায়ই অদৃশ্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না। তাই নবীদের মত তাঁদেরকেও দূর বা নিকট থেকে কোনো প্রকার কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণের জন্যে আহ্বান না করা। মৃত্যুর পরে তাঁরাও অন্যান্য সাধারণ মৃতদের ন্যায় জীবিত মানুষদের দো‘আর প্রতি মুখাপেক্ষী থাকেন। সে কারণে তাঁদের জন্য দো‘আ করা।

তাঁদের সাথে আচরণগত সম্মান হচ্ছে- তাঁদের কবর কারো বাড়ীর নিকটে হলে আল্লাহর কাছে তাঁদের মাগফিরাত কামনার জন্য মাঝে মধ্যে তা যিয়ারত করতে যাওয়া। তাঁদের কবর অপর কোনো জেলায় হলে কোনো জায়েয উদ্দেশ্যে সেখানে গেলে তাঁদের মাগফিরাত কামনা করার জন্য তা যিয়ারত করা। তাঁদের কবর বা কবরের আঙ্গিণাকে কোনো মসজিদের ন্যায় পবিত্র ও দো‘আ কবূলের স্থান হিসেবে মনে না করা। তাঁদের নাম ও জাতের ওসীলায় আল্লাহর কাছে কিছু না চাওয়া। তাঁদের কবরকে মসজিদে রূপান্তরিত না করা। তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে বার্ষিক ওরস পালন না করা। তাঁদের কবরে সেজদা না করা, বরকত হাসিলের জন্য কবর বা সেখানকার কোনো কিছুর উপর হাত না বুলানো এবং সেখান থেকে মাটি বা অন্য কিছু সংগ্রহ না করা। কোনো উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য সেখানকার কোনো গাছের গোড়ায়

সুতা না বাধা। গাছের মূল কাণ্ডে তারকাটা না লাগানো। কাগজে কিছু লিখে গাছের ডালে তা ঝুলিয়ে না রাখা। রোগ মুক্তির উদ্দেশ্যে সেখানকার পানির কূপ, পুকুর ও জলাশয় থেকে পানি সংগ্রহ করে না আনা।

নবী-রাসূল ও ওলীদের মর্যাদা প্রদান প্রসঙ্গে এ কথা মনে রাখা যে, তাঁদের মর্যাদা প্রদানের উদ্দেশ্যে শরী'আত আমাদেরকে যা করতে অনুমতি দেয়, কেবল তা করার মধ্যেই তাঁদের প্রকৃত সম্মান নিহিত রয়েছে। আর যা করতে নিষেধ করে তা করার মধ্যেই তাঁদের অসম্মান নিহিত রয়েছে। তাঁদের বা তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে যা করা নিষেধ তা তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের সম্মুখে করলে এতে যেমন তাঁরা অসন্তুষ্ট হতেন, তাঁদের মৃত্যুর পরেও তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে তা করলে এতে তাঁদের রূহ অসন্তুষ্ট হয়ে থাকবে।

নবী-রাসূল ও সৎ লোকদের সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে এ পর্যন্ত যা আলোচনা করা হলো, এটিই হচ্ছে তাঁদের সম্মান প্রদর্শনের বৈধ পন্থা। তাঁদের সম্মান প্রদর্শন করার সময় যারা তা লক্ষ্য করবে তারাই তাদের কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে এবং শির্ক ও বেদ'আতে লিপ্ত হওয়া থেকে নিজেদেরকে নিরাপদে রাখবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কবর নিজ গৃহে দেওয়ার কারণ :

ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানরা তাদের নবী ও সৎ মানুষদের কবর নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ সময়ে এদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত করে বলেছেন :

«لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، يُحَذِّرُوْا مَا صَنَعُوْا، وَلَوْ لاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدا».

"ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের উপর অল্লাহর অভিসম্পাত, তারা তাদের নবীগণের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়েছে, তারা যা করেছে তা করা থেকে তিনি তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেছেন। (আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন:) অদূর ভবিষ্যতে তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে এ জাতীয় কাজের ভয় না হলে তাঁর কবর ঘরের বাইরেই দেয়া হতো। তাঁর কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়ার ভয় হওয়ার কারণেই তিনি তাঁকে নিজ ঘরের ভিতরে দাফন করতে বলেছেন"।[১৮৩] এ হাদীস দ্বারা স্পষ্টতই বুঝা যাচ্ছে যে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাঁর পরবর্তী উম্মতদের

---

[183].বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জানইয, বাব : ২২, হাদীস নং- ৪২৫; ১/১৬৮; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল মাসাজিদ..., হাদীস নং- ৫৩১; ১/৩৭৭।

দ্বারা তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে আহলে কিতাবদের অনুরূপ কর্ম করার ব্যাপারে আশঙ্কিত ছিলেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা

وَلَوْ لاَ ذَلِكَ أُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ أَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدا

এ কথা বলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সে আশঙ্খার কথাই ব্যাক্ত করেছেন। তাঁর কবরকে নিয়ে যাতে কোনো রকম বাড়াবাড়ি করা না হয় সে-জন্য তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে সরাসরি নির্দেশ করে বলেছেন :

«لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْداً»

"তোমরা আমার কবরকে বাৎসরিক ঈদ (ওরস) বা মেলা পালনের স্থানে পরিণত করো না।"[১৮৪]

নবী বা সৎ মানুষদের কবরতো দূরের কথা তাঁদের কোনো নিদর্শন [آثار] নিয়ে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি করারও কোনো সুযোগ ইসলামী শরী'আতে স্বীকৃত নয়। সে কারণেই আমরা দেখতে পাই হুদাইবিয়া নামক স্থানের যে গাছের নিচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের জন্য তাঁর সাহাবীগণের বয়'আত গ্রহণ করেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর একান্ত করুণায় সে গাছ ও স্থানের পরিচিতিও মুসলিমদের অন্তর থেকে সম্পূর্ণভাবে মুছে দিয়েছিলেন। ইবন 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু

---

[184]. প্রথম অধ্যায়ের টীকা নং ১৬৩ দ্রষ্টাব্য।

থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : "আমরা সন্ধির শর্তানুযায়ী) পরবর্তী বছর ('উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাওয়ার পথে) হুদায়বিয়া নামক স্থানের যে গাছের নিচে আমরা বায়'আত গ্রহণ করেছিলাম, সে গাছটি নির্ধারণের ব্যাপারে (অনেক চেষ্টা করেও) আমাদের কোনো দু'জন ব্যক্তিও তা চিহ্নিত করার ব্যাপারে একমত হতে পারে নি। এ না পারাটি ছিল আল্লাহর একান্ত রহমতস্বরূপ।"[১৮৫]

ইবনে হাজার আসকালানী বলেন: "এ গাছটি নির্ধারণ করতে না পারার মধ্যে যে হিকমত নিহিত রয়েছে তা হলো : এ গাছের নিচে যে কল্যাণের কাজ হয়েছিল সেটাকে কেন্দ্র করে যাতে ভবিষ্যতে সেখানে কোনো ফেৎনার জন্ম না হয়, সে জন্যেই এ গাছটি আল্লাহ নির্ধারণ করতে দেন নি। কারণ; যদি তা জনগণের নিকট পরিচিত থেকে যেতো, তা হলে এ গাছটি জাহিল ও অজ্ঞ লোকদের তা'যীম ও সম্মান পাওয়া থেকে নিরাপদ থাকতো না। এমনকি জাহিলদের অজ্ঞতা তাদেরকে এ-গাছটি বিভিন্ন অসুখ-বিসুখ দূরীকরণে উপকারী হওয়ার ধারণায় পৌঁছে দিতো ...।"[১৮৬] সে গাছটি তখনকার সময়ে চিহ্নিত করা সম্ভবপর না হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তীতে খেলাফতে রাশেদার আমলেই আন্দাজ ও অনুমানের উপর নির্ভর করে লোকেরা সেখানকার একটি গাছকে কেন্দ্র করে

---

[185]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জিহাদ, বাব: ১০৯, হাদীস নং- ২৭৯৭;৩/১০৮০।

[186]. ইবনে হাজার আস-কালানী, ফতহুল বারী; ৬/১১৮।

অনেকটা বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে দিয়েছিল। নাফে' থেকে বর্ণিত যে, "'উমার এর নিকট এ মর্মে সংবাদ এসে পৌঁছলো যে, কিছু লোকজন সেই গাছের নিচে যাতায়াত করে যার নিচে বায়'আত গ্রহণ করা হয়েছিল। এ সংবাদ শুনে তিনি তা কেটে দেয়ার নির্দেশ করেন। ফলে তা কেটে ফেলা হয়।"[১৮৭] ইবন আবী শায়বাহ ও বুখারীর বর্ণনার মধ্যে বাহ্যিক কিছু বৈপরিত্য মনে হলেও আসলে দু' বর্ণনার মধ্যে কোনো বৈপরিত্য নেই। কারণ, গাছটিতো আসলে পরবর্তী বছরই চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয় নি; কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তীতে লোকেরা সেখানকার কোনো একটি গাছের ব্যাপারে অনুমানের ভিত্তিতে এ ধারণা করে নিয়েছিল যে, এটিই বোধ হয় সেই গাছ, যার নিচে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বায়'আত গ্রহণ করেছিলেন। এ ধারণার ভিত্তিতেই তারা সে গাছের নিচে যেতে আরম্ভ করেছিল। তবে 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু সে সম্ভাব্য গাছটিকেও কেটে দিয়ে ভবিষ্যতে এটাকে কেন্দ্র করে যে সব বেদ'আতী ও শির্কী কর্মকাণ্ড হওয়ার আশঙ্কা ছিল, সে সবের মূলোৎপাটন করেন।

---

[187]. শেখ আব্দুর রহমান ইবনে হাসান আলুস- শেখ, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৪৬। মুসনাদে ইবনে আবী শায়বাহ থেকে উদ্ধৃত।

মানুষকে সম্মান করা নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ধরন:

সৎ মানুষদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ধরন ও প্রকৃতি প্রসঙ্গে ড. ইব্রাহীম বরীকান বলেন : “কথা ও কাজের মাধ্যমে কারো প্রশংসা ও স্তুতি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে এর বৈধ সীমারেখা অতিক্রম করাকেই সৎ মানুষদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা (الغلو في الصالحين) বলা হয়”।[১৮৮] তিনি এ বাড়াবাড়িকে মোট দু’ভাগে বিভক্ত করেছেন :

প্রথম প্রকার : কথার মাধ্যমে কারো প্রশংসা ও প্রস্তুতি বর্ণনার ক্ষেত্রে এর বৈধ সীমারেখা অতিক্রম করা। এ সীমাতিক্রমটি আবার তিন ভাবে হতে পারে :

(ক) কারো প্রশংসা করতে গিয়ে তাঁকে আল্লাহ তা‘আলার রুবূবিয়্যাতের গুণাবলীর সাথে সম্পৃক্ত করে ফেলা। যেমন এ কথা বলা যে, তিনি বিপদ দূর করতে পারেন, কল্যাণ এনে দিতে পারেন, তিনি গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত ইত্যাদি। যারা আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত অপর কারো ব্যাপারে এ জাতীয় ধারণা পোষণ করে, তারা আল্লাহর (রুবূবিয়্যাতের) গুণাবলীতে একত্ববাদী বিশ্বাসী বলে বিবেচ্য হবে না।

---

188. ড. ইব্রাহীম বরীকান, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৭৪, ১৭৫।

কারণ, এ জাতীয় ধারণা তাওহীদী বিশ্বাসের পরিপন্থী ও শির্কে আকবার এর অন্তর্গত।"[১৮৯]

(খ) এমন সব কথা ও কাজ করা যা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী। যেমন কারো নামে শপথ করা, কথার মাধ্যমে কারো ইচ্ছা ও কামনাকে আল্লাহর ইচ্ছার সমতুল্য করে 'আল্লাহ ও আপনি যা চান' এমনটি বলা। এ জাতীয় কথা শির্কে আকবার এর পর্যায়ে না পড়লেও শির্কে আসগার এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা আল্লাহর একত্ববাদের পূর্ণতার পরিপন্থী।

(গ) এমন কোনো গুণে কাউকে গুণান্বিত করা যা শির্ক নয়, তবে তা সে গুণান্বিত ব্যাক্তির মধ্যেও নেই। যেমন কারো কৃপণ হওয়া সত্ত্বেও তাকে একজন বড় দানশীল হওয়ার গুণে গুণান্বিত করা। (যেমন কাউকে সত্যিকারের ওলি না হওয়া সত্ত্বেও তাকে 'অলিয়ে কামেল, অলিকুল শিরোমণি, পীরে কামেল, কিবলায়ে দু'জাহন ও হাদীয়ে জামান ইত্যাদি গুণে গুণান্বিত করা)। মিথ্যা কথা বলা হারাম ও নিকৃষ্ট কবিরা গুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে কাউকে মিছেমিছি

---

[189]. তদেব।

এরূপ গুণে গুণান্বিত করাও হারাম ও কবিরা গুনাহের অন্তর্গত কাজ।

দ্বিতীয় প্রকার : কর্মের মাধ্যমে কারো মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করা। এটি আবার চার ভাবে হতে পারে :

1. মানুষসহ সৃষ্টির যে কোনো বস্তুর সামনে রুকু ও সেজদা করা, তাকে আল্লাহর ন্যায় ভালবাসা, গোপন ভয় করা, গুনাহের কাজ করে কারো নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করা, কোনো বিষয়ে কারো উপর পূর্ণ ভরসা করা, নিঃশর্তভাবে কারো আনুগত্য ও অনুসরণ করা ইত্যাদি। এ জাতীয় কর্ম তাওহীদের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। কেননা, এ সব শির্কে আকবরের অন্তর্গত কাজ।
2. আল্লাহর উপাসনার উদ্দেশ্যে কারো কবর বা কবরে নামায পড়া, সেজদা করা, কুরআন তেলাওত ইত্যাদি করা এ ধারণার ভিত্তিতে যে, সেখানে এ সব কাজ করা উত্তম। এ জাতীয় কর্ম শির্কে আসগার এর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় তা তাওহীদের পূর্ণতার পরিপন্থী।
3. কারো মর্যাদা বাড়ানোর জন্য এমন কোনো কাজ করা যা শির্ক গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে শর'য়ী দৃষ্টিতে সে কাজটি হারাম। যেমন কারো কবর পাকা করা, তাতে স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা ও নাম লেখা ইত্যাদি কর্ম। এ জাতীয় কাজ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাত বিরোধী হওয়ায় তা বেদ'আতের অন্তর্গত।

4. সৎ মানুষদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করার প্রসংগ নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী (মৃত ১৯৯৯ খ্রি.) বলেন: "যে সকল মাধ্যম বিলম্বে হলেও জনগণের শির্কের মত অমার্জনীয় অপরাধে নিমজ্জিত করার কারণ হবার আশঙ্কা রয়েছে, হিকমত চায় যে, সে সকল মাধ্যমও নিষিদ্ধ করা হোক। আর সে-জন্যেই কবরের উপর মসজিদ নির্মাণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অনুরূপভাবে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে দূর-দূরান্তে সফর করতে, কবরকে মেলার (ওরসের) স্থান বানাতে ও কবরবাসীদের নামে শপথ করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, এ সব কর্মই কবরকে নিয়ে বাড়াবাড়ি ও কবরকে পূজা করার দিকে পৌঁছে দেয়। বিশেষ করে যখন মানুষের জ্ঞান লোপ পেয়ে অজ্ঞতা বেড়ে যায় এবং উপদেশ দানকারীদের সংখ্যা কমে যায়, তখনকার কথাতো বলা-ই বাহুল্য।"[১৯০]

---

[190]. মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আলবানী, তাহযিরুস সাজিদ 'আন ইত্তেখা-যিল কুবূরি মাসাজিদা; (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০২হিজরী), পৃ. ১৫৪, ১৫৫।

বস্তুত সৎ মানুষদের সম্মান ও মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষেরা তাদের বিশ্বাস, কথা ও কর্মের মাধ্যমে যে সব বাড়াবাড়ি করে, সে বাড়াবাড়িই হচ্ছে অতীত ও বর্তমান কালের সকল দেশের সাধারণ মানুষদের- বিশেষ করে আউলিয়া ও দরবেশগণের কবর ও কবরসমূহে যারা গমনাগমন করে এবং সেখানে যারা বার্ষিক ওরস পালন করে তাদের- পথভ্রষ্ট হওয়ার মূল কারণ। ধর্ম ও সৎ মানুষদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করার ক্ষেত্রে শরী‘আতের সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা ও সতর্কবাণী থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মুসলিমদেরকে এ ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করতে দেখা যায়। মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-যা যা করতে নিষেধ করেছেন, এর কোনটিই করা থেকে তারা বিরত হয় নি। এটিই হচ্ছে সকল স্থান ও কালে মুশরিক ও বেদ‘আতীদের চিরাচরিত অভ্যাস। রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- সাধারণ মুসলিমদের ব্যাপারে এ ভয় করেছিলের যে, তারা তাঁর সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করবে, তাঁকে তাঁর উপযুক্ত মর্যাদায় সমাসীন না করে তাতে অতিরঞ্জিত করতে চাইবে, তাঁর কবরকে বার্ষিক ওরস ও মেলা বসানোর স্থানে পরিণত করবে। এই আশঙ্কায় তিনি তাঁর সাথীদের এ-সব করা থেকে নিষেধ করে বলেছেন:

«لاَ تَطْرُوْنِيْ كَمَا أَطَرَتِ النَّصَارَى فِيْ عِيْسَى بْنِ مَرْيَم،وَلَكِنْ قُوْلُوْا عَبْدُ اللهِ وَرَسُوْلُهُ»

"খ্রিস্টানরা ঈসা ইবন মারইয়াম আলাইহাস সালামকে নিয়ে যেরূপ বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমাকে নিয়ে সেরূপ বাড়াবাড়ি করো না, তোমরা বরং আমার ব্যাপারে বলো: আমি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।"[১৯১]

অনুরূপভাবে তিনি তাঁর সাহাবীদেরকে তাঁর কবরকে বার্ষিক ওরস বা মেলা বসানোর স্থানে পরিণত করতেও নিষেধ করে বলেছেন:

«لاَ تَجْعَلُوْا قَبْرِيْ عِيْدًا»

"তোমরা আমার কবরকে কোনো প্রকার ওরস বা মেলা বসানোর স্থানে পরিণত করো না"।[১৯২]

কিন্তু এ সব নিষেধের বাণীসমূহ থাকা সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যায়।

বিভিন্ন ওলীদের কবর ও কবরকে কেন্দ্র করে মুসলিমরা যা করেন, তা দেখে মনে হয় যে, তারা যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[191]. ইমাম আহমদ, প্রাগুক্ত; ১/৪৭। 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে হাদীসটি বর্ণিত।

[192]. প্রথম আধ্যায়ের ১৬৩ নং টীকা দ্রষ্টাব্য।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা মুবারক আমাদের দেশে পেতো, তা হলে সেখানে তারা সেই সব কাজই করতো যা তাঁর কবরকে কেন্দ্র করে করা থেকে তিনি আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তাদেরকে এ সব কর্ম করা থেকে কেউ বারণ করলে নবী প্রেমের[193] মিথ্যা দাবীতে তারা এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতো। প্রয়োজনে এ জন্য তারা আত্মাহুতিও দিতো। তবে আল্লাহ তা'আলার অপার রহমত যে, তিনি তাঁর নবীর কবরকে এ রকমের মিথ্যা প্রেমিক!দের নানাবিধ অপকর্মের হাত থেকে হেফাযত করেছেন।

দ্বিতীয় কারণ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এবং ওলিগণ কে বৈশিষ্ট্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা :

মহান আল্লাহর গুণগত যে নিরানববইটি নাম রয়েছে সে সব নামের সম্পর্ক হচ্ছে তাঁর রুবূবিয়্যাতের সাথে। আল্লাহর এ সব গুণ থাকার কারণেই তিনি আমাদের রব। সে সব বৈশিষ্ট্যের মাঝে রয়েছে তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ বা গায়েবের জ্ঞানী, সর্ব দ্রষ্টা, সকল কল্যাণ ও অকল্যাণকারী ...ইত্যাদি। এ সবের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো

---

[193] প্রেম শব্দটি আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের জন্য মোটেই মানানসই শব্দ নয়। তাঁদের জন্য এটি ব্যবহার করা বেয়াদবী। কারণ, প্রেম শব্দটি বিপরীত লিঙ্গ অথবা জড় পদার্থের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। [সম্পাদক]

শরীক না থাকা সত্ত্বেও অনেক মুসলিমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ওলিদের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলে মনে করে থাকেন। অথচ এ সব বিষয়াদি আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের সাথে সম্পর্কিত হওয়ায় কোনো সৃষ্টির বেলায় এমন ধারণা করা তাঁর রুবূবিয়্যাতে শির্ক করার শামিল। ওলীদের ব্যাপারে এ-জাতীয় অতিরঞ্জিত ধারণা করাই মুসলিমদের শির্কে পতিত হওয়ার জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। সে জন্যে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী মুসলিমদের মাঝে শির্ক চালু হওয়ার জন্য এ ধারণাকেই মৌলিকভাবে দায়ী করেছেন। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

"মুশরিকরা মনে করে ওলিগণ অধিক তপস্যা করার ফলে মহান আল্লাহ তাঁদেরকে তাঁর উলূহিয়্যাতের পর্দা উন্মোচন করে দেন অথবা অধিক তপস্যা করে তাঁরা তাঁর জাতসত্তার মধ্যে ফানা হয়ে যাওয়ার কারণে এমন সব কামালিয়াতের বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হন, যা কেবলমাত্র মহান আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। তাঁরা এ ধরনের কামালিয়াতের অধিকারী হয়ে

থাকেন বলেই তাঁদের দ্বারা বিভিন্ন রকমের কারামত বা আশ্চর্যজনক বিষয়াদি সম্পাদিত হয়।"[১৯৪]

তৃতীয় কারণ : বস্তুর সাথে লাভ ও ক্ষতির সম্পর্ককরণ :

কোনো বস্তুকে আল্লাহর ইচ্ছায় উপকারী বা অপকারী এমনটি না বলে সরাসরি সে বস্তুকেই উপকারী বা অপকারী বলা। কেননা, উপকার বা অপকার করা তাঁর রুবুবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত বিষয়।

চতুর্থ কারণ : নিম্ন জগতের উপর উধর্বজগতের গ্রহ নক্ষত্রের প্রভাবে বিশ্বাসী হওয়া :

মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে মহাকাশের গ্রহ ও তারকার প্রভাবে

---

[194]. শির্কের হাকীকত বর্ণনা প্রসঙ্গে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী যা বলেছেন, উক্ত কথাগুলো তাঁর সে কথারই সারমর্ম। তিনি এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

إن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس الأثار العجيبة الصادرة منه إنما صدرت لكونه متصفا بصفة من صفات الكمال ، مما لم يعهد في جنس الإنسان ، بل يختص بالواجب جل مجده ، لا يوجد في غيرة ، إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره ، أو يفني غيره في ذاته و يبقى بذاته أو نحو ذلك ، مما يظنة هذا المعتقد من أنواع الخرافات .

দেখুন : শাহ ওয়ালী উল্লাহ, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ; (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), ১/৬৭।

বিশ্বাসী হওয়া।

পঞ্চম কারণ : আল্লাহর উপাসনায় ওলিগণকে শরীক করা :

মহান আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব ও তা'যীম প্রদর্শনের জন্য তিনি আমাদের মুখ, দেহ ও অন্তরের উপর যে সব প্রকাশ্য ও গোপন উপাসনা ফরয হওয়ার কথা এ বই এর প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে, অনেক মুসলিমদের সে সব উপাসনায় ওলিগণ কে শরীক করতে দেখা যায়।

ষষ্ঠ কারণ : ওলিগণ কে আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী ও শাফা'আতকারী হিসেবে মনে করা :

অলিগণের অনেক ভক্তরা মনে করে থাকেন যে, ওলিগণ আল্লাহর অধিক আরাধনা করার ফলে কামালিয়্যাতের উঁচু স্তরে পৌঁছে থাকেন। সে সময় প্রেসিডেন্ট যেমন সাধারণ মানুষদের কথা-বার্তা শ্রবণের জন্য মন্ত্রীদের মধ্যস্থতা অবলম্বন করেন, তেমনি আল্লাহও সাধারণ মানুষের কথা-বার্তা শ্রবণের জন্য ওলিগণ কে তাঁর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ওসীলা বা মাধ্যম হিসেবে নিয়োগ করেন। তাঁদের শাফা'আতের মাধ্যমে তাদের সমস্যাদি আল্লাহর নিকট উপস্থাপন করলে তিনি তাঁদের মর্যাদার খাতিরে দ্রুতগতিতে তা মঞ্জুর করেন। প্রথম অধ্যায়ে পরিচালনাগত শির্ক এর বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা এ-কথা প্রমাণ করে

দেখিয়েছি যে, ওলিদের ব্যাপারে এ-জাতীয় ধারণা করা আল্লাহ তা‘আলার পরিচালনা কর্মে তাঁদেরকে শরীক বলে ধারণা করার শামিল।

উল্লেখ্য যে, শয়তান সাধারণ মুসলিম জনমনে উক্ত ধরনের ওসীলা ও শাফা‘আতের ধারণা সৃষ্টি করে দিয়ে এ দু’টিকে কেন্দ্র করেই তাদেরকে আল্লাহর উলূহিয়্যাতের ক্ষেত্রে নানা রকম প্রত্যক্ষ শির্কী কর্মে লিপ্ত করেছে। তাঁদের ওসীলা ও শাফা‘আতে দুনিয়াবী কল্যাণ অর্জিত হয় এবং অকল্যাণ দূরীভূত হয়- এমন ধারণা দিয়ে একদিকে যেমন ওলিগণ কে উপাস্যে পরিণত করেছে, অপর দিকে তেমনি তাঁদের কবর ও কবরসমূহকে মসজিদের বিকল্প একেকটি উপাসনালয় হিসেবে দাঁড় করেছে। তাই তাদের অনেকেই মসজিদের পরিবর্তে কবরে যেয়ে থাকেন এবং সরাসরি আল্লাহর কাছে তাদের প্রয়োজন পূরণের কথা না বলে কেউ বা কবরস্থ ওলির নিকটেই তা কামনা করে। আবার কেউবা তাঁর মাধ্যমে তা পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে আবেদন করে থাকেন। এভাবে তারা আরবের মুশরিকদের ন্যায় ওলিদেরকেই সাহায্যের জন্য নিকট ও দূর থেকে আহ্বান করে থাকেন। অথচ এ ধরনের আহ্বান করাকে মহান আল্লাহ শির্কী কর্ম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثۡلُ خَبِيرٖ ١٤ ﴾ [فاطر: ١٤]

"তোমরা যদি তাদেরকে (সুপারিশের জন্য) আহ্বান কর, তা হলে তারা তোমাদের আহ্বান শুনবে না, আর শুনলেও তারা তোমাদের ডাকের কোনো জবাব দিবেনা।"

কুরআনের তর্জমা খুলে দেখুন।[১৯৫] এ আয়াতে বর্ণিত সর্বশেষ কথার দ্বারা তাদের এ আহ্বানকে শির্কী কর্ম হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, যারাই এভাবে কাউকে আহ্বান করবে, তারা মুশরিক হিসেবে গণ্য হবে।

সপ্তম কারণ : পীর ও মুরববীদের কথা-বার্তা ও নাসীহাতপূর্ণ বাণীসমূহের অন্ধ অনুসরণ ও অনুকরণ:

কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের নিঃশর্ত অনুসরণ করা হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার উপাসনা। যারা সাধারণ মানুষ তারা অবশ্য কোনো পীর, আলিম বা মুরববীর কথা সঠিক হওয়ার ধারণার ভিত্তিতে অনুসরণ করবে। তবে কোনভাবেই অন্ধভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে না। যখনই তাঁদের কোনো নাসীহাতের কথা কুরআন ও সহীহ সুন্নাহের বিপরীতে রয়েছে বলে জানতে পারবে, তখনই তা পরিহার করে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর কথাই পালন

195. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির : ১৪।

করবে-এ মর্মের মানসিকতা অন্তরে লালন করেই তাঁদের অনুসরণ করবে। কিন্তু শয়তান অনেক সাধারণ মুসলিমদেরকে তা না করে নিজ নিজ পীর ও মুরববীদের হেদায়াতী কথা-বার্তা অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করতে শিখিয়েছে। যার ফলে তাদের অনেকেই নিজে পড়াশুনা করে কোনো ভুল কর্মের সন্ধান পেলে বা কেউ তাদেরকে কোনো ভুলের সন্ধান দিলে তারা তা সংশোধন করেন না। অথচ কারো এ রকম অনুসরণ করা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপাসনা করার শামিল।

অষ্টম কারণ : ইমামগণের ইজতেহাদী উক্তিসমূহ পালনের ক্ষেত্রে শরী'আতের সীমালঙ্ঘন করা :

কোন বিষয়ে মতবিরোধ হলে তা নিরসনের জন্য কারো ইজতেহাদী মতামতকে অন্ধভাবে গ্রহণ না করে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দিকে প্রত্যাবর্তন করাই হচ্ছে জ্ঞানীদের প্রতি শরী'আতের নির্দেশ। কিন্তু অনেক আলেমগণ তা না করে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে চোখ বন্ধ করে কোনো একজন মহামান্য ইমামের ইজতেহাদী মতামতকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। কোনো বিষয়ে 'নস' থাকা সত্ত্বেও তা কোনো ইমামের নিকট না পৌঁছার কারণে বা কোনো অনির্ভরযোগ্য সনদে তাঁর নিকট তা পৌঁছার

কারণে তিনি হয়তো তা গ্রহণ না করে থাকতে পারেন।[১৯৬] কোনো বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদের এ জাতীয় কারণ থাকা সত্ত্বেও তা বিচারে না এনে নির্দিষ্ট করে কোনো একজনের যাবতীয় ইজতেহাদী মতকে অন্ধভাবে গ্রহণ করা প্রকারান্তরে তা ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদের ন্যায় ইমামগণকে একাধিক রব বানিয়ে নেয়ার সমতুল্য।

নবম কারণ : দো‘আ করার সময় ওসীলা গ্রহণের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা:

কোন জীবিত মানুষকে দো‘আ করতে বলা বা কোনো জীবিত মানুষের দো‘আর ওসীলা গ্রহণ করা বৈধ ওসীলার একটি প্রকার। তবে দো‘আর মাঝে কোনো নবী, ওলি বা জীবিত অথবা মৃত কোনো মানুষের নাম মুখে উচ্চারণ করে তাঁদের জাতসত্তা কিংবা মর্যাদা ও হুরমত এর ওসীলায় বা খাতিরে আল্লাহ তা‘আলার কাছে

---

[196]. কোন বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ হওয়ার পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে উক্ত দু’টি কারণ উল্লেখযোগ্য। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাঃ (রহ.) কর্তৃক রচিত ‘রফউল মালাম ‘আন আইম্মাতিল আ‘লাম’ ও শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) কর্তৃক রচিত ‘আল-ইনসাফ ফী মাসাইলিল খিলাফ’ কিতাব দু’টি দেখা যেতে পারে। (উল্লেখ্য, প্রথম গ্রন্থটি আপনি এ ওয়েবসাইটেই পাবেন। [সম্পাদক])

নিজের ইহ-পরকালীন কোনো কল্যাণ কামনা করে দো'আ করার বিষয়টি কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা স্বীকৃত নয়। এ জাতীয় ওসীলা অবৈধ। ওসীলাকারীর অন্তরের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা শির্ক হতে পারে। এ জাতীয় ওসীলা অবৈধ ও শির্কপূর্ণ হওয়ার কারণ নিম্নরূপ :

ক) কারো নিকট থেকে কোনো বস্তু চাওয়ার সময় তৃতীয় কোনো মানুষের নাম ও মর্যাদার ব্যবহার কেবল তখনই বৈধ হতে পারে যখন সে মানুষটি জীবিত থাকে এবং তার নাম ব্যবহারের জন্য লিখিত বা মৌখিকভাবে তার সম্মতি প্রদান করে। অন্যথায় এমনটি করা সাধারণত একটি অনৈতিক ও অবৈধ কর্ম হিসেবে বিবেচ্য হয়ে থাকে। নবী ও ওলিগণ মরে যাওয়ার কারণে যেহেতু কারো কোনো বিষয়ে তাঁরা তাঁদের সম্মতি প্রদান করতে পারেন না, তাই তাঁদের নাম, মর্যাদা ও হুরমতের ওসীলায় আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া বৈধ হতে পারে না।

(খ) মানুষেরা পরস্পরের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকায় একে অন্যের জন্য ওসীলা হতে পারে; কিন্তু আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী না থাকায় তিনি কারো নাম, মর্যাদা ও হুরমতের কথা কারো মুখে শুনে কিছু করবেন, তা আশা করা যায় না।

(গ) নবী ও অলিগণের নাম ও মর্যাদার ওসীলায় আল্লাহর কাছে নিজের জন্য কিছু চাওয়া আর ‘অমুক ব্যক্তিকে অমুক বস্তু দিয়েছেন, তাই আমাকেও অমুক বস্তুটি দিন’ এমন কথা বলার শামিল। এমন আবদার একজন মানুষের কাছে করা যেমন অগ্রহণযোগ্য ও অসৌজন্যমূলক বিবেচিত হয়ে থাকে, তেমনি এমন আবদার আল্লাহ তা‘আলার কাছেও অগ্রহণযোগ্য ও অসৌজন্যমূলক আচরণ বলে বিবেচিত হবে।

(ঘ) আল্লাহর কাছে নবী ও অলিগণের যে মর্যাদা রয়েছে তা তাঁদের জন্যেই। এর সাথে অপর কারো মর্যাদা লাভের বা কারো কোনো প্রয়োজন পূরণের কোনই সম্পর্ক নেই। তাঁদের নাম ও মর্যাদা ও হুরমতের ওসীলায় কিছু পেতে চাওয়া চুরি করে একজন সৎ ও ন্যায় বিচারকের নাম ব্যবহার করে চুরির দণ্ড থেকে রেহাই পাবার অপচেষ্টা করার শামিল।

(ঙ) আল্লাহর নিকট কিছু চাইতে হলে কোনো সৎকর্মের ওসীলা করে বা কিছুর ওসীলা ছাড়াই তাৎক্ষণিক তা চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু চাওয়ার সময় মুখে কারো নাম ও মর্যাদার কথা আল্লাহকে শুনানো কোনো সৎ কর্ম নয়। তাই তা কোনো ওসীলা হতে পারে না।

(চ) কারো কাছে কারো নাম ব্যবহার করে কিছু চাওয়ার অর্থ হচ্ছে সে ব্যক্তিকে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত করা এবং তাকে প্রভাবিত করেই বৈধ বা অবৈধ কোনো কাজ আদায় করে নেয়া। মানুষ মানুষের দ্বারা প্রভাবিত হয় বলেই মানুষের মাঝে এমন ওসীলার প্রচলন রয়েছে। তবে আল্লাহর ব্যাপারে এমন ধারণা করা তাঁর পরিচালনা কর্মে শির্ক করার শামিল। আরবের মুশরিকরা আল্লাহর কাছে তাদের দেবতাদের অনেক মর্যাদা রয়েছে বলে মনে করেই তারা তাদের দেবতাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম বা ওসীলা বলে মন করতো। যে সকল মুসলিমরা অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে দো'আ করার সময় নবী ও অলিগণের নাম, মর্যাদা ও হুরমতের ওসীলায় দো'আ করেন, তারা প্রকারান্তরে আরবের মুশরিকদের ন্যায় আচরণ করেন এবং নবী ও অলিগণের মর্যাদার দ্বারা আল্লাহকে প্রভাবিত করে এর মাধ্যমে নিজেদের ইহ-পরকালীন কল্যাণ অর্জন করতে চান। ওসীলার বিষয়টিকে নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি হয়েছে বলেই এ অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত আলোচনা করবো ইন-শাআল্লাহ।

দশম কারণ : অলিগণের শাফা‘আত সম্পর্কে বাড়াবাড়ি :

মুশরিকরা যেমন তাদের কতিপয় সৎ মানুষ ও ফেরেশ্তাদের নামে নির্মিত মূর্তিসমূহকে আল্লাহর নিকট শাফা‘আতকারী মনে করে তাদেরকে ইহকালীন প্রয়োজন পূরণে শাফা‘আতের জন্য আহ্বান করতো, অনেক মুসলিমরাও তেমনি ওলি ও পীরগণকে অনুরূপ ধারণার ভিত্তিতে ইহ-পরকালীন প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রে শাফা‘আতের জন্য আহ্বান করে থাকেন। তারা আরো মনে করেন যে, তাঁরা মরেও মরেন নি, বরং স্থান পরিবর্তন করেছেন মাত্র[১৯৭]। তাঁরা রূহানী শক্তিবলে অদৃশ্য সম্পর্কে অবগত হতে পারেন। দূর ও নিকট থেকে কেউ তাঁদেরকে শাফা‘আতের জন্য আহ্বান করলে তাঁরা তা শুনতে পান। আখেরাতে আল্লাহর কোনো অনুমতি ছাড়াই তাদেরকে তাঁরা শাফা‘আত করে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন বলেও তারা মনে করেন। অথচ তাঁদের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করা আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে শির্কের শামিল। যেহেতু শাফা‘আত সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে সাধারণ জনগণ শাফা‘আতকে কেন্দ্র করে শির্কে

---

[197]. সম্ভবত: তারা এ জন্যই মারা গেছেন না বলে ‘ইন্তেকাল করেছেন’ বলে থাকেন। সুতরাং আমাদেরকে এ বিদ‘আতী শব্দটি ত্যাগ করা উচিত। [সম্পাদক]

নিমজ্জিত হচ্ছে, সে-জন্য এ অধ্যায়ের তৃতীয় পরিচ্ছেদে শাফা'আত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

একাদশ কারণ : ওলিদের নিকট কল্যাণ কামনা করা এবং তাঁদের অকল্যাণের গোপন ভয় করা:

সকল কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক এককভাবে আল্লাহ তা'আলা হওয়া সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন যে, আল্লাহ তা'আলা ওলিগণকে ছোট ছোট অনেক কল্যাণ ও অকল্যাণের মালিক বানিয়ে দিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী তারা তাঁদের নিকট তা কামনা করেন। কবরস্থ গাছ, পুকুর ও কূপের পানি এবং জীব-জন্তুকে ওলি বা ওলির কবরের সাথে সংশ্লিষ্টতার কারণে সেগুলোকে বরকতপূর্ণ মনে করে এর দ্বারা বিভিন্ন প্রকার রোগ থেকে মুক্তি কামনা করেন। ওলিদের কবরকে গোপনে ভয় করেন। ওলির অকল্যাণের ভয়ে কবরের গাছ বা গাছের ডাল কাটলে সমূহ ক্ষতির আশঙ্কা করেন। দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ভয়ে কবরের পার্শ্ব দিয়ে যাওয়ার সময় গাড়ি ধীর গতিতে পরিচালনা করেন।

দ্বাদশ কারণ : কবরের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা :

একজন মুসলিমের কবরের সম্মান প্রদর্শনের শরী'আত স্বীকৃত পন্থা হচ্ছে-শর'য়ী কোনো ওজর ব্যতীত এর উপর দিয়ে বিচরণ না করা, এর উপরে না বসা, এর উপর প্রস্রাব-পায়খানা না করা, চতুষ্পদ জন্তু এর উপর বিচরণ করতে না দেয়া। কোনো

কবর এককভাবে থাকলে ভবিষ্যতে যাতে তা কবর হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, সে জন্যে এর চার পার্শ্বে বেড়া বা দেয়াল নির্মাণ করা। কোনো অবস্থাতেই কবরকে দুনিয়াবী কল্যাণ ও বরকত গ্রহণের স্থান হিসেবে গণ্য না করা। এর উপর বা এর চারপার্শ্বে মসজিদ নির্মাণ না করা। কিন্তু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে সাধারণ মুসলিমগণ এর বিপরীতে ওলিদের কবরকে সম্মান দেখাতে যেয়ে তাকে প্রথমে বরকত গ্রহণের স্থানে পরিণত করেছে। পরে সেখানে মসজিদ বানিয়ে নামায, কুরআন তেলাওয়াত ও অবস্থান গ্রহণ করাসহ আরো বিভিন্ন রকমের উপাসনা করতে শিখিয়েছে। কবরের প্রাঙ্গণকে ওলির কারণে বরকত গ্রহণের স্থান হিসেবে মনে করে এর সংলগ্ন গাছ, মাটি, কূপ বা পুকুরের পানি, মাছ ও অন্যান্য জীব-জন্তুকে উপকারী মনে করে তাথেকে বরকত গ্রহণ করতে শিখিয়েছে। অথচ আল্লাহর উপাসনার জন্য কবর কোনো উপাসনালয় না হওয়াতে কোনো কবরের পার্শ্বে বসে কবরস্থ ওলির সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা প্রকারান্তরে সে অলিরই উপাসনার শামিল। আর কোনো বস্তুর দ্বারা উপকার পাবার বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন হওয়া সত্ত্বেও সে বস্তুর দ্বারা উপকারের বিষয়কে কবরস্থ ওলির সাথে সম্পর্কযুক্ত করার কারণে তা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্কের শামিল।

ত্রয়োদশ কারণ : রাজনৈতিক নেতাদের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করা :

শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অনেক সাধারণ মুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের অন্ধভাবে অনুসরণ ও আনুগত্য করে থাকেন। তাদের মধ্য থেকে কে তাদেরকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান করছে আর কে মানব রচিত বিধান প্রতিষ্ঠার দিকে আহ্বান করছে, তা বিচার না করেই তারা তাদের আনুগত্য করে থাকেন। অথচ এ ধরনের অন্ধ আনুগত্য আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্কের শামিল।

চতুর্দশ কারণ :

কোন কোনো রোগ ব্যাধি আল্লাহর ইচ্ছায় অন্যের দিকে সংক্রমিত হয়। সে সংক্রমণকে আল্লাহর ইচছার সাথে সম্পর্কিত না করে রোগকেই নিজ থেকে সংক্রমিত হয় বলে বিশ্বাস করা বা এমনটি বলা।

উপর্যুক্ত এ সব কারণ ছাড়াও শির্ক সংঘটিত হওয়ার জন্য আরো কিছু প্রত্যক্ষ কারণ রয়েছে, যা মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত শির্কসমূহ অধ্যয়ন করলে যে কেউই তা শির্কের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারবে। এ সব কারণসমূহের প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিমদের মাঝে শির্ক সংঘটিত হওয়ার পিছনে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ যে সব কারণ রয়েছে সেগুলোর

সাথে ইসলাম পূর্বযুগের ধর্মপ্রাণ মানুষের মাঝে শির্ক সংঘটিত হওয়ার কারণসমূহের সাথে বহুলাংশে মিল রয়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ওলিগণ কি মানুষ ও আল্লাহর মাঝে ওসীলা বা মধ্যস্থতাকারী?

জাহেলী যুগে আরবের মুশরিকদেরকে শয়তান বিভিন্ন রকমের ধ্যান-ধারণা দেয়ার মাধ্যমে শির্কে লিপ্ত করেছিল। তাদেরকে যে সব ধ্যান-ধারণা দিয়েছিল তন্মধ্যে অন্যতম একটি ধারণা এমন দিয়েছিল যে, আল্লাহর ওলি ও ফেরেশ্তাদের নামে তাদের যে সব দেব-দেবী রয়েছে সেগুলো আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী। এদের মধ্যস্থতা গ্রহণ করলে অতি সহজে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায়। আবার এদের মধ্যস্থতা পেতে হলে এদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে হয়। সে জন্যে তারা এদের উদ্দেশ্যে মানত করতো। এদের কাছে অবস্থান করতো। সাহায্যের জন্য এদেরকে আহ্বান করতো। তারা যে এদের মধ্যস্থতা পাওয়ার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ জাতীয় উপাসনা করতো সে সম্পর্কে তারা নিজেরাই বলতো :

﴿مَا نَعۡبُدُهُمۡ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلۡفَىٰٓ ﴾ [الزمر: ٣]

“আমরা তাদের উপাসনা করছি কেবল এ জন্য যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী করে দেবে।”[১৯৮]

---

[198]. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৩।

মুশরিকদের এ কথার দ্বারা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, তারা যে সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিভিন্ন দেব-দেবীর উপাসনা করতো, তন্মধ্যে এদের ওসীলায় আল্লাহর নিকটবর্তী হতে চাওয়া তাদের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। কালের পরিক্রমায় ওলীদের ব্যাপারে শয়তান বহু মুসলিমদের অন্তরেও এ জাতীয় ধারণার জন্ম দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, তাদেরকে আরো ধারণা দিয়েছে যে, তাঁদের মাধ্যমে মানুষেরা তাদের জীবনের ছোট ছোট বিষয়াদি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। পৃথিবীর নিয়ম-শৃঙ্খলা তাঁদের মাধ্যমেই পরিচালিত হয়ে থাকে। আল্লাহ তাঁদের মাঝ থেকে কতিপয় ব্যক্তিকে আবদাল, আওতাদ, আবরার, গাউছ ও কুতুব... ইত্যাদি প্রশাসনিক পদে নিয়োগ দিয়ে থাকেন।[১৯৯] আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.) আল্লাহর পক্ষ থেকে গউছ খেতাব পেয়েছিলেন বলেই তাঁকে গউছুল আ'জম বলা হয়ে থাকে। একই কারণে চট্রগ্রামের মাইজভাণ্ডারের আহমদুল্লাহ মাইজভাণ্ডারীকেও গউছুল আ'জম বলা হয়। প্রেসিডেন্টের কাছে মন্ত্রীদের যেরূপ মর্যাদা থাকে, আল্লাহ তা'আলার নিকট তাঁদের সে রকম মর্যাদা রয়েছে। জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি উপস্থাপনের ক্ষেত্রে মন্ত্রীরা যেমন প্রেসিডেন্টের মাধ্যম

---

[199]. লেখকের মূল কথার উদ্ধৃতি এ বই এর প্রথম অধ্যায়ের ২৫ নং টীকায় প্রদান করা হয়েছে। দেখুন : দৈনিক ইনকিলাব, ২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ খ্রি., পৃ.৬।

হয়ে থাকেন, তেমনি আল্লাহর নিকট সাধারণ মানুষের সমস্যাদি উপস্থাপন করা, তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়ে দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় সুপারিশ করা এবং তাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়ার ক্ষেত্রে ওলিগণ হলেন আল্লাহর মাধ্যম বা ওসীলা ! [নাউযুবিল্লাহ]

মানুষের জীবনের ইহলৌকিক সমস্যা ও তা সমাধানের মাধ্যম:

মানুষের জীবনের সমস্যাদি মোট দু'ভাগে বিভক্ত :

এক, জীবন ও জীবিকার সমস্যা। দুই, পরকালীন সমস্যা। প্রতিটি মানুষই পৃথিবীতে ভাল জীবন ও জীবিকা পেতে চায় এবং প্রতিটি মু'মিন মাত্রই আখেরাতে শান্তিময় জীবন লাভ করতে চায়। পৃথিবীতে ভাল জীবন ও জীবিকা লাভের বিষয়টি মানুষের ভাগ্যের সাথে সম্পর্কিত। ভাগ্য নির্ধারণ সম্পর্কে আমরা এ বই এর প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। তাই এখানে এ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে কিছু না বলে সংক্ষেপে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, আল্লাহর ইনসাফ ও বিচারে যে মানুষকে যে জীবন ও জীবিকা প্রদান করা উচিত ও তার জন্য মঙ্গলজনক বলে তিনি মনে করেছেন, তাকে তিনি সে জীবন ও জীবিকা প্রদানের পরিকল্পনা পূর্ব থেকেই করে রেখেছেন। প্রতিটি মানুষের ভাগ্যে

কী জীবন ও জীবিকা রয়েছে তা খতিয়ে দেখার মাধ্যম সে নিজেই। সুস্থ জীবন ও উত্তম জীবিকা লাভ করার জন্য তাকে শরী'আতসম্মত বৈধ উপায় ও পন্থায় প্রয়োজনীয় কর্ম করতে হবে। যে সকল কর্ম করার ক্ষেত্রে জীবিত মানুষেরা একে অন্যের স্বাভাবিকভাবে কর্ম বা দো'আ করার মাধ্যমে সাহায্য করতে পারে, সে সকল ক্ষেত্রে অন্যের কর্ম বা দো'আর সাহায্য নেয়া যেতে পারে। এ ধরনের ক্ষেত্রে নিজে ও প্রয়োজনে অন্য জীবিত মানুষের সাহায্য নিয়ে কর্ম করে কর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য সর্বদা আল্লাহর কাছেই তাঁর দয়া কামনা করতে হবে। ধৈর্যের সাথে যাবতীয় সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। ভাগ্য পরিবর্তনে বিলম্ব হচ্ছে দেখে কোনো অবস্থাতেই ধৈর্যহারা হয়ে কোনো বিকল্প পথে ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করা থেকে বিরত থাকতে হবে। কোনো পীর, ফকীর ও ওলির কবরে এ জন্য কোনো আবেদন-নিবেদন করা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, ভাগ্যে সুস্থ জীবন, সন্তান ও উত্তম জীবিকা লেখা থাকলে বৈধ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে তা আজ হোক কাল হোক, পাওয়া যাবেই। কেউ হাজার ষড়যন্ত্র করেও তা ঠেকাতে পারবে না। আর ভাগ্যে তা লেখা না থাকলে সারা দুনিয়ার জীবিত ও মৃত মানুষেরা সাহায্য ও দো'আ করলেও তা পাইয়ে দিতে পারবে না। বৈধ পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে ভাগ্য পরিবর্তিত হলে তা যেমন আল্লাহরই

দান হয়ে থাকবে, তেমনি অবৈধ পন্থা অবলম্বনের পর তা পরিবর্তিত হলে তাও আল্লাহরই দ্বারা হয়ে থাকবে। দুয়ের মাঝে পার্থক্য এটুকু যে, যারা বৈধ পন্থা অবলম্বন করে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করে, তারাই হবে প্রকৃত মু'মিন ও আল্লাহর প্রিয়ভাজন বান্দা। আর যারা অধৈর্য হয়ে কবর ও কবরে যেয়ে রোগ মুক্তি, সন্তান দান ও উত্তম জীবিকা ইত্যাদি চাইবে, তারা হবে মুশরিক ও আল্লাহর বিরাগভাজন।

পরকালীন সমস্যা সমাধানের মাধ্যম:

এ ক্ষেত্রে শরী'আতের একক শিক্ষা হলো : ঈমান ও সৎ 'আমলই হচ্ছে মানুষের পরকালীন সমস্যা সমাধানের একক মাধ্যম বা ওসীলা। এ দু'টি গুণ ব্যতীত যারা অন্য কোনো উপায়ে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া যায় বলে মনে করে, তারা মূলত কল্পনার জগতেই বসবাস করে। মুহাজির, আনসার ও তাঁদের অনুসারী পরবর্তী মনীষীগণ এ বিষয়টি অনুধাবন করেই ঈমান ও 'আমলে সালেহ এর ক্ষেত্রে অধিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। যার ফলেই সাহাবীদের মধ্যকার দশজন ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এ দুনিয়াতে থাকতেই জান্নাতের আগাম সনদ লাভ করেছিলেন। বাকিরা সনদ লাভ না করলেও তা লাভ করার যোগ্য হয়েছিলেন। এক কথায় আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য কুরআনুল কারীমে বর্ণিত-

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبۡتَغُوٓاْ إِلَيۡهِ ٱلۡوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: ٣٥]

“হে মু’মিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর”।[২০০]

এ আয়াতে ওসীলা অন্বেষণের যে নির্দেশ রয়েছে, এর দ্বারা তাঁরা ঈমান ও ‘আমলে সালেহ করার প্রতি নির্দেশ করার কথাই বুঝেছিলেন।

জ্ঞানী ও সৎ মানুষদের সাহচর্য গ্রহণ :

ঈমান কী এবং কিভাবে ‘আমলে সালেহ করতে হয়, তা তাঁদের কারো জানা না থাকলে সে জন্য তাঁরা জ্ঞানী ও সৎ জনের সাহচর্য গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের শিক্ষার অনুসরণ ও অনুকরণ করে সে অনুযায়ী ঈমান ও ‘আমলে সালেহ করাকেই তাঁরা আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার একক ওসীলা হিসেবে গণ্য করেছিলেন। ঈমান ও ‘আমলে সালেহ না করে কেবলমাত্র সৎ মানুষদের সাহচর্য গ্রহণ করা বা তাঁদের হাতে বায়‘আত[২০১] করাকেই তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের মূল উপায় হিসেবে নির্ধারণ করেন নি। অনুসরণের ক্ষেত্রে তাঁরাই ছিলেন আমাদের

---

[200]. আল-কুরআন, সূরাহ মা-ইদাহ : ৩৫।

[201]. যদিও এ ধরনের বাই‘আত গ্রহণ জঘন্য বিদ‘আত। এর অধিকার তাদের নেই। এ অধিকার শাসকদের জন্য নির্ধারিত। [সম্পাদক]

একমাত্র আদর্শ। তাই আমাদেরকেও তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করে শান্তিময় জীবন লাভের আশা করতে হবে।

কুরআনে বর্ণিত 'ওসীলা' শব্দের অপব্যাখ্যা :

কিন্তু কালের পরিক্রমায় এক শ্রেণীর মানুষেরা তাঁদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। ধর্মীয় জ্ঞানের অভাবের সুযোগে শয়তান তাদের মাঝে ওসীলা সম্পর্কে ভুল ধারণা দিতে সক্ষম হয়। একশ্রেণীর মানুষকে এ ধারণা দিতে সক্ষম হয় যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া ও আখেরাতে মুক্তি পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র ঈমান ও 'আমলে সালেহ করাই যথেষ্ট নয়। এ জন্য প্রয়োজন রয়েছে একজন ওলির হাতে বায়'আত ও তাঁর ওসীলা গ্রহণ। যেমন একজন পীর বায়'আতের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতে বর্ণিত ওসীলা শব্দের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন :

"আমরা দুনিয়াতে দেখি কোনো কাজই ওসীলা ব্যতীত হয় না, আর সে জন্যই আল্লাহ বলেছেন: (وابتغوا إليه الوسيلة) "আল্লাহ পাকের মহববত অর্জন করার জন্য অছিলা তালাশ কর।"[২০২] এ আয়াতের সরল অর্থ বর্ণনা করার পর এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

[202]. মাওলানা মোহাম্মদ এছহাক (পীর চরমোনাই), ভেদে মা'রিফাত; পৃ. ১১।

ওসীলা অন্বেষণ করা দ্বারা যে আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর ঈমান ও 'আমলে সালেহ করার মাধ্যমেই তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করতে বলেছেন, তিনি এ কথা না বলে বলেছেন : আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য "**একজন পীরের হাতে বায়'আত কর**।" ভাবটা যেন এমন যে, কোনো পীরের হাতে বায়'আত করলেই যেন সাধারণ মানুষের জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম হয়ে গেল। একজন সাধারণ মানুষ একজন শরী'আতী পীরের হাতে বায়'আত করলে[২০৩] এতে তার পক্ষে শরী'আত সম্পর্কে জানা এবং সে অনুযায়ী 'আমল করা সহজ হবে- তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু পীর সাহেব যদি নিজেকে সাধারণ মানুষের ত্রাণকর্তা ভাবতে শুরু করেন, আর মুরীদরা যদি পীর ব্যতীত মুক্তির কোনো পথ নেই বলে ভাবতে থাকে, তা হলেই তো সমস্যার সৃষ্টি হয়। অপরাধীরা যতই অপরাধ করুক না কেন, তাদের ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহর দরজা সব সময়ই উন্মুক্ত। তাওবায়ে নাসূহা তথা খাঁটি তাওবা করলেই

---

[203]. সম্ভবত: লেখক 'শরীয়তী পীর' বলে সত্যিকার আলেমদের বুঝিয়েছেন, নতুবা পীর শব্দটি ইসলামের কোনো গ্রহণযোগ্য শব্দ নয়। শরীয়তী পীর বলতে কিছু নেই। তাছাড়া আলেমের হাতেও বাই'আত হওয়ার অধিকার নেই; কারণ বাই'আত শরী'য়তের পরিভাষা, শরী'য়ত নির্ধারিত স্থানেই তা করতে হয়। শাসক ও যুদ্ধক্ষেত্রে সেনা পরিচালকের নিকট ব্যতীত আরও কারও নিকট তা হওয়া জায়েয প্রমাণিত হয় নি। [সম্পাদক]

তিনি তাদের অপরাধ মার্জনা করেন। এ সত্যটি কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে থাকলেও পীর সাহেবগণ তা বেমালুম ভুলে যান। তারা বলেন-অনেক অপরাধ করলে না কি আল্লাহ অপরাধীদেরকে কোনো পীরের ওসীলা ব্যতীত মাফ করতে চান না। যেমন উক্ত পীর সাহেব এ সম্পর্কে বলেন :

"বান্দার গুনাহ যখন অধিক হয়ে যায়, তখন কোনো মাধ্যম ব্যতীত সরাসরি আল্লাহর কাছে তাওবা করলে আল্লাহ তা মাফ করতে চান না, কিন্তু যখন তার পীর এখলাসের সাথে তার জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করেন, তখন তিনি তার তাওবা কবুল করেন অথবা পীরের দো'আর বরকতে তার তাওবা কবুল হওয়ার আশা করা যায়।"[২০৪] পীরের হাতে বায়'আত ও পীরের ওসীলা ব্যতীত কারো মুক্তি নেই, এ কথা প্রমাণ করার জন্য তিনি তাঁর কিতাবে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযীর মৃত্যুকালীন সময়ে ঘটিত ঈমান হননকারী একটি অদ্ভুত ঘটনারও উল্লেখ করেছেন।[২০৫]

---

204. তদেব; পৃ. ২৪।

205. ঘটনাটি নিম্নরূপ : একদা ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী একজন পীরের হাতে বায়'আত গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে সে পীরের কাছে গমন করেন। পীর সাহেব বললেন : তোমার মধ্যে ইলমে মা'রেফাত প্রবেশ করাবার কোনো স্থান নেই বিধায়, আমি তোমার বায়'আত নিতে পারবো না। ফলে ইমাম রাযী হতাশ হয়ে ফিরে আসেন। পীর বিহীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যুর সময়ে

শয়তান অপর এক শ্রেণীর লোকদেরকে ওসীলা সম্পর্কে এ ধারণা দিয়েছে যে, আল্লাহর নিকবর্তী হওয়া ও আখেরাতে মুক্তির জন্য শরী'আত পালনের খুব একটা আবশ্যকতা নেই। এ-জন্য মূলত প্রয়োজন ওলিদের সাহচর্য, তাঁদের সন্তুষ্টি ও ভালবাসা। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ওলিদের শিক্ষার অনুসরণ ও অনুকরণ করার বদলে সে তাদেরকে তাঁদের কবর ও কবরকে কেন্দ্র করে এমন সব কর্ম করতে লিপ্ত করেছে, যার কারণে তারা তাঁদেরকে উপাস্যে এবং নিজেদেরকে তাঁদের উপাসকে পরিণত করেছে। উদাহরণস্বরূপ কোনো ওলির কবর বা কবরের খেদমত করা, সেখানে নামায আদায় করা, কবরের পার্শ্বে অবস্থান গ্রহণ করা, ও

শয়তান কুমন্ত্রণা দিতে আসলে পীর ছাড়া তাঁর কী অবস্থা হবে, এ নিয়ে তিনি খুব ভাবতে থাকলেন। অতঃপর তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে শয়তান এসে তাঁর নিকট আল্লাহর ব্যাপারে নানা প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে, যার ফলে ঈমান বিহীন অবস্থায়ই তাঁর মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হয়ে দাঁড়ায়। ঠিক এমন সময় অযুরত অবস্থায় বহু দুর থেকে কশফের মাধ্যমে সে পীর সাহেব তাঁর এ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হন, তখন তিনি ইমাম রাযী যে দিকে সেদিকে পানি ছিটিয়ে দিলেন এবং ইমাম রাযীকে লক্ষ্য করে বলেন: শয়তানকে বল, বিনা দলীলে আল্লাহ একজন, আল্লাহর এক হওয়ার জন্য কোন দলীলের প্রয়োজন নেই। তদেব; পৃ. ৩১-৩২। (বস্তুত: এটি একটি গাঁজাখুরি গল্প, ইমাম রাযীর জীবনে বা অন্য কারও জীবনে এটা ঘটে নি। [সম্পাদক])

এর চারপার্শ্বে প্রদক্ষিণ করার কথা উল্লেখ করা যায়। এগুলো কা‘বা শরীফকে কেন্দ্র করে করলে তা আল্লাহর উপাসনা হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কবর বা কবর আল্লাহর উপাসনার স্থান না হওয়ায় সেখানে এ সব কাজ করলে তা সংশ্লিষ্ট কবর বা কবরবাসীর সান্নিধ্য অর্জন ও তাঁর উপাসনা হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, কোনো উপাসনা খালিসভাবে আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে তা শির্কমুক্ত স্থানে হতে হবে এবং তা এককভাবে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যেই হতে হবে, তা না হলে হাদীস অনুযায়ী তা শির্কী কর্ম হিসেবে গণ্য হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তা‘আলা বলেন-

«مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِيْ غَيْرِيْ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ وَجَعَلْتُ الْعَمَلَ لِلَّذِيْ أَشْرَكَهُ»

“যে ব্যক্তি কোনো কাজে আমার সাথে অপরকে শরীক করে নিল, আমি তাকে ও তার কাজকে ছেড়ে দেই এবং সে কাজটি তার জন্যই দিয়ে দেই, যাকে সে উক্ত কাজে শরীক করেছে।”[২০৬]

---

[206]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; ৪/২২৮৯; ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম; ২/৪৯৫।

ওসীলার মূলকথা (حقيقة الوسيلة) **:**

'ওসীলা' (وَسِيْلَة) শব্দটি আভিধানিক দিক থেকে মাধ্যম (Media)[207] ও নৈকট্য এর অর্থ প্রকাশ করে থাকে।[২০৮] উপরে বর্ণিত আয়াতে 'ওসীলা' শব্দেটিকে উভয় অর্থে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে সাহাবা, তাবেঈন ও বিশিষ্ট মনীষীগণ অত্র আয়াতে এ শব্দটিকে 'মাধ্যম' অন্বেষণের অর্থে ব্যবহার না করে 'নৈকট্য' অন্বেষণের অর্থে ব্যবহার করেছেন। ফলে তাঁদের মতে এ আয়াতের অর্থ হচ্ছে-"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন কর এবং (ঈমান ও 'আমলে সালেহ দ্বারা) তাঁর নৈকট্য

---

[207] এ অর্থটি প্রাচীন কোনো অভিধান দ্বারা সমর্থিত নয়। বরং অভিধানবিদদের মধ্যে যারাই এ অর্থ উল্লেখ করেছেন, তারাই শব্দটির সাথে নৈকট্য কথাটিও জুড়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ তারা বলেছেন, আমল বা কাজ করার মাধ্যমে নৈকট্য। সুতরাং ওসীলা শব্দের অর্থ শুধু 'মাধ্যম' বা 'মিডিয়া' করা পরবর্তী অনারব বা অনারবদের দ্বারা প্রভাবিত আরবদের সংযোজন। [সম্পাদক]

[208]. ইবনুল আছীর, **আন-নেহায়াতু ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আছার;** (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ৫/১৮৫; ইবনে মানযূর আল-আফরীক্বী, **লেসানুল আরব;** ১১/৭২৪।

অন্বেষণ কর।”[২০৯] বিশিষ্ট তাবেঈ ক্বাতাদাঃ (রহ.) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন :

«تقربوا إليه بطاعته و العمل بما يرضيه»

“তাঁর আনুগত্য এবং যে-সব কাজ তাঁকে সন্তুষ্ট করে সে-সব কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য ও সান্নিধ্য অন্বেষণ কর”।[২১০] যদি ‘ওসীলা’ শব্দটিকে ‘মাধ্যম’ অর্থে ব্যবহার করা হয় তা হলে উক্ত আয়াতের অর্থ হবে: “তাঁর নিকটবর্তী হওয়ার জন্য মাধ্যম অন্বেষণ কর”। যদি এই অর্থ করা হয় তা হলে প্রশ্ন দাঁড়াবে, মাধ্যম বলতে এখানে কী উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ প্রশ্নের স্বাভাবিক জবাব হচ্ছে- ঈমান ও ‘আমলে সালেহ করে এ দু’য়ের মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হতে চাও। ‘আমলে সালেহ এর মধ্যে জীবিত সৎ মানুষদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা, তাঁদের সান্নিধ্যে থাকা, নবী-রাসূল ও ওলিগণকে ভালবাসা, তাঁদের শিক্ষার

---

209. বিশিষ্ট তাবেঈ আবু ওয়াইল, হাসান, মুজাহিদ, ক্বাতাদাহ, ’আত্বা ও সুদ্দি এ আয়াতে বর্ণিত ‘ওসীলা’ শব্দটিকে ‘ক্বুর্বাত’ তথা নৈকট্য অর্থে ব্যবহার করেছেন। দেখুন : কুরতবী, প্রাগুক্ত; ৬/১৫৯; ত্ববারী, প্রাগুক্ত; ৬/২২৫।

210. ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল ‘আজীম; ২/৫৩।

অনুসরণ ও অনুকরণ করা ইত্যাদি বিষয়াদি থাকলেও মৃত বা জীবিত কোনো ওলিদের ব্যক্তিত্ব, তাঁদের মর্যাদা ও নামের মাধ্যম করে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার অর্থটি এখানে একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর ওফাতের পরেও তাঁর সাহাবীদের মাঝে তাঁর মর্যাদা ও নাম নিয়ে এমন ওসীলার কোনো প্রচলন ছিল না। যে সব সহীহ হাদীস দ্বারা বাহ্যত এমন কিছু বুঝা যায়, আসলে সে সবের দ্বারা তাঁর দো'আর ওসীলাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। ব্যক্তি রাসূল, তাঁর নাম ও মর্যাদার ওসীলা উদ্দেশ্য করা হয় নি। এ প্রসংগে কিছু মরফু' ও মাওকুফ হাদীস বর্ণিত হয়েছে ঠিকই, তবে হাদীস বিশেষজ্ঞদের মতে তা দুর্বল ও অগ্রহণযোগ্য।[২১১] কিন্তু তা সত্ত্বেও কিছু কিছু আলেম ও পীরদের মুখে এমনকি কোনো কোন তাফসীরকারকদের কলমেও এ আয়াতের ব্যাখ্যায় শয়তান এ অপ্রাসঙ্গিক অর্থটি জুড়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। যেমন মাওলানা মুফতী শফী' এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাঁর তাফসীর গ্রন্থে এ অর্থটি জুড়ে দিয়ে লিখেছেন :

---

211 . ইবনে তাইমিয়্যাহ, আত-তাওয়াসসুলু ওয়াল ওয়াসীলাতু; পৃ.৪৭।

“ওসীলা শব্দের আভিধানিক ব্যাখ্যা এবং ছাহাবী ও তাবেয়ীগণের তফসীর থেকে জানা গেল যে, যে বস্তু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়, তা-ই মানুষের জন্য আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা। ঈমান ও সৎ কর্ম যেমন এর অন্তর্ভুক্ত, তেমনি পয়গম্বর ও সৎ কর্মীদের সংসর্গ এবং মহববতও এর অন্তর্ভুক্ত। কেননা, এগুলোও আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভেরই উপায়। **এ কারণেই তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা জায়েয।”** [২১২]

এখানে তিনি “তাঁদেরকে ওসীলা করে আল্লাহর দরবারে দোয়া করা জায়েয” এ মর্মে যে কথাটি বলেছেন এর দ্বারা তিনি যদি এ উদ্দেশ্য করে থাকেন যে, জীবিত ওলিদেরকে সাথে নিয়ে তাঁদের দো‘আর ওসীলায় দো‘আ করা জায়েয, তা হলে তাতে আপত্তির কিছু নেই। তবে আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার ওসীলা হিসেবে পয়গাম্বর ও সৎ কর্মীদের সংসর্গ ও মহববতের কথা বলার পর এ কথাটি পৃথক করে বলাতে প্রমাণিত হয় যে, আসলে তিনি তাঁর এ কথার দ্বারা তা উদ্দেশ্য করেন নি। বরং মৃত নবী ও ওলিদের মর্যাদা এবং তাঁদের নামের ওসীলায় আল্লাহ তা‘আলার

[212]. মাওলানা মুফতী শফী‘, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩২৭।

নিকট দো‘আ করার যে প্রচলন সমাজে রয়েছে, সে ওসীলার কথাই তিনি তাঁর এ কথার দ্বারা উদ্দেশ্য করেছেন। অথচ তা সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ত কথা। যার সাথে এ আয়াতে বর্ণিত নির্দেশের আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কি ওসীলা সম্পর্কে তিনি এ কথার পর যা বলেছেন তার সাথেও তাঁর এ কথার আদৌ কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা, নেক মৃত মানুষের মহববত করা এক জিনিষ আর তাঁদের নামের ওসীলায় দো‘আ করা একটি ভিন্ন জিনিষ। প্রথমটি মানুষের ঈমানের পরিচায়ক, আর অপরটি শরী‘আত বহির্ভুত একটি বেদ‘আতী কর্ম। কিন্তু তা সত্ত্বেও শয়তান তাঁর মত ব্যক্তি ও অন্যান্য পীরদের মুখ ও লেখনীতে এ কথাটিকে চালিয়ে দিয়ে অজ্ঞ ও মুর্খ মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করার একটি উত্তম সুযোগ করে নিয়েছে।

কুরআনে বর্ণিত ‘ওসীলা’ শব্দের অর্থ বর্ণনার ক্ষেত্রে তারা যদি তাদের সলফগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন, তা হলে সমাজে ‘ওসীলা’ ধরা নিয়ে শয়তান এতো বিভ্রান্তি ছড়াতে পারতো না।

‘ওসীলা’ শব্দটি কুরআনে করীমের মোট দু’স্থানে বর্ণিত হয়েছে। একটির কথা উপরে বর্ণিত হয়েছে। আর অপরটি বর্ণিত হয়েছে সূরা ইসরাতে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓ﴾ [الاسراء: ٥٧]

"মুশরিকরা যাদেরকে (হিত সাধন বা অনিষ্ট রোধের জন্য) আহ্বান করে তারা নিজেরাই (এখন) তাদের রবের অধিক নিকটবর্তী হওয়ার ক্ষেত্রে ওসীলা অন্বেষণে প্রতিযোগিতা করে, তাঁর রহমত কামনা করে এবং তাঁর আযাবকে ভয় করে"।[২১৩]

এ আয়াতে বর্ণিত 'ওসীলা' শব্দটিকেও উপর্যুক্ত আয়াতে বর্ণিত 'ওসীলা' শব্দের ন্যায় ওসীলার উভয় অর্থেই ব্যবহার করা যেতে পারে[২১৪]। এ ছাড়া সহীহ হাদীসে আজানের পর পঠিত দো'আর মধ্যেও 'ওসীলা' শব্দটি বর্ণিত হয়েছে। তবে সেখানে তা আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থানের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

---

[213] . আল-কুরআন, সূরা ইসরা বা বনী ইসরাঈল: ৫৭।

[214] . আমরা আগেই বলেছি যে, ওসীলা দ্বারা শুধু 'মাধ্যম' অর্থ নেওয়া কোনো গ্রহণযোগ্য অভিধানবিদের মত ছিল না। [সম্পাদক]

«سَلُوا اللَّه لِيَ الْوَسِيْلَةَ فَإِنَّهَا دَرَجَةٌ فِي الْجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِيْ إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ فَمَنْ سَأَلَ لِيْ الْوَسِيْلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ»

“তোমরা আজানের পর আমার জন্য আল্লাহর নিকট ওসীলা কামনা কর। কেননা, তা এমন একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে কেবল একজন বান্দার জন্যেই শোভা পাবে। যে আমার জন্য ওসীলা কামনা করবে তার জন্য আমার শাফা‘আত হালাল হয়ে যাবে।”[২১৫]

উক্ত বর্ণনার দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, ‘ওসীলা’ শব্দটি কুরআন ও হাদীসে মোট দু’টি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি হচ্ছে- নৈকট্য বা নৈকট্যের মাধ্যম অর্থে। আর অপরটি হচ্ছে মর্যাদাপূর্ণ স্থান এর অর্থে। আর নৈকট্যের মাধ্যম এর অর্থে এটিকে গ্রহণ করলে এর অর্থ দাঁড়ায়- ঈমান, সৎকর্ম, মৃত নবী ও নেক মানুষদের ভালবাসা, তাঁদের আদর্শ অনুসরণ, জীবিত নেক মানুষের সাহচর্য গ্রহণ, তাঁদের দো‘আ, ভালবাসা ও তাঁদের আদর্শ অনুসরণ ইত্যাদির ওসীলায় আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ করা। স্রেফ তাঁদের নাম ও মর্যাদার ওসীলায় বা তাঁদের কবরের পার্শ্বে বসে

---

215. ইবনে খুযায়মাহ, মুহাম্মদ, **সহীহ;** সম্পাদনা : ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আল-আ‘জমী, (বৈরুত : আল-মাকতবুল ইসলামী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৭০ খ্রি.), ১/২১৮।

আল্লাহর নৈকট্য অন্বেষণ ও এর ওসীলায় ইহ-পরকালীন কিছু চাওয়া নয়।

আল্লাহর নিকট কোনো জীবিত বা মৃত মানুষের মর্যাদার ওসীলায় কিছু চাওয়া যায় না :

প্রকৃতকথা হচ্ছে- একজন মানুষ অপর কোনো মানুষের নিকট থেকে তার কোনো উদ্দেশ্য সহজে হাসিল করার জন্য তৃতীয় কোনো গণ্যমান্য ব্যক্তির নামের মাধ্যমে তার কাছে তা চাইতে পারে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিও তৃতীয় ব্যক্তির নাম শুনে তিনটি কারণে প্রথম ব্যক্তির চাহিদা ও আবদার পূর্ণ করতে পারেন। কারণগুলো হচ্ছে :

১. দ্বিতীয় ব্যক্তি তৃতীয় ব্যক্তির নাম শুনে তার মর্যাদার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে তা করতে পারেন।

২. তৃতীয় ব্যক্তির সম্ভাব্য ক্ষতির আশঙ্কায় তিনি তা করে দিতে পারেন।

৩. তৃতীয় ব্যক্তির নিকট থেকে তার নিজের কোনো প্রয়োজন হাসিল করার জন্য তা করে দিতে পারেন।

মানুষ মানুষের প্রতি মুখাপেক্ষী হয়, একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে তাদের মাঝে এ ধরনের ওসীলা চলতে পারে। মহান আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী না হওয়ায় এবং কারো দ্বারা তিনি প্রভাবিত না হওয়ায় তাঁর কাছে কারো নাম ও মর্যাদার ওসীলায় দো‘আ করা যেতে পারে না। নবী ও ওলিদের যে মর্যাদা রয়েছে তা তাঁরই দেয়া। সুতরাং তাঁদেরকে তাঁরই দেয়া জিনিষের ওসীলায় তাঁর কাছে কিছু আবদার করা তাঁর সাথে বেআদবী করারই নামান্তর। তিনি কারো কোনো উদ্দেশ্য পূর্ণ না করলে এতে তাঁর কোনো ক্ষতিরও আশঙ্কা নেই। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে কারো নাম, মর্যাদা ও হুরমতের ওসীলায় কিছু চাওয়া আল্লাহর সাথে মানবীয় আচরণ করারই শামিল।

জীবিত মানুষের দো‘আর ওসীলা গ্রহণ :

জীবিত মানুষের দো‘আর ওসীলা দু’ভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে :

এক, কোনো জীবিত মানুষের কাছে গিয়ে এ কথা বলা যেতে পারে যে, আমি অমুক সমস্যায় পতিত হয়েছি, আপনি আমার জন্য এ মুহূর্তে আল্লাহর কাছে একটু দো'আ করুন। এ ধরনের দো'আ কামনা করার বিষয়টি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যা আমরা একটু পরে বর্ণনা করবো।

দুই, কোনো জীবিত মানুষের নিকট গিয়ে এ মর্মে দো'আ কামনা করা যেতে পারে যে, আপনি আমার জন্য দো'আ করবেন। দো'আকারী যদি অসাক্ষাতে দো'আ করেন, তা হলে তার দো'আ আল্লাহ তা'আলার নিকট মঞ্জুর হওয়ার অধিক সম্ভাবনার কথা হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। উম্মুদ দরদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

«دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لأَخِيْهِ بِظَهْرِ الْغَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ...»

"একজন মুসলিম ভাইয়ের জন্য তার অসাক্ষাতে মুসলিম ব্যক্তির দো'আ মকবূল হয়ে থাকে।"[২১৬]

[216]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; (জিকির ও দু'আ অধ্যায়, বাব : ফদলিদ দু'আ লিল মুসলিমীনা বি জাহরিল গাইব, হাদীস নং- ২৭৩২), ৪/২০৯৪।

তবে এ ধরনের দো‘আ কামনা যে শুধু সাধারণ লোকেরাই কেবল সৎ লোকজনের নিকটেই চাইবে তা নয়, বরং একজন মর্যাদাবান ব্যক্তিও তাঁর চেয়ে কম মর্যাদাবান ব্যক্তির নিকটে তা চাইতে পারেন। এমন দো‘আ চাওয়ার প্রচলন স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকেই প্রমাণিত। একদা ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু ‘উমরা পালন উপলক্ষে মক্কায় যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট অনুমতি চাইলে তিনি তাঁকে অনুমতি দানপূর্বক বলেন : “ভাই! (সফরের অবস্থায় যখন তুমি দো‘আ করবে তখন) তোমার নেক দো‘আ থেকে আমাদের ভুলে যেও না।”[২১৭] এটি হচ্ছে জীবিত মানুষের দো‘আর ওসীলা গ্রহণের একটি সঠিক পদ্ধতি। এতে প্রমাণিত হয় যে, একজন সাধারণ মানুষ যেমন একজন ওলি ও পীর সাহেবের নিকট দো‘আ কামনা করতে পারে, তেমনি একজন পীর সাহেবও একজন সাধারণ মানুষের নিকট দো‘আ চাইতে পারেন। কোনো

---

[217] . আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; সালাত অধ্যায়, বাবুদ দু‘আ; ২/১৬৯; হাদীসটি ইবনে আববাস রাদিয়াল্লাহু আনহ থেকে বর্ণিত। কুরতুবী, প্রাগুক্ত; ১২/৩২১। (তবে হাদীসটির সনদ দুর্বল, [সম্পাদক])

পীর সাহেব যে মানুষের জন্য দো‘আ করার এজেন্সী নিয়ে বসে থাকবেন বিষয়টি এমন নয়।

কারো নামের ওসীলায় দো‘আ করা বেদ‘আত:

কিন্তু দো‘আর সময় নবী ও ওলিদের নামের মাধ্যম ধরে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার কথা বা অনুমতি কুরআন ও হাদীসের দ্বারা সমর্থিত নয়। এর কারণ হলো, এভাবে কারো নামের কথা শুনিয়ে কিছু চাওয়া হচ্ছে মানবীয় ব্যাপার। আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়ার সময় এমনটি করা ঠিক নয়। কেননা, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন বলে তাঁর সাথে মানবীয় আচরণ করা প্রকারান্তরে তাঁকে মানুষের মর্যাদার দ্বারা প্রভাবিত করতে চাওয়ারই শামিল। তিনি কারো মর্যাদার দ্বারা প্রভাবিত হন না বলেই কেউ তাঁর নিকট নিজের মর্যাদার ওসীলায় আখেরাতে কারো জন্যে কোনো শাফা‘আত করতে পারবে না। যে মর্যাদার মূল্য আখেরাতে নেই সে মর্যাদার ওসীলায় দুনিয়াতে তাঁর কাছে কিছু চাওয়ারও কোনো মূল্য নেই। এছাড়া তিনি কোনো মানুষের নামের মাধ্যমে বা ওসীলায় তাঁর কাছে কিছু আবদার করতে আমাদেরকে শিক্ষাও দেন নি। বরং তিনি তাঁর নিকট তাঁর নিজের

নামের ওসীলায় আমাদের অভাব ও অভিযোগের কথা তাঁর নিকট উপস্থাপন করতে আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে বলেছেন :

﴿ وَلِلَّهِ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰ فَٱدۡعُوهُ بِهَاۖ ﴾ [الاعراف: ١٨٠]

"আল্লাহর রয়েছে উত্তম নামাবলী, সুতরাং তোমরা তাঁকে তাঁর নামের ওসীলায় আহ্বান কর।"[২১৮] আল্লাহ যেখানে আমাদেরকে তাঁর নামের ওসীলায় তাঁকে আহ্বান করতে নির্দেশ করেছেন, সেখানে আমরা তাঁকে তাঁর কোনো সৃষ্টির নামের ওসীলায় তাঁর নির্দেশ ব্যতীত আহ্বান করতে পারি না। যদিও সে সৃষ্টি তাঁর নিকট তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে অধিক ভালবাসার পাত্রও হতে পারেন। আমরা আল্লাহর বান্দা। তাই আমাদের জীবনের যাবতীয় প্রয়োজনের কথা কোনো সৃষ্টির মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি তাঁর কাছে জানাবো, এটাই স্বাভাবিক কথা এবং যুক্তিরও দাবী। সে জন্যেই তিনি আমাদের সকলকে সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে কোনো নবী বা ওলির মধ্যস্থতা ছাড়াই তাঁকে আহ্বান করার নির্দেশ করে বলেছেন :

﴿ ٱدۡعُونِيٓ أَسۡتَجِبۡ لَكُمۡۚ ﴾ [غافر: ٦٠]

---

[218]. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ : ১৮০।

“তোমরা আমাকে আহ্বান কর, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।”[২১৯] সরাসরি আল্লাহকে আহ্বান করার শিক্ষা দিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমাকে বলেন :

«إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ، وَ إِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰه»

“যখন তুমি কিছু চাইবে তখন তা আল্লাহর কাছেই চাইবে, আর যখন কিছু সাহায্য চাইবে তখন তা আল্লাহর কাছেই চাইবে।”[২২০] এরপরও কি এ কথা বলা যায় যে, তিনি নবী ও অলিগণের নামের মাধ্যম ছাড়া পাপীদের কোনো কথা শ্রবণ করেন না বা করতে চান না বা তাঁদের নামের ওসীলা নিয়ে দো‘আ করলে তিনি দো‘আ দ্রুত কবুল করবেন, অন্যথায় বিলম্বে করবেন?

প্রকৃতপক্ষে যারা এমনটি বলে তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে। তারা আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণ করে। অথচ তিনি তাঁর পাপী বান্দাদের তাওবা ও দো‘আ কবুল করে তাদের অপরাধ মার্জনা করার জন্য অধির আগ্রহে অপেক্ষা করে

---

[219]. আল-কুরআন, সূরা গাফির : ৬০।

[220]. তিরমিযী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল কিয়ামাহ, বাব নং- ৫৯; ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৬৬৭।

থাকেন। তিনি তাঁর বান্দাদেরকে এ বিষয়ের সংবাদ দেয়ার জন্য তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে এ মর্মে নির্দেশ করেছেন :

﴿ ۞نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٤٩﴾ ﴾ [الحجر: ٤٩]

"তুমি আমার বান্দাদেরকে সংবাদ দাও যে, আমি হলাম অধিক ক্ষমাশীল ও মেহেরবান।"[২২১]

অপর স্থানে এ মর্মে আহ্বান করতে বলেছেন :

﴿ ۞قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسۡرَفُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمۡ لَا تَقۡنَطُواْ مِن رَّحۡمَةِ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغۡفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًاۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾ ﴾ [الزمر: ٥٣]

"বল : হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের নফছের উপর অত্যাচার করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে যেওনা, নিশ্চয় আল্লাহ যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করেন, তিনিই হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু।"[২২২]

---

[221]. আল-কুরআন, সূরা হিজর : ৪৯।

[222]. আল-কুরআন, সূরা যুমার : ৫৩।

যারা অপরাধ করে সরাসরি তাঁকে আহ্বান করে তিনি তাদের আহ্বান শ্রবণ করেন।

এ প্রসঙ্গে বলেছেন :

﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِۖ﴾ [البقرة: ١٨٦]

"আর আমার বান্দারা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করে, (তখন তাদের বল) বস্তুত আমি নিকটেই রয়েছি, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে, তখন আমি তার আহবানে সাড়া দিয়ে তা কবুল করি...।"[২২৩]

যারা অন্যায় করার পর দ্রুত তাঁর নিকট ক্ষমা চায়, তিনি তাদের তাওবা কবুল করেন। এ প্রসঙ্গে বলেন :

﴿ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٧ ﴾ [النساء: ١٧]

"আল্লাহ অবশ্যই তাদের তাওবা কবুল করেন যারা ভুলবশত মন্দ কাজ করে, অতঃপর অনতিবিলম্বে তাওবা করে,

---

[223]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাহ : ১৮৬।

এরাই হলো সেই সব লোক যাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞ।”[২২৪]

অপরাধীরা সরাসরি আল্লাহকে আহ্বান করলে তিনি তাদের আহবানে সাড়া দেন এবং তাদের অপরাধ মার্জনা করেন, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

«يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَ تَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِيْنَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَخِيرِ فَيَقُوْلُ : مَنْ يَدْعُوْنِي فَأَسْتَجِيْبَ لَهُ، وَ مَنْ يَسْأَلُنِيْ فَأُعْطِيَهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْفِرُنِيْ فَأَغْفِرَ لَهُ...»

“আমাদের বরকতময়, সুমহান প্রতিপালক প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবী সংলগ্ন আকাশে আগমন করে বলতে থাকেন- কে আমাকে আহ্বান করবে, আমি তার আহবানে সাড়া দেব, কে আমার নিকট চাইবে, আমি তাকে দান করবো, কে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে, আমি তাকে ক্ষমা করে দেব।”[২২৫]

---

[224]. আল-কুরআন, সুরা নিসা : ১৭।

[225]. বুখারী, প্রাগুক্ত; (কিতাবুয যুহদ, বাব- শেষ রাতের নামাজে দু‘আ করা), ১/২১২১; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুল মুসাফিরীন, পরিচ্ছেদ : শেষ রাতে

মহান আল্লাহ কেবল সে সব লোকেরই তাওবা কবুল করেন না, যারা মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে তাওবা করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন :

﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ﴾ [النساء: ١٨]

"আর সেই সব লোকদের জন্য কোনো ক্ষমা নেই, যারা মন্দ কাজ করতেই থাকে, এমন কি যখন তাদের কারো মাথার উপর মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন বলতে থাকে- আমি এখন তাওবা করছি, আরো তাওবা নেই তাদের জন্য যারা কুফরী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে।"[২২৬]

আমরা দেখতে পেলাম যে, উক্ত আয়াতসমূহ ও হাদীসে কোথাও অপরাধীদের তাওবা কবুল ও গুনাহ মার্জনা করার জন্য মহান আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৃষ্টির

দু'আ ও জিকির করার ক্ষেত্রে আগ্রহ প্রদান, এবং দু'আ কবুল করা), ১/৫২১।

[226]. আল-কুরআন, সূরা নিসা : ১৮।

মধ্যকার কারো নাম ও মর্যাদার মাধ্যম ধরে আল্লাহ্‌র কাছে তাওবা করতে বলেন নি। কোনো মাধ্যমে তাঁর কাছে কথা না বললে তিনি কারো তাওবা কবুল করতে বিলম্ব করবেন, এমন কথাও বলেন নি। বরং এ সবের দ্বারা অপরাধীদের তাওবা কবুল করে তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার অধীর আগ্রহ থাকার কথাই আমরা জানতে পেলাম।

দো'আ কবুলের সম্ভাব্য সময় ও মুহূর্ত :

এখন শুধু প্রয়োজন হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দার অনুতাপ ও অনুনয়-বিনয় প্রকাশ করার। আল্লাহ তা'আলার নিকট বান্দা সার্বক্ষণিকই তার অনুতাপ প্রকাশ করতে পারে। তবে এ জন্য সম্ভাব্য কিছু সময় ও মুহূর্তও রয়েছে। সম্ভাব্য সময় যেমন- সেহরীর সময়, জুমু'আর দিন, রমাযান মাস ও 'আরাফার দিন। আর সম্ভাব্য মুহূর্ত যেমন- নামাযে সেজদা রত অবস্থায়, আযান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়, নামাযের শেষে একাকী বসে ও বৃষ্টি বর্ষণের সময়ে।[২২৭] বান্দা যদি দো'আ কবুলের এ সব সম্ভাব্য সময় ও মুহূর্ত অন্বেষণ করে আল্লাহ তা'আলার নিকট তার কৃত

---

[227]. নববী, ইয়াহইয়া ইবনে শরফ, মহই উদ্দিন আবু যাকারিয়্যা, **আল-আযকার;** (বৈরুত : দারুল মা'রিফাহ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), পৃ.৩৫৩।

অপরাধের জন্য অনুতাপ করে এবং পুনরায় অপরাধ না করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাঁর কাছে প্রার্থনা করে, তা হলে তিনি তাকে অবশ্যই ক্ষমা করবেন। তিনি যদি তাঁর অবাধ্য অহংকারী শয়তানের দো'আ কবুল করে তার আহবানে সাড়া দিয়ে তাকে অপকর্ম করার জন্য কেয়ামত পর্যন্ত আয়ু দিতে পারেন,[২২৮] তা হলে সাধারণ অপরাধীরা তাঁর কাছে বিনয়ের সাথে সরাসরি কিছু চাইলে তিনি তাদের দো'আ কবুল না করার কোনো কারণ থাকতে পারেনা। প্রকৃত কথা হচ্ছে- যারা তাঁর আনুগত্যকে স্থায়ীভাবে না হোক অন্তত সাময়িকভাবে হলেও স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে একনিষ্ঠভাবে বিনয়ের সাথে আহ্বান করে, তিনি তাদের আহবানেও সাড়া দেন। এ ক্ষেত্রে আহ্বানকারী কোনো মুশরিক না মুনাফিক না ফাসিক না মু'মিন, এ সবের প্রতি তিনি আদৌ কোনো লক্ষ্য করেন না। আর এ কারণেই মুশরিকরা যখন সমুদ্রে ঝড়ের কবলে পড়ে তাঁকে একনিষ্ঠভাবে আহ্বান করতো তখন তিনি তাদের বিপদ থেকে উদ্ধার করে দিতেন।

---

[228]. শয়তান অপমানিত হয়ে বিতাড়িত হওয়ার প্রাক্কালে এই ব'লে দু'আ করেছিল :

﴿ قَالَ أَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ ۝١٤ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ ۝١٥ ﴾ [الاعراف: ١٤، ١٥]

"প্রভু! আমাকে কেয়ামত দিবস পর্যন্ত অবকাশ দান করুন, আল্লাহ বলেন : তোমাকে অবকাশ দান করা হলো।" আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ : ১৪ ও ১৫।

যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلۡفُلۡكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّىٰهُمۡ إِلَى ٱلۡبَرِّ إِذَا هُمۡ يُشۡرِكُونَ ٦٥ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]

“যখন মুশরিকরা (সমুদ্রে) নৌকা বা জাহাজে আরোহণ করে (ঝড়ের কবলে পড়ে, তখন তারা) তাদের সকল আনুগত্যকে আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ করে তাঁকে আহ্বান করে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্থলে এনে উদ্ধার করে দিতেন, তখনই তারা (তাঁর সাথে) শরীক করতে থাকে।”[২২৯] মুশরিকরা যদি তাদের শির্কী ধ্যান-ধারণা পরিহার না করেও কোনো মধ্যস্থতা ছাড়াই একনিষ্ঠভাবে সরাসরি আল্লাহকে আহ্বান করার ফলে তিনি তাদেরকে ঝড়ের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারেন, তা হলে আমাদের ডাক না শুনার তো কোনো কারণ থাকতে পারে না। অতএব যারা মৃত নবী ও ওলিদেরকে আল্লাহ ও সাধারণ মানুষদের মাঝে মাধ্যম হিসেবে দাঁড় করেন এবং তাঁদের নামের মাধ্যমে দো‘আ করলে আল্লাহ সে দো‘আ দ্রুত শ্রবণ করেন বলে মনে করেন, তারা আসলে আল্লার প্রতি মিথ্যারোপ করেন। তাদের জানা আবশ্যক যে, কোনো ওলি তো দূরের কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ

---

[229]. আল-কুরআন, সূরা ‘আনকাবূত : ৬৫।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও যদি কারো ব্যাপারে আল্লাহর কাছে কোনো সুপারিশ করেন, তা হলে তাঁর সে সুপারিশ গ্রহণ করা আল্লাহ তা'আলার উপর জরুরী হয়ে যায় না। যেমন তিনি মুনাফিকদের সরদার আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এর জানাযার নামায পড়ে তার মাগফিরাতের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু আল্লাহ তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করাতো দূরের কথা, তিনি তাঁকে এ ধরনের কর্মের পুনরাবৃত্তি করার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেছিলেন :

﴿إِن تَسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ سَبۡعِينَ مَرَّةٗ فَلَن يَغۡفِرَ ٱللَّهُ لَهُمۡۚ ﴾ [التوبة: ٨٠]

"যদি তুমি তাদের (মুনাফিকদের) জন্য সত্তর বারও ক্ষমা ভিক্ষা কর, তবুও আল্লাহ কস্মিনকালেও তাদেরকে ক্ষমা করবেন না।"[২৩০]

অপর আয়াতে এদের জানাযা পড়তে নিষেধ করে দিয়ে বলেন :

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ﴾ [التوبة: ٨٤]

---

[230]. আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ : ৮০।

"এদের কেউ মরলে তুমি তাদের জানাযার নামায পড়বে না, তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না।"[২৩১]

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, কেউ কিছু চাইলে তা নবী বা ওলিদের মধ্যমে আল্লাহর নিকট চেয়েছে কি না, মূলত সেটা দেখার কোনো বিষয় নয়। বরং আসল দেখার বিষয় হচ্ছে যার সমস্যা তার মানসিক অবস্থা কী। দো'আকারীর মানসিক অবস্থা ঠিক হলে এবং এখলাসের সাথে সে নিজেই সরাসরি আল্লাহর কাছে চাইলে তিনি শুধু মু'মিন কেন মুশরিকেরও দো'আ শুনেন এবং তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। এটাই হচ্ছে আল্লাহর সুন্নাত বা নিয়ম।

উক্ত আলোচনার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হলো যে, দো'আ করার সময় কোনো সৃষ্টির নামের বা তাঁর মর্যাদা ও হুরমতের ওসীলা গ্রহণের জন্য আল্লাহ আমাদেরকে কোনো শিক্ষা দান করেন নি বা তাঁর সাধারণ বান্দাদের সমস্যাদি তাঁর নিকট উপস্থাপনের জন্য তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার কাউকে তাঁর ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে ওসীলা হওয়ার জন্যেও মনোনীত করেন নি। বরং এটি

---

[231]. আল-কুরআন, সূরা তাওবাহ : ৮৪।

কোনো কোন পীরদের মনগড়া বক্তব্য বৈ আর কিছুই নয়। এ বিষয়টি অবগতির পর এবার আমাদেরকে যে বিষয়টি জানতে হবে তা হলো : আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু চাইতে হলে তা কীভাবে চাইতে হবে?

আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু চাওয়ার বৈধ ওসীলার প্রকারভেদ :

আল্লাহর নিকট কিছু চাইতে হলে তা মোট দু'ভাবে চাওয়া যেতে পারে :

এক. কোনো কিছুর মাধ্যম ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ তা'আলার নিকট কিছু চাওয়া যেতে পারে। কোনো প্রয়োজনকে সামনে রেখে এ কথা বলা যেতে পারে যে, হে আল্লাহ আমার অমুক প্রয়োজনটি পূর্ণ করে দিন। আমার অসুখ হয়েছে তা দ্রুত নিবারণ করে দিন...ইত্যাদি।

দুই. কোনো কিছুর ওসীলা বা মাধ্যম করে আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া। কুরআন ও সহীহ হাদীস অধ্যয়ন করলে দেখা যায়, আল্লাহর কাছে মোট ছয় পন্থায় ওসীলা করে কিছু চাওয়া যেতে পারে:

প্রথম পন্থা : আল্লাহ তা'আলার সুন্দর নামাবলী ও সুমহান গুণাবলীর ওসীলায় দো'আ করা :

আল্লাহ তা'আলার জানা বা অজানা পবিত্র ও উত্তম নামাবলীর মাধ্যমে তাঁর কাছে কিছু আবেদন করা। নিজের প্রয়োজনের কথা বলার পূর্বে মুখে তাঁর নাম নেয়া । যেমন এ কথা বলা :

«يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ»

"হে চিরঞ্জীব হে সবকিছুর ধারক! আমি তোমার রহমতের অসীলায় উদ্ধার কামনা করছি[২৩২]।"

এ পন্থা যে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশিত পন্থা তা আমরা ইতোপূর্বে অবগত হয়েছি। এটি ওসীলার সর্বোত্তম পন্থা হওয়ায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিকহারে এ পন্থা অবলম্বন করেই দো'আ করতেন। হাদীসের গ্রন্থসমূহের দো'আর অধ্যায় খুললেই এর জলন্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় পন্থা : আল্লাহর তাওহীদ ও ঈমানের রূকনসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের ওসীলায় দো'আ করা :

---

[232]. তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫২৪।

নিম্নে বর্ণিত আয়াত দু'টি দ্বারা এ জাতীয় ওসীলার প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউনুস (আলাইহিস সালাম) কে যখন সমুদ্রের মাছ ভক্ষণ করেছিল, তখন তিনি সে বিপদ থেকে দ্রুত মুক্তি লাভের জন্য আল্লাহ তা'আলার তাওহীদের ওসীলায় দো'আ করে বলেছিলেন :

﴿فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

[الانبياء: ٨٧]

"অন্ধকারের মধ্যে তিনি এই বলে আহ্বান করেন যে, (হে আল্লাহ) তুমি ব্যতীত কোনো সঠিক ইপাস্য নেই, আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, নিশ্চয় আমি যালিমদের অন্তর্গত হয়ে গেছি।"[২৩৩]

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনয়নের ওসীলায় দো'আ করা প্রসঙ্গে কুরআনুল কারীমে বর্ণিত হয়েছে :

﴿ رَّبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعۡنَا مُنَادِيٗا يُنَادِي لِلۡإِيمَٰنِ أَنۡ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمۡ فَـَٔامَنَّاۚ رَبَّنَا فَٱغۡفِرۡ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرۡ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلۡأَبۡرَارِ ١٩٣ ﴾ [ال عمران: ١٩٣]

---

[233]. আল-কুরআন, সূরা : আম্বিয়া : ৮৭।

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা একজন আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি এ মর্মে আহ্বান করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর, ফলে আমরা ঈমান আনয়ন করেছি, হে আমাদের প্রতিপালক! অতএব, (তোমার প্রতি ঈমান আনয়নের ওসীলায়) তুমি আমাদের অপরাধসমূহ মার্জনা কর, আমাদের অপকর্মসমূহ দূর করে দাও এবং আমাদেরকে নেক মানুষদের সাথে মৃত্যু দাও।”[২৩৪]

ঈমানের রুকসমূহের প্রতি ঈমান আনয়নের ওসীলায় দো‘আ করা প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে :

﴿ رَبَّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلۡتَ وَٱتَّبَعۡنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّٰهِدِينَ ٥٣ ﴾ [ال عمران: ٥٣]

“হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা কিছু অবতীর্ণ করেছ আমরা তাতে ঈমান এনেছি এবং রাসূলের অনুসরণ করেছি,

---

[234]. আল-কুরআন, সূরা : আলে ইমরা্ন : ১৯৩।

অতএব, তুমি আমাদেরকে সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে লিখে নাও।”[২৩৫]

অত্র আয়াতে আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান এবং রাসূলের অনুসরণ এ দু’টি বিষয়কে ওসীলা করে সাক্ষ্যদানকারীদের মধ্যে লিখে নেয়ার কথা আল্লাহর কাছে চাওয়া হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ দু’টি বিষয়ের মত ঈমানের আরো যে সব রুকন রয়েছে সেগুলোর প্রতি ঈমান আনয়নের ওসীলায়ও দো‘আ করা যেতে পারে।

তৃতীয় পন্থা : আল্লাহর নিকট বিপদ ও দুঃখের কথা বলে নিজের অপারগতা ও দুর্বলতা প্রকাশের ওসীলায় দো‘আ করা :

যেমন আইউব (আলাইহিস সালাম) তাঁর অসুখের কথা বলে নিজের অপারগতা ও অসহায়ত্বের বিষয়টি আল্লাহর কাছে তুলে ধরে তাঁর দয়া কামনা করে বলেছিলেন :

﴿ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرۡحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٣]

---

235. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান : ৫৩।

“প্রভু! আমাকে অকল্যাণ পেয়ে বসেছে, তুমি হলে অধিক দয়াবান।”

চতুর্থ পন্থা : নিজের অপরাধ স্বীকার করার ওসীলায় দো‘আ করা :

যেমন আদম ও হাওয়া (‘আ.) শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গম খাওয়ার পর যখন বুঝতে পারলেন যে, তারা অপরাধ করে ফেলেছেন, তখন তারা তাদের অপরাধ স্বীকার করার ওসীলায় আল্লাহর কাছে তা মার্জনার জন্য দো‘আ করে বলেছিলেন :

﴿رَبَّنَا ظَلَمۡنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمۡ تَغۡفِرۡ لَنَا وَتَرۡحَمۡنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾ [الاعراف: ٢٣]

“হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি, তুমি যদি ক্ষমা ও দয়া না কর, তা হলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।”[২৩৬]

পঞ্চম পন্থা : কোনো সৎকর্মের ওসীলায় দো‘আ করা:

---

[236]. আল-কুরআন, সূরা : আ‘রাফ : ২৩।

সৎ কর্ম বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তন্মধ্যে উত্তম দু'টি 'আমল হচ্ছে নামায ও বিপদে ধৈর্য ধারণ করা। তাই মহান আল্লাহ এ দু'টির ওসীলায় দো'আ করার প্রতি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন :

﴿ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبۡرِ وَٱلصَّلَوٰةِۚ ﴾ [البقرة: ٤٥]

"তোমরা ধৈর্য ধারণ এবং নামাযের ওসীলায় আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা কর"।[২৩৭] এ আয়াতের মর্মানুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, ফরয ও নফল নামাযান্তে একাকী বসে নামাযের ওসীলায় আল্লাহর কাছে কিছু প্রাপ্তির জন্য দো'আ করা যেতে পারে।

এছাড়াও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের তিন ব্যক্তি একদা রাত যাপনের জন্য একটি পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল। রাতে পাহাড়ের চূড়া থেকে একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ হয়ে গেলে তারা পরস্পরকে বললো :

«إِنَّهُ لاَ يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ»

---

237. আল-কুরআন, সূরা : বাক্বারাহ : ৪৫।

“তোমাদের সৎ ‘আমলের ওসীলায় আল্লাহকে আহ্বান না করা ব্যতীত এ পাথর থেকে তোমাদের মুক্তির কোনো উপায় নেই...।”[২৩৮] এরপর তাদের একজন তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করার ওসীলায় দো‘আ করলো, আরেকজন আল্লাহর ভয়ে ব্যভিচার করা থেকে বিরত থাকার ওসীলায় দো‘আ করলো, তৃতীয়জন মজুরকে তার প্রাপ্যসহ আরো অধিক সম্পদ দেয়ার ওসীলায় আল্লাহ তা‘আলাকে আহ্বান করার পর আল্লাহ তাদেরকে সে বিপদ থেকে মুক্ত করেছিলেন।[২৩৯]

এতে প্রমাণিত হয় যে, শরী‘আত কর্তৃক নির্দেশিত যাবতীয় করণীয় ও বর্জনীয় কর্ম করে এর ওসীলায় ইহ-পরকালীন কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য আল্লাহর কাছে দো‘আ করা যেতে পারে।

---

[238]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল ইজারাহ, বাব নং- ১২ ; ৩/৭৯৩; মুসলিম, প্রাগুক্ত; কিতাবুয যিক্র, বাব : ক্বিস্যাতু আসহাবিল গারিস সালাসাতি, হাদীস নং- ১০০; ৪/২০৯৯।

[239]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; (কিতাবুয যিকির ওয়াদ দু’আ, বাব: তিন গুহাবাসীর ঘটনা...); ৪/২০৯৯।

ষষ্ঠ পন্থা : জীবিত মানুষের দো‘আর ওসীলায় আল্লাহর নিকট কিছু কামনা করা :

জীবিত মানুষের দো‘আর ওসীলা গ্রহণ করেও আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যেতে পারে। এ ওসীলা আবার দু’ভাবে হতে পারে :

এক. নিজের এবং নিজের সন্তানাদি ও পরিবারের ইহ-পরকালীন কল্যাণের জন্য কোনো মানুষের নিকট গিয়ে তাকে এ কথা বলা যেতে পারে যে, আমাদের জন্য একটু দো‘আ করুন বা আমাদের জন্য দো‘আ করবেন[২৪০]। দো‘আকারী ব্যক্তি তাৎক্ষণিক আমাদের

[240]. যদিও কারও কাছে দো‘আ চেয়ে বেড়ানো কুরআন ও রাসূলের সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় নি; কারণ এতে দু’টি সমস্যা রয়েছে, এক. বান্দা তার রব থেকে দূরে সরে যেতে পারে। দুই. শুধু শুধু কারও কাছে ছেয়ে বেড়ানোর মাধ্যমে নিজেকে হেয় করছে এবং অন্যের প্রতি মুখাপেক্ষী হচ্ছে। যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। সুতরাং বান্দা নিজেই এ কাজটি নিজের জন্য করা উচিত। যদি অন্যের কাছে দো‘আ চায়, তখন তার উদ্দেশ্যে থাকতে হবে যে যার কাছে দো‘আ চেয়েছি সে ব্যক্তি নিজেও আমার জন্য দো‘আ করা দ্বারা উপকৃত হতে পারে; কারণ, যে কেউ কারও জন্য তার অনুপস্থিতিতে দো‘আ করে ফেরেশতা বলতে থাকে, “তোমার জন্যও অনুরূপ হোক”। সুতরাং এর মাধ্যমে দো‘আপ্রার্থী ও দো‘আকারী

জন্য দো'আ করতে পারেন। ইচ্ছা করলে পরবর্তী সময়ে আমাদের অনুপস্থিতিতেও তা করতে পারেন। তবে অনুপস্থিত অবস্থার দো'আই সবচেয়ে উত্তম। কেননা, তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে বলে ইতোপূর্বে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে।

নবজাত শিশু ও রোগীদেরকে কারো কাছে নিয়ে যেয়ে তার নিকট তাদের জন্য দো'আ কামনা করাও এ জাতীয় ওসীলারই অন্তর্ভুক্ত। এ জাতীয় কর্ম রাসূলের সাহাবীদের মাঝে প্রচলিত ছিল। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে সন্তানদের নিয়ে আসা হতো, তিনি (দো'আ পাঠ করে তাদের গায়ে

উভয়েই সমভাবে উপকৃত হতে পারে। তাই কারও কাছে দো'আ চাওয়ার সময় উভয়ে উপকৃত হওয়ার এ নিয়ত থাকা আবশ্যক, নিছক নিজের জন্য কারও কাছে যাচঞ্ঞা করে বেড়ানো ইসলামের মূল শিক্ষার বিরোধী। এ বিষয়টি আরও জানার জন্য শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ লিখিত, 'আল-ওয়াসেতা-বাইনাল হাক্কি ওয়াল খালক' বা স্রষ্টাকে পেতে মাধ্যম গ্রহণ গ্রন্থটি (কামিয়াব প্রকাশনী কর্তৃক আমার দ্বারা অনুবাদ ও সম্পাদিত) দেখা যেতে পারে। [সম্পাদক]

হাত বুলিয়ে ঝাড়ফুঁক করে) তাদের উপর বরকত দিতেন এবং খুরমা চিবিয়ে তাদের মুখের তালুতে লাগিয়ে দিতেন।”[২৪১]

দুই. কারো নিকট নিজের কল্যাণের জন্য দো‘আ চাওয়া এবং তিনি তাৎক্ষণিক দো‘আ করলে নিজেও সে দো‘আয় শরীক হয়ে আল্লাহর কাছে নিজের জন্য দো‘আকারীর দো‘আ কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহুম্মা আ-মীন বলা। অথবা তার দো‘আর সাথে শরীক না হয়ে পরবর্তী কোনো সময়ে নিজে নিজের জন্য দো‘আ করার সময় তাঁর দো‘আর ওসীলা গ্রহণ করে এ কথা বলা যে, হে আল্লাহ! অমুক ব্যক্তি আমার জন্য যে দো‘আ করেছেন, তাঁর সে দো‘আ এর ওসীলা করে বলছি- আমার ব্যাপারে তাঁর দো‘আ কবুল করুন। এ জাতীয় ওসীলা করার বৈধতা নিম্নে বর্ণিত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয়:

প্রথম হাদীস

‘উছমান ইবনে হানীফ (রহ.) থেকে বর্ণিত। একজন অন্ধ মানুষ এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে বললো :

«أُدْعُ اللّٰهَ أَنْ يُعافِيْنِيْ . فَقَالَ لَهُ:"إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ ، وَ إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ". فقال:أُدْعُ. "فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ ، فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ ، فَيُصَلِّيْ

---

241. মুসলিম, প্রাগুক্ত; (কিতাবুত ত্বাহারত, পরিচ্ছদ : দুগ্ধপানকারী শিশুদের বরকত দানের হুকুম); ১/২৩৭।

رَكْعَتَيْنِ ، وَ يَدْعُوْ بِهَذَا الدُّعَاءِ : اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ وَ أَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ يَا مُحَمَّدُ إِنِّيْ تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّيْ فِيْ حَاجَتِيْ هَذِهِ فَتَقْضِيْ لِيْ ، اللَّهُمَّ فَشَفِّعْهُ فِيَّ". و في رواية "وَ شَفِّعْنِيْ فِيْهِ. قال الراوي : فَبَرَأَ الرَّجُلُ»

"হে রাসূল! আল্লাহর কাছে দো'আ করুন তিনি যেন আমার চক্ষু ফিরিয়ে দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন : তুমি চাইলে আমি তোমার জন্য দো'আ করবো, আর তুমি চাইলে ধৈর্য ধারণ করতে পারো, তা হলে তোমার জন্য তা মঙ্গল হবে। লোকটি বললো: দো'আ করুন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে উত্তমভাবে ওয়াযু করে দু'রাক'আত নামায আদায় করে নিম্নোক্ত দো'আর মাধ্যমে দো'আ করতে বললেন:হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে সওয়াল করছি এবং তোমার রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এর দো'আ)-এর ওসীলায় তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, হে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি তোমার (দো'আ এর) ওসীলায় আমার এই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তোমার রবের প্রতি মুখ ফিরালাম, অতএব আমার এই প্রয়োজন পূর্ণ করুন। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে তুমি তাঁর দো'আকে কবুল কর"। অপর বর্ণনায় রয়েছে : আমার সে ব্যাপারে আমার

দো‘আ কবুল কর।” এ হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন : লোকটি এভাবে দো‘আ করার পর সে সুস্থ হয়ে যায়।”[২৪২]

এ হাদীসে বর্ণিত লোকটির দো‘আর জন্য আবেদন করা অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষ থেকে তার জন্য দো‘আ করা বা না করার ব্যাপারে এখতিয়ার দেয়া, পরিশেষে রাসূলের পক্ষ থেকে তাকে উক্ত দো‘আ শিখিয়ে দেয়ার দ্বারা এ জাতীয় ওসীলার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয় হাদীস

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর যুগে যখন অনাবৃষ্টিজনিত কারণে তাঁরা অভাবে পতিত হতেন তখন তারা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দো‘আর ওসীলায় বৃষ্টি চাইতেন এবং ‘উমার তাঁর দো‘আয় বলতেন :

«اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا فَتَسْقِيْنَا، وَ إِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَاسْقِنَا ، قَالَ : فَيَسْقَوْنَ»

---

242. তিরমিযী, প্রাগুক্ত; ৪/৫৬৯; আব্দুর রহমান আল-মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; ৪/২৮১-২৮২।

“হে আল্লাহ! আমরা আমাদের নবীর মাধ্যমে আপনার নিকট বৃষ্টির জন্য দো‘আ চাইতাম, ফলে তুমি আমাদের বৃষ্টি দিতে, আমরা (এখন) আমাদের নবীর চাচার (দো‘আর) মাধ্যমে আপনার নিকট বৃষ্টি কামনা করছি.অতএব, আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন : এ ভাবে দো‘আ করার পর তাঁদের বৃষ্টি দান করা হতো।”[২৪৩]

এ হাদীস দ্বারাও অন্যের দো‘আর ওসীলায় দো‘আ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়।

ওসীলা করার অবৈধ পন্থা :

কেউ কেউ এ হাদীস দু’টি দ্বারা নবী ও ওলিদের জাতসত্তা, তাঁদের নাম, অধিকার ও মর্যাদার ওসীলায় দো‘আ করাকে জায়েয বলে দলীল দিয়ে থাকেন এবং এর ভিত্তিতেই তারা নবী, রাসূল, তথাকথিত গাউছ, কুতুব ও খাজেগানদের নাম ও মর্যাদার ওসীলায় দো‘আ করেন। রাসূল এর হুরমতের ওসীলায় দো‘আ করে বলেন :

---

[243]. বুখারী, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল ইস্তেসকা, পরিচ্ছদ : অনাবৃষ্টির সময় জনগণ কর্তৃক ইমামকে বৃষ্টি জন্য দু‘আ করতে বলা); ১/২/৭৫।

"سهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار"

“হে আল্লাহ সৈয়্যিদুল আবরার এর হুরমতের ওসীলায় যাবতীয় কঠিন সমস্যাদি সহজ করে দিন।”

অনেক সময় নামাযান্তে বা কোনো অনুষ্ঠান শেষে যৌথভাবে দো‘আ করার সময় বলে থাকেন: হে আল্লাহ সমস্ত নবী-রাসূল, সাহাবা, তাবেঈন, আইম্মায়ে কেরাম, গউছ, কুতুব ও খাজেগানদের ওসীলায় আমাদের অপরাধ মার্জনা করুন, ইহকাল-আখেরাতে কল্যাণ দান করুন এবং অকল্যাণ দূর করুন...ইত্যাদি।

তারা এ জাতীয় ওসীলা বৈধ বলে প্রমাণ করার জন্য বলেন: প্রথম হাদীস দ্বারা বাহ্যত প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তিকে তাঁর নাম ও মর্যাদার ওসীলায় দো‘আ করতে শিখিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ ব্যক্তির জন্য তাৎক্ষণিক কোনো দো‘আ করেছেন বলেও এ হাদীসের বর্ণনায় কোনো প্রমাণ নেই। তাদের মতে এতে বুঝা যায় যে, তিনি তাঁর নামের ওসীলায়ই তাকে দো‘আ করতে শিখিয়েছেন। আর দ্বিতীয় হাদীসেও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার দো‘আর ওসীলার কথা বর্ণিত না হওয়ায় তাদের মতে

এ-হাদীসের দ্বারাও নবী ও ওলিদের নাম, জাত ও মর্যাদার ওসীলায় দো'আ করার বৈধতা প্রমাণিত হয়। তবে নিম্নে বর্ণিত বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে, বাহ্যত উভয় হাদীস দ্বারা উক্ত সন্দেহের সম্ভাবনা প্রমাণিত হলেও আসলে প্রথম হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তিকে তাঁর নামের ওসীলায় দো'আ করতে বলেন নি। দ্বিতীয় হাদীসেও 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার জাত বা তাঁর মর্যাদার ওসীলায় দো'আ করেন নি। বরং উভয় হাদীস দ্বারাই তাঁদের দো'আর ওসীলা গ্রহণের কথাই প্রমাণিত হয়। লক্ষ্যণীয় বিষয়সমূহ নিম্নরূপ :

(ক) প্রথম হাদীসে যদিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো'আ করার কোনো বর্ণনা নেই, তবে এ না থাকাটি তাঁর দো'আ না করার বিষয়টিকে অকাট্যভাবে প্রমাণ করে না। কারণ, এ হাদীসের প্রথম ও শেষাংশের দিকে লক্ষ্য করলে তাঁর সে ব্যক্তির জন্য দো'আ করার কথাই প্রমাণিত হয়। কেননা, সেতো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে দো'আ করতে বলেছে এবং তিনিও

তাকে দো‘আ করা বা ধৈর্য ধারণ করার কথা বলেছেন এবং তাকে যে দো‘আ শিক্ষা দিয়েছেন তাতে তাকে এই বলতে বলেছেন : (اللَّهُمَّ فشفعه فِي) “হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফা‘আত তথা তাঁর দো‘আ কবুল কর”। এ সবের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে ব্যক্তির জন্য দো‘আ করেছিলেন। তবে বর্ণনাকারী তা বর্ণনা করাকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন নি। কারণ, তার দৃষ্টিতে সে ব্যক্তির জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো‘আ করার বিষয়টি বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই তার দৃষ্টিতে যা বলার প্রয়োজন, তিনি সেটুকুই বলেছেন।

(খ) এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সে ব্যক্তি দো‘আ করতে বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দো‘আ করার ওয়াদা দিয়েছেন। সে যখন দো‘আ করার বিষয়টি বেছে নিয়েছে, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য অবশ্যই দো‘আ করে থাকবেন। নতুবা এতে ওয়াদা খিলাফী হওয়া জরুরী হয়ে পড়বে, যা রাসূলের ব্যাপারে কল্পনা করা যায় না।

(গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যে দো‘আ শিখিয়েছেন তাতে বর্ণিত **(اللّٰهُمَّ فشفعه فِيَّ)** বাক্যটির অর্থ হচ্ছে- “হে আল্লাহ! তুমি আমার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দো‘আ কবুল কর”। এ কথাটি প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দো‘আ করেছিলেন। নতুবা সে ব্যক্তির দো‘আর মধ্যে তাকে এ কথা বলতে শিখানোর কোনো অর্থ থাকে না।

(ঘ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নাম, জাত ও মর্যাদার ওসীলা করে দো‘আ করা বৈধ হলে সে ব্যক্তির পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কাছে এসে দো‘আ চাওয়ার কোনো প্রয়োজন হতো না। তার নিজের বাড়ীতে বসেইতো সে তা করে নিতে পারতো। কিন্তু তা না করে যখন রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটে এসে তাঁর দো‘আ কামনা করেছে, তখন এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম, জাত ও মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করার দলীল গ্রহণ করা যায় না।

(ঙ) রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শেখানো এ-দো'আর উদ্দেশ্য যদি তাঁর নাম, জাত ও মর্যাদার ওসীলা গ্রহণই হয়ে থাকে এবং এ অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু ফিরে পাওয়ার পিছনে মূল রহস্য যদি রাসূলের জাতসত্তার ওসীলায় এ-দো'আর মাধ্যমে দু'আ করাই হয়ে থাকে, তা হলেতো অন্যান্য অন্ধরাও এ-দো'আ পাঠ করে তাদের চক্ষু ফিরে পেতেন। কিন্তু বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এতে প্রমাণিত হয় যে, সে ব্যক্তির চক্ষু ফিরে পাওয়ার পিছনে মূল রহস্য হচ্ছে তার জন্য রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দো'আ। তাঁর জাতের বা এ শিখানো দো'আ এর ওসীলা নয়।

(চ) বিশিষ্ট মনীষীগণ এ হাদীসকে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মু'জিযা হিসেবে গণ্য করেছেন। রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দো'আর ওসীলায় এ অন্ধ ব্যক্তির চক্ষু ফিরে পাওয়ার কারণেই তাঁরা এটাকে তাঁর নবুওয়াতের প্রমাণকারী বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন।[২৪৪]

---

[244]. আল্লামা মাসিরুদ্দিন আলবানী, আত তাওয়াসসুলু আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু; পৃ. ৮১।

উক্ত এ সব বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, হাদীসে বর্ণিত (أتوجه إليك بنبيك و توجهت بك إلى ربي) এ দু'টি বাক্যের অর্থ হবে (أتوجه إليك بدعاء نبيك و توجهت بدعائك إلى ربي), অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি তোমার নবীর দো'আর ওসীলায় তোমার দিকে মুখ ফিরালাম এবং তোমার দো'আর ওসীলায় আমার রবের দিকে মুখ ফিরালাম। (أتوجه إليك بنبيك) এ বাক্যের দ্বারা কোনো অবস্থাতেই 'তোমার নবীর নাম, জাত ও মর্যাদার ওসীলায় তোমার দিকে মুখ ফিরালাম' এ অর্থ গ্রহণ করা সঠিক নয়।

(ছ) দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা বাহ্যত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার নাম, জাত ও মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করে দো'আ করার বৈধতার যে সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় তাও এ হাদীসের অন্যান্য বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করলে দূর হয়ে যায়। প্রখ্যাত হাদীসবিদ ইসমা'ঈলী, যিনি ইমাম বুখারী (রহ.) থেকে তাঁর সহীহ গ্রন্থ বর্ণনা করেছেন, তাঁর বর্ণনায় এ হাদীসে রয়েছে :

«كَانُوْا إِذَا قَحَطُوْا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ اسْتَسْقَوْا بِهِ ، فَيَسْتَسْقِيْ لَهُمْ ، فَيَسْقَوْن ، فَلَمَّا كَانَ فِيْ إِمَارَةِ عُمَرَ...»الحديث

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে অনাবৃষ্টিতে পতিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে বৃষ্টির জন্য দো'আ চাইতেন, তখন তিনি তাদের জন্য বৃষ্টি চেয়ে দো'আ করতেন, ফলে বৃষ্টি হতো। অতঃপর যখন 'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতের সময় হয়...।"[২৪৫] (এ হাদীসের বাকী অংশটুকু উপরের হাদীসের অনুরূপ, তাই এখানে এর পুনরাবৃত্তি করা হলো না)। এ হাদীসে বর্ণিত (فيستسقي لهم) এ কথার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা দো'আর করার সময় স্রেফ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম ব্যবহার করে বৃষ্টি চাইতেন না, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের জন্য বৃষ্টি কামনা করে আল্লাহর নিকট দো'আ করতেন এবং তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দো'আকেই ওসীলা হিসেবে গণ্য করতেন।

---

[245]. ইবন হাজার, ফতহুল বারী; ২/২৯৯।

যেমন অপর এক ঘটনা দ্বারাও এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হয়। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

«أَصَابَ النَّاسُ سِنَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ فَاسْتَقْبَلَ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم قَائِمًا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ الله! هَلَكَ المَالُ وَ جَاعَ الْعِيَالُ ، فَادْعُ الله لَنَا ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ، و في رواية : فَمَدَّ يَدَيْهِ و دَعَا»

"রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে একদা লোকজন অভাবে পতিত হয়। একদিন রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- জুমু'আর দিনে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছিলেন, এমন সময় এক গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললো: হে আল্লাহর রাসূল ! সম্পদ সব নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং পরিবার পরিজন অনাহারে পতিত হয়ে গেছে, আপনি আমাদের জন্য দো'আ করুন। ফলে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম-দো‘আর জন্য তাঁর দু’হাত উঠালেন[২৪৬]। অপর বর্ণনায় রয়েছে: ফলে তিনি দু’হাত প্রলম্বিত করে উঠালেন এবং দো‘আ করলেন”।[২৪৭] ইসমা‘ঈলী এবং আনাস (রা. থেকে বর্ণিত হাদীস দু’টি দ্বারা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাচ্ছে যে, সাহাবীদের বৃষ্টির জন্য দো‘আ কামনা করা মূলত রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দো‘আর ওসীলায় ছিল, স্রেফ তাঁর নাম ও মর্যাদার ওসীলায় ছিল না।

(জ) এ-সময় আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কী কথা বলে দো‘আ করেছিলেন তা উপস্থাপন করলেও রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দো‘আ করার বিষয়টি আমাদের কাছে আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। তিনি এ বলে দো‘আ করেছিলেন :

---

[246]. বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুল জমাআঃ, বাব : জুমু‘আর দিনের খুতবায় বৃষ্টির জন্য দু‘আ করা); ২/২/৪৭।

[247]. তদেব।

«اللَّهُمَّ إِنَّه لَمْ يَنْزِلْ بَلاَءٌ إِلاَّ بِذَنْبٍ ولَمْ يُكْشَفْ إِلاَّ بِتُوْبَةٍ ، وَقَدْ تَوَجَّهَ الْقَوْمُ بِيْ إِلَيْكَ لَمَكَانِيْ مِنْ نَبِيِّكَ، وَ هٰذِهِ أَيْدِيْنَا إِلَيْكَ بِالذُّنُوْبِ وَنَوَاصِيْنَا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةِ ، فَاسْقِنَا...»

“হে আল্লাহ! নিশ্চয় অপরাধ সংঘটিত না হলে কোনো বিপদ অবতীর্ণ হয়না, আর তাওবা ব্যতীত তা দূর করা হয়না, আমি তোমার নবীর নিকটজন হওয়ার কারণে জনগণ আমার (দো‘আর) মাধ্যমে আপনার দিকে মুখ করেছে, আমরা আমাদের গুনাহমাখা হাতগুলো আপনার দিকে প্রসারিত করেছি এবং তাওবার সাথে আমাদের ললাটগুলো আপনার সমীপে অবনত করেছি, কাজেই আপনি আমাদের বৃষ্টি দান করুন...।”[২৪৮]

এ হাদীস দ্বারা যেমন এ কথাটি প্রমাণিত হয় যে, ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু মূলত আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার দো‘আর ওসীলা গ্রহণ করেই দো‘আ করেছিলেন, তেমনি আরো প্রমাণিত হয় যে, তাঁদের দ্বারা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু

---

[248]. ইবনে হাজার, ফতহুল বারী; ৩/১৫০।

আনহুমার দো‘আর ওসীলা গ্রহণ করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবিত থাকাকালীন সময়ে তাঁর দো‘আর ওসীলা গ্রহণ করার মতই ছিল। কাজেই এ হাদীস দ্বারাও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ওলিদের নাম, জাত ও মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ জায়েয হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা যায় না।

(ঝ) এ হাদীস থেকে এ জাতীয় অর্থ গ্রহণের কোনই সম্ভাবনা নেই; কেননা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম, জাত ও মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করে দো‘আ করা জায়েয হলে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদার ওসীলায় দো‘আ না করে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম ও মর্যাদার ওয়াসীলায়ই দো‘আ করতেন। কিন্তু তা না করে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সামনে রেখে বৃষ্টির জন্য উক্ত ধরনের দো‘আ করার দ্বারা এ কথা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশায় নিজেই দো‘আ করতেন বলে তাঁরা তাঁর দো‘আর ওসীলা

গ্রহণ করতেন। তাঁর অবর্তমানে তাঁরা তাঁর জীবিত চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর দো'আর ওসীলা গ্রহণ করেছিলেন।

(ঞ) কারো নামের ওসীলা গ্রহণ করে দো'আ করা জায়েয হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবার চেয়ে মর্যাদাবান হওয়ায় তাঁরা অনাবৃষ্টির সময় তাঁর নাম নিয়েই বৃষ্টি চাইতেন। কিন্তু তা না করে রাসূলের চেয়ে কম মর্যাদার অধিকারী আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওসীলা গ্রহণ করাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা মূলত তাঁর নামের ওসীলায় দো'আ কামনা করেন নি, বরং তাঁর দো'আর ওসীলায়ই বৃষ্টি কামনা করেছিলেন।

(ট) আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা একাধিকবার আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর মাধ্যমে অনাবৃষ্টির সময় দো'আ করেছিলেন। কারো মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করে দো'আ করা জায়েয হলে তাঁরা বার বার তাঁর মাধ্যমে দো'আ না করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের ওসীলায় দো'আ করতেন। কিন্তু তাঁরা তা না করাতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম, মর্যাদা ও হুরমতের ওসীলা গ্রহণ করে দো‘আ করা জায়েয নয়।

(ঠ) ‘আমরা আমাদের নবীর চাচার মাধ্যমে তোমার কাছে ওসীলা করছি’ এ কথা বলার উদ্দেশ্য যদি আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু এর নাম ও তাঁর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ হয়ে থাকে, তা হলে তাঁরাতো নিজ নিজ ঘরে বসেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করে দো‘আ করতে পারতেন। কিন্তু তা না করে তাঁরা তাঁর নিকটে আসাতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর দো‘আর ওসীলা গ্রহণের জন্যেই তাঁরা তাঁর নিকট এসেছিলেন। তাঁর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণের জন্যে নয়।

উপরে বর্ণিত এ সব বিষয়াদির প্রতি লক্ষ্য করলে এ কথাটি স্বতঃই প্রমাণিত হয় যে, এ উভয় হাদীস থেকে কোনো অবস্থাতেই নবী বা অলিগণের নাম, মর্যাদা ও জাতের ওসীলা গ্রহণ করে দো‘আ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

কারো বিশেষ মর্যাদা কাউকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে পারে না:

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বা ওলিগণ কে আল্লাহ তা'আলা যে মর্যাদা দিয়েছেন তা তাঁদের প্রতি আল্লাহর একটি করুণা বিশেষ। তাঁদেরকে এ মর্যাদা প্রদানের অর্থ এটা নয় যে, এ মর্যাদার দিক লক্ষ্য করে আল্লাহ তাঁদেরকে কোনো প্রকার বিপদ দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন না। আমাদের নবীর জীবনে তাঁর শত্রুদের পক্ষ থেকে অসংখ্য বিপদ এসেছে। বিভিন্ন সময় তিনি অসুস্থও হয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-নিজের মর্যাদার ওসীলায় স্বয়ং নিজেকে ভাগ্য বিড়ম্বনার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন নি। এমতাবস্থায় অন্যরা তাঁর মর্যাদার ওসীলায় কী করে রক্ষা পেতে পারে? বস্তুত তাঁর এ মর্যাদার ওসীলায় কেউ এ দুনিয়ায় যেমন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে না, তেমনি আখেরাতেও পারবে না। ইহ-পরকালীন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রয়োজন যথার্থ ঈমান ও সঠিক কর্মের। বিপদ যাতে না আসে সে জন্য সর্বাগ্রে আল্লাহর নিকট বিপদ থেকে আশ্রয় চাইতে হবে। যেসব কারণে বিপদ আসে তা থেকে সতর্ক থাকতে হবে। সকাল ও সন্ধায় দো'আ-কালাম পাঠ করে শরীরে ঝাড়ফুঁক দিতে হবে। এর পরেও যদি বিপদ এসে যায় তা হলে তা দূরীকরণের জন্য ওসীলার বৈধ পন্থা গ্রহণ করতে হবে। এতে আল্লাহর ইচ্ছা ও দয়া

হলে তিনি বিপদ দূর করে দেবেন। বিপদ দূর করার জন্য রাসূল বা অলিগণের নামের ওসীলায় আল্লাহর কাছে দো‘আ করা বিপদ দূরীকরণের কোনো উপযুক্ত ব্যবস্থা নয়। সেজন্য সলফে সালেহীনদের মাঝে এ-জাতীয় ওসীলা গ্রহণের কোনো প্রচলন লক্ষ্য করা যায় না।

কারো বিশেষ মর্যাদার ওসীলায় আখেরাতে কেউ বিপদ থেকে রক্ষা পাবেনা:

কারো মর্যাদার ওসীলায় যেমন কেউ ইহকালীন বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে না, তেমনি কেউ কারো মার্যাদার খাতিরে পরকালীন বিপদ থেকেও রক্ষা পেতে পারে না। যদি কেউ পারতো তা হলে সর্বাগ্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকটাত্মীয়রাই তা পারতেন। কিন্তু দেখা যায় রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ-জাতীয় সম্ভাবনার কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। তাঁর কোনো নিকটাত্মীয়দের মনে যাতে এ-জাতীয় ধারণার উদ্রেক না হয়, সে-জন্য তিনি তাদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তিনি বনী হাশিম ও বনী মুত্তালিব এমনকি তাঁর কলিজার টুকরা মা ফাতেমাকেও ডেকে বলে দিয়েছিলেন:

«لاَ أُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا»

"আমি আল্লাহর শাস্তির হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে পারবো না"।[২৪৯] আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অফুরন্ত মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তিনি যদি তাঁর মর্যাদার ওসীলায় তাঁর নিকটাত্মীয়দেরকে পরকালীন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে না পারেন, তাঁর আত্মীয়রা যদি আখেরাতে তাঁর মর্যাদার দ্বারা কোনো উপকার পেতে না পারে, তা হলে এ-জগতে আর কে থাকতে পারেন যিনি তাঁর নিজের মর্যাদার ওসীলায় তাঁর নিকটাত্মীয় ও ভক্তদেরকে পরকালীন বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারেন ?!

প্রকৃতকথা হচ্ছে-পরকালীন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপযুক্ত উপায় হচ্ছে-রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণে সঠিক ঈমান ও বিশুদ্ধ 'আমল দ্বারা নিজের জীবনকে পরিশুদ্ধ করা। যারাই এ যোগ্যতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হবে, তারাই হয় বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে, না হয় হালকা হিসেব হবে, প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আত লাভে ধন্য হবে। এর বাইরে প্রারম্ভে

---

[249]. আবু আব্দিল্লাহি দ্দারিমী, সুনান, (দার এহইয়াউস সুন্নাতিন্নববীয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন), ২/৩০৩৫।

কোনো পীর বা ওলির ওসীলায় কারো পার পাবার কোনই উপায় নেই। কিন্তু সাধারণ জনমনে ওলিদের ব্যাপারে এ-জাতীয় ধারণার জন্ম হওয়ার ফলেই তারা ওলিদের কবরে নানারকম উপাসনা করার মাধ্যমে তাঁদের সন্তুষ্টি অর্জন করতে চেষ্টা করে। এ-উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য তাদের কেউবা কবরের খেদমত করে, কেউবা সেখানে মানত করে। কেউবা সেখানে যেয়ে বসে থেকে ধ্যানে মগ্ন হয়ে মুরাক্কাবা ও মুশাহাদা করে। কেউবা কবরের পার্শ্বে নামায পড়ে। কেউবা সেখানে অনুনয় বিনয় করে দো'আ করে। কেউবা সেজদাবনত হয় ইত্যাদি...। আর এ-সব কর্মের মাধ্যমে তারা কবরস্থ ওলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর দয়া ও কৃপা অর্জন করতে চায় এবং তাঁদের দয়ার ওসীলায় আখেরাতে পরিত্রাণ পেয়ে আল্লাহর নিকটতম হতে চায়। তবে এ-জাতীয় কর্মকারীদের জানা আবশ্যক যে, তারা যে ধারণার ভিত্তিতে মাযার ও কবরে এ-সব কর্ম করেন, আরবের মুশরিকরাও ঠিক এ ধারণার ভিত্তিতেই তাদের ওলিদের মূর্তিকে কেন্দ্র করে এ-সব করতো। যার প্রমাণ এ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেই প্রদান করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার ওসীলায় দো'আ করা বৈধ সম্পর্কিত কতিপয় দলীল ও এর খণ্ডন:

ব্যক্তি নবী ও তাঁর মর্যাদা এবং হুরমতের ওসীলা গ্রহণকে যারা বৈধ মনে করেন তারা নিম্নে বর্ণিত দলীলসমূহ দ্বারা তাদের ধারণার সত্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা করে থাকেন।

প্রথম দলীল:

কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমন পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে ইয়াহূদীদের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

﴿ وَلَمَّا جَآءَهُمۡ كِتَٰبٞ مِّنۡ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٞ لِّمَا مَعَهُمۡ وَكَانُواْ مِن قَبۡلُ يَسۡتَفۡتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِۦۚ فَلَعۡنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ۝٨٩ ﴾ [البقرة: ٨٩]

“যখন তাদের (ইয়াহূদীদের)নিকট আল্লাহর এমন কিতাব এসে পৌঁছলো, যা তাদের নিকট থাকা কিতাবে (বর্ণিত বিষয়) এর সত্যায়ন করে, অথচ তারা ইতোপূর্বে তাদের কিতাবে বর্ণিত নবীর শুভাগমনের কথা ব’লে (অদূর ভবিষ্যতে আওছ এবং খযরজ গোত্রীয়) কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করতো। অতঃপর যখন তাদের কাছে সেই পরিচিত কিতাব এসে পৌঁছলো,

তখন তারা তা অস্বীকার করে বসলো। অতএব অস্বীকারকারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত''।[২৫০]

রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ বৈধ বলার দাবীদারগণ বলেন: উক্ত আয়াতে বর্ণিত **{وَ كَانُوْا مِنْ قَبلُ ...عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا}** এ-অংশ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের পূর্বে মদীনার আওছ ও খযরজদের সাথে ইয়াহূদীদের যুদ্ধ বাধলে তারা রাসূলের মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করে ওদের উপর বিজয়ী হওয়ার জন্য দো'আ করতো। অত্র আয়াতে আল্লাহ তাদের এ-ওসীলা গ্রহণের বিষয়টিকে প্রশংসামূলকভাবে বর্ণনা করায় এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম, মর্যাদা ও হুরমতের ওসীলা গ্রহণ করে দো'আ করা বৈধ হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হয়।[২৫১]

---

[250]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাঃ:৮৯।

[251]. অধ্যাপক আহমদ আনিসুর রহমান তাঁর একটি প্রবন্ধে উক্ত আয়াত দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মর্যাদার ওসীলা বৈধ হবার প্রমাণ

তাদের এ-দলীলের জবাব:

বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থে এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে মোট দু'টি ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। এর একটি হচ্ছে:

أن يهودا كانوا يستفتحون على الأوس و الخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم

"ইয়াহূদীরা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে আওস ও খযরজদের উপর বিজয় কামনা করতো"।[২৫২] অপরটি হচ্ছে:

يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه و سلم على مشركي العرب

"ইয়াহূদীরা নবী মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শুভাগমনের মাধ্যমে আরবের মুশরিকদের উপর বিজয় কামনা করতো"।[২৫৩]

হিসেবে পেশ করেছেন। প্রবন্ধটি দৈনিক ইনকিলাব পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। দেখুন: দৈনিক ইনকিলাব, ১০ ই অক্টোবর, ১৯৯৬ খ্রি.।

[252]. ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল 'আজীম; ১/১২৯।

[253]. তদেব।

এ-দু’টি ব্যাখ্যার মধ্য হতে প্রথমটির দ্বারা বাহ্যত সমাজে প্রচলিত ওসীলার বৈধতা প্রমাণিত হলেও দ্বিতীয়টি দ্বারা তা প্রমাণিত হয় না, কেননা, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে-তারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আগমনের ওসীলায় বিজয়ের জন্য দো‘আ করতো, তাঁর মর্যাদার ওসীলায় নয়। যার অর্থ দাঁড়ায়: তিনি আগমন করলে তারা তাঁর অনুসারী হয়ে ভবিষ্যতে তাদের শত্রুদের উপর বিজয়ী হবে। আর প্রথমটির দ্বারা মর্যাদার ওসীলার কথা বাহ্যত বুঝা গেলেও সাহাবা, তাবেঈ ও তাফসীরকারকগণ তা বুঝেন নি। কেননা, এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় আনসারদের বরাতে ইয়াহূদীদের যে-সব বক্তব্য বর্ণিত হয়েছে, তাতে দ্বিতীয় অর্থেরই সমর্থন পাওয়া যায়। আনসারদের বর্ণনানুযায়ী তারা তাদের শত্রুদের বলতো:

(أن نبيا سيبعث الأن نتبعه قد أظل زمانه فنقتلكم معه قتل عاد و إرم...)

“একজন নবী অচিরেই প্রেরিত হবেন, আমরা তাঁর অনুসরণ করবো, যার আগমনের সময় নিকটবর্তী হয়ে গেছে,

তখন আমরা তাঁর সাথে হয়ে তোমাদেরকে ‘আদ’ ও ‘ইরম’ জাতির ন্যায় পাইকারীভাবে হত্যা করবো”।[২৫৪]

বিশিষ্ট তাবেঈ আবুল ‘আলিয়া (রহ.) এর দৃষ্টিতে তারা তাদের এ ওসীলায় বলতো:

اللّٰهُمَّ ابعث هذا النبي الذي نجده مكتوبا عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم

“হে আল্লাহ! আমরা যাতে মুশরিকদেরকে শাস্তি দিতে ও হত্যা করতে পারি, সে-জন্যে আমাদের কিতাবে আমরা যে নবীর বর্ণনা পাই, আপনি তাঁকে প্রেরণ করুন”।[২৫৫]

উক্ত উদ্ধৃতিসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, উক্ত আয়াতের এ অংশ দ্বারা কোনোভাবেই রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ বৈধ হওয়ার অর্থ গ্রহণ করা যায় না। আর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমার প্রথম ব্যাখ্যার দ্বারা বাহ্যত এটি বুঝা গেলেও আসলে এর দ্বারা বাহ্যিক সে অর্থ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তিনি যে কথাটি বলতে চেয়েছেন তা

---

[254]. তদেব।

[255]. তদেব।

হলো: ইয়াহূদীরা আওস এবং খযরজ বংশের লোকদেরকে বলতো: আজ হয়তো আমরা তোমাদের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হচ্ছি, তবে অচিরেই একজন নবীর আগমন ঘটবে, তখন আমরা তাঁর অনুসরণ করে তোমাদের উপর যুদ্ধে বিজয়ী হবো। আমাদের অনেকের মাঝে ব্যক্তি রাসূল বা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার ওসীলায় দো‘আ করে কিছু কামনা করার যে রীতি রয়েছে, ঠিক সেভাবে তারা সমাগত ব্যক্তি রাসূল বা তাঁর মর্যাদার ওসীলা করে আল্লাহর নিকট তাঁর আগমনের পূর্বে তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক কোনো বিজয় কামনা করে কোনো দো‘আ করে নি। সে-জন্য ইমাম ইবনে কাছীর এ-আয়াতের অর্থ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন:

(أي وكانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد و إرم.)

“অর্থাৎ এ কিতাবসহ এ নবীর আগমনের পূর্বে যখন মুশরিকদের সাথে তাদের যুদ্ধ হতো তখন তারা সে নবীর আগমনের ওসীলা করে (ভবিষ্যতে) বিজয় কামনা করতো। তারা বলতো: নিশ্চয় অচিরেই শেষ যুগে একজন নবী প্রেরিত হবেন,

তাঁকে সাথে করে আমরা তোমাদেরকে ’আদ’ ও ‘ইরম’ জাতিকে আল্লাহ যেমন ধ্বংস করেছিলেন সেভাবে ধ্বংস করবো”।[২৫৬]

উল্লেখ্য যে, তারা যে তাদের কিতাবে বর্ণিত কিতাব ও নবীর আগমনের প্রতি ঈমান আনয়নের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, সে জন্য অত্র আয়াতে আল্লাহ তাদের প্রশংসা করেছেন। সে নবীর ওসীলায় দো‘আ করার জন্য মূলত তাদের প্রশংসা করা হয় নি। প্রতিক্ষিত সে কিতাব ও নবীর আগমনের পর তারা যখন ঈমান আনয়ন করে নি, তখন আল্লাহ অত্র আয়াতে তাদের সমালোচনাও করেছেন।

উক্ত বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আসলে উক্ত আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয় না। কাজেই যারা এর দ্বারা তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন, তারা ভ্রান্তির মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন[257]।

---

[256]. তদেব।

[257] তাছাড়া যদি নবীর ব্যক্তি সত্ত্বার ওসীলাই তারা দিত, আর তা কার্যকরী হত, তবে অবশ্যই তারা (তোমাদের বিশ্বাস মোতাবেক) সবসময় জয়লাভ করত, অথচ বাস্তবে সেটা ঘটে নি, তারা সবসময় জয়লাভ করে নি। [সম্পাদক]

দ্বিতীয় দলীল:

মক্কার কাফিরগণ সত্যের প্রতি হিংসা ও শত্রুতাবশত বলেছিল: "হে আল্লাহ মুহাম্মদের দ্বীন যদি আপনার নিকট থেকে প্রদত্ত সত্য দ্বীন হয়ে থাকে, তা হলে আপনি আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করুন অথবা আমাদের উপর মর্মন্তুদ শাস্তি নাযিল করুন।"[২৫৮]

আল্লাহ তাদের এ দো'আর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বলেন :

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡۚ ﴾ [الانفال: ٣٣]

"আপনি তাদের মাঝে থাকাবস্থায় আল্লাহ কখনই তাদেরকে শাস্তি দেবেন না "।[২৫৯] যারা ব্যক্তি রাসূল বা তাঁর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ বৈধ বলে মনে করেন তারা বলেন: এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মক্কার কাফিররা ব্যক্তি রাসূল বা তাঁর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ না করেও তিনি মক্কায় থাকার ওসীলায় তারা আল্লাহর সমূহ শাস্তি থেকে রক্ষা পেয়েছে। তাঁর কারণে আল্লাহ তাদের উপর

---

[258]. আল-কুরআন, সূরা আনফাল:৩২।

[259] .আল-কুরঅন, সূরা আনফাল:৩৩।

আযাব নাযিল করা থেকে বিরত রয়েছেন। কাফিররা যদি রাসূলের ওসীলা গ্রহণ না করেও তাঁর মর্যাদার ওসীলায় বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারে, তা হলে আমরা তাঁর ওসীলা গ্রহণ করে বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারবো না কেন?

তাদের এ-দলীলের জবাব:

কতিপয় কারণবশত এ আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় দো'আ করা জায়েয বলে প্রমাণ করা যায় না। কারণগুলো নিম্নরূপ:

1. কাফিররা যদি রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের ওসীলা গ্রহণ করার ফলে আযাব থেকে রক্ষা পেতো, তা হলে এমন কথা বলা যেতো। কিন্তু তারাতো তা করে নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের আযাব থেকে রক্ষা পাবার মূল কারণ রাসূলের মর্যাদার ওসীলা নয়। বরং অন্য কোনো কারণবশত তারা আযাব থেকে রক্ষা পেয়েছিল।
2. তাদের উপর আজাব নাজিল না হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা পূর্ব থেকে এ মর্মে একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছেন যে, কোনো জনপদের অস্বীকৃতির কারণে তাদের মাঝে তাদের নবী থাকাবস্থায় তাদেরকে পাইকারী আযাব

দ্বারা ধ্বংস করবেন না। আল্লাহর এই পূর্ব সিদ্ধান্ত না হলে অবশ্যই তিনি কাফিরদের দো‘আ কবুল করে তাদেরকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেন। রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদাই যদি কাফিরদের আজাব থেকে বাঁচার মূল ওসীলা হতো, তা হলে তো তিনি মক্কা থেকে চলে আসার পরপরই তাদের উপর শাস্তি এসে যেতো। কিন্তু তা তো আসে নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাদের শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার মূল কারণ রাসূলের ওসীলা নয়, বরং আল্লাহর উপর্যুক্ত পূর্ব সিদ্ধান্ত এবং আল্লাহর এ-জাতীয় সিদ্ধান্ত যে শুধু আমাদের রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ব্যাপারেই ছিল, তা নয়, বরং এটি ছিল সকল নবীদের উম্মতের ব্যাপারে আল্লাহর একটি চিরাচরিত নিয়ম।[২৬০] কাওমে ‘আদ, ছামূদ ও লূত্ব ইত্যাদি জাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করলেও দেখা যায় তাদের নবীগণ যতদিন তাদের মাঝে ছিলেন, ততদিন তাদের উপর আজাব আসে নি। তাঁরা তাদের জাতি থেকে দূরে চলে যাওয়ার পর তাদের উপর আল্লাহর আজাব নাজিল হয়েছিল।

3. আল্লাহর এ কর্মকে আমরা যদি ওসীলা হিসেবে গণ্য করি, তবুও এতে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর

---

[260].মাওলানা মুহাম্মদ শফী‘, প্রাগুক্ত; পৃ.৫৩০।

সত্তা বা তাঁর মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করা আমাদের জন্য বৈধ হয়ে যাবে না। কেননা, কোনো কর্ম আল্লাহর জন্য বৈধ হয়ে থাকলেও তা আমাদের জন্য বৈধ হয়ে যাওয়া জরুরী হয়ে যায়না। উদাহরণস্বরূপ শপথের কথা বলা যায়। আল্লাহর পক্ষে তাঁর যে কোনো সৃষ্টির নাম নিয়ে শপথ করা জায়েয; কিন্তু আমাদের জন্য তা জায়েয হওয়া তো দূরের কথা, তা শির্কে আকবার হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে।

উক্ত কারণসমূহের দিক লক্ষ্য করলে প্রমাণিত হয় যে, কোনো ভাবেই এ-আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম, হুরমত ও মর্যাদার ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

তৃতীয় দলীল:

'উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন:

«لَمَّا اقْتَرَفَ أَدَمُ الْخَطِيْئَةَ قَالَ : يَا رَبِّ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ لِمَا غَفَرْتَ لِيْ...»

“আদম-আলাইহিস সালাম-যখন অন্যায় করলেন তখন তিনি বলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট মুহাম্মদের অধিকারের ওসীলায় ক্ষমা ভিক্ষা করছি...”।[২৬১]

রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকার, মর্যাদা ও জাতের ওসীলা গ্রহণ করে দো‘আ করা বৈধ বলে দাবীদারগণ বলেন:এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলা গ্রহণ করে দো‘আ করা বৈধ।

---

[261]. হাদীসের অবশিষ্ট অংশ নিম্নরূপ: “তখন আল্লাহ বলেন:হে আদম ! মুহাম্মদকে সৃষ্টি না করা সত্ত্বেও তুমি কি করে তাঁকে জানতে পারলে? উত্তরে আদম বলেন:আপনি আমাকে সৃষ্টি করে আমার মাঝে রূহ প্রবিষ্ট করার পর যখন আমি মাথা উঁচু করলাম তখন আরশের পায়াতে لا إله إلا الله محمد رسول الله লিখিত দেখতে পেলাম। তখন ভাবলাম আপনি আপনার নামের সাথে সবচেয়ে প্রিয়ভাজনের নামকে মিলিয়ে থাকবেন। আল্লাহ বলেন: হে আদম তুমি ঠিক বলেছো, সে অবশ্যই আমার কাছে সবচেয়ে বেশী প্রিয়ভাজন। তুমি তাঁর হকের ওসীলায় আমার নিকট দু‘আ করেছো। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। আর মুহাম্মদ না হলে তোমাকে সৃষ্টি করতাম না”। দেখুন: আন্নীসাপুরী, আবু ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ‘আব্দুল্লাহ, **আল-মুসতাদরাক** ;সম্পাদনা: মুস্তফা আব্দুল কাদির আত্বা, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.), ২/৬৭২।

আর সে-জন্যেই আদম (আলাইহিস সালাম) তাঁর অধিকারের ওসীলা গ্রহণ করে দো'আ করেছিলেন।

তাদের এ দলীলের খণ্ডন:

এ-হাদীসটি যদিও রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারের ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করে, তবে দু'টি কারণে এ-হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়:

প্রথম কারণ:

ইমাম হাকিম (রহ.) এ-হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে দাবী ক'রে থাকলেও অন্যান্য হাদীস বিশেষজ্ঞগণ এ-হাদীসটিকে মিথ্যা ও বানোয়াট হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন। যেমন প্রখ্যাত হাদীস বিশেষজ্ঞ ইমাম যাহাবী বলেন:

(إنه حديث موضوع ؛لأن في سنده عبد الله بن مسلم ، و لا أدري من ذا ؟ و عبدالرحمن واه.)

"এ-হাদীসটি মাওদু' বা জাল। কারণ, এর সনদে 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুসলিম নামে এক বর্ণনাকারী রয়েছে, এ লোকটি কে? তা

আমি জানিনা। এর সনদে 'আব্দুর রহমান নামে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে, যার ব্যাপারে কিছুই জানা যায় নি''।[২৬২]

ইমাম ইবনে হাজার 'আসক্কালানী বলেন:

''এ-হাদীসটি বাতিল হাদীসের অন্তর্গত।[২৬৩] তিনি বলেন:এ-হাদীসের বর্ণানাকারীদের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে 'আব্দুল্লাহ, যিনি ইমাম লাইছ, মালিক ও ইবনে লাহী'আঃ এর নামে হাদীস তৈরীর অভিযুগে অভিযুক্ত, এ ব্যক্তির হাদীস লেখার যোগ্য নয়। ইমাম হাকিমের ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ হয় যে, তিনি তাঁর মুসতাদরাক গ্রন্থে (৩/৩৩২) 'আব্দুর রহমান ইবনে যায়দ এর অপর একটি হাদীস বর্ণনা করে সেটিকে সহীহ বলেন নি, বরং সেখানে বলেছেন: ইমাম বুখারী ও মুসলিম এ ব্যক্তিকে গ্রহণযোগ্য মনে করেন নি। এটি তাঁর একটি পরস্পর বিপরীতমুখী বক্তব্য।

---

[262]. ইবনে হাজার 'আসক্কালানী, **লেসানুল মীযান;** (বৈরুত: মুআসসাসাতুল এ'লাম লিল মাত্ববূ'আত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি,), ৩/৩৬০।

[263]. তদেব।

একস্থানে এ ব্যক্তিকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন এবং অপর স্থানে তাকে দুর্বল বলে আখ্যায়িত করেছেন"।[২৬৪]

দ্বিতীয় কারণ:

এ হাদীসের বক্তব্য কুরআনের সম্পূর্ণ বিপরীত। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আদম আলাইহিস সালাম মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারের ওসীলায় স্বীয় গুনাহ থেকে মার্জনা পেয়েছিলেন, অথচ কুরআন বলছে যে,

﴿ فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبِّهِۦ كَلِمَٰتٖ فَتَابَ عَلَيۡهِۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٣٧ ﴾ [البقرة: ٣٧]

---

264. তিনি বলেন,

إنه خبر باطل . وقال : عبد الله بن مسلم متهم بوضع الحديث على ليث و مالك وابن لهيعة. ولا يحل كتب حديثه. والعجب من الحاكم نفسه، فإنه قد أورد حديثا آخر في مستدركه (٣/٣٣٢)، بسند عبد الرحمن بن زيد و لم يصصحه ، بل قال: والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن بن زيد . و هذا تناقض ظاهر منه ، حيث وثقه في مكان و ضعفه في مكان آخر.

দেখুন: শায়খ নাসির উদ্দিন আলবানী, আততাওসসুলু আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু; পৃ.১১৫-১১৬।

"অতঃপর আদম স্বীয় রবের নিকট থেকে কিছু বাক্য শিখে নিলেন, ফলে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন, নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত তাওবা গ্রহণকারী ও দয়ালু"।[২৬৫] আদম -আলাইহিস সালাম- আল্লাহর নিকট থেকে যে বাক্যসমূহ শিক্ষা করেছিলেন তা সূরা আ'রাফের ২৩ নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। সে আয়াতটি নিম্নরূপ:

﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ۝٢٣ ﴾ [الاعراف: ٢٣]

"আদম ও হাওয়া বলেছিলেন: হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর অত্যাচার করেছি, তুমি যদি আমাদের ক্ষমা করে রহম না কর, তা হলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্গত হয়ে যাবো"।[২৬৬] ইমাম যমাখশারীর (মৃত ৫২৯হি:) মতে উক্ত এ দো'আ পাঠের ওসীলা করেই আদম-

---

[265]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাঃ:৩৭।

[266]. আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ: ৭।

(আলাইহিস সালাম)-আল্লাহর নিকট দো‘আ করেছিলেন।[২৬৭] ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে মাওকূফ সনদে বর্ণিত অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে যে, আদম আলাইহিস সালাম অন্যায় করার পর নিম্নোক্ত দো‘আ পাঠ করে আল্লাহর নিকট মাগফেরাত কামনা করেন:

[سبْحانَكَ اَللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ وَ تَبَارَكَ اسْمُكُ وَ تَعَالَى جَدُّكَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ فَاغْفِرْلِيْ إِنَّهُ لاَ يَغْفِرَ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ.][٢٦٨]

উক্ত দু’টি আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আদম আলাইহিস সালাম উক্ত এ দো‘আ শিক্ষা করে এর ওসীলায় আল্লাহর কাছে তাঁর কৃত অপরাধ মার্জনার জন্য দো‘আ করেছিলেন। মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারের ওসীলায় তিনি তাঁর অপরাধ মার্জনার জন্য দো‘আ করেন নি। আর ইবনে মাসউদ

---

[267]. যামাখশারী, জারুল্লাহ মাহমূদ ইবনে ওমর, **আল-কাশশাফ;** (কুতুবখানা মাজহারী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ১/১২৮; আল-ক্কুরতুবী, **আহকামুল কুরআন;** (আল-হাইআতুল মিশরিয়্যাতুল আ-ম্মাহ লিল কুত্তাব, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.), ১/১/৩২৪; আবু বকর জাবির আল-জাযাইরী, **আয়সারুত্তাফাসীর**; ১/৪৫।।

[268] . তদেব। টীকা দ্রষ্টাব্য।

রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত মাওকূফ হাদীস দ্বারা উক্ত দো'আ পাঠ করার কথা প্রমাণিত হয়। তাই সনদের দিক থেকে রাসূলের নামের ওসীলা গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীসটি দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি কুরআনের উক্ত আয়াত দু'টির মর্ম এবং ইবনে মাসউদের হাদীসের বিপরীতমুখী হওয়ায় সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, উক্ত হাদীসটি মিথ্যা। এ-জাতীয় হাদীস দ্বারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকার, মর্যাদা ও সত্তার ওসীলা গ্রহণ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

চতুর্থ দলীল: রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেছেন:

«تَوَسَّلُوْا بِجَاهِيْ فَإِنَّ جَاهِيْ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ»

"তোমরা আমার মর্যাদার ওসীলা কর, কেননা আল্লাহর কাছে আমার বড় ধরনের মর্যাদা রয়েছে"।[২৬৯]

এ দলীলের খণ্ডন:

---

[269]. আলহাইছামী, **মাজমাউয্ যাওয়াইদ; ৯/২৫৭; ত্ববরানী স্বীয় কাবীর ও আওসাত গ্রন্থে এবং হাকিম স্বীয় মুসতাদরাক গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলেছেন।**

এ হাদীসটি ইমাম ত্বাবরানী ও হাকিম সহীহ বলে সত্যায়ন করলেও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণের মতে তা সহীহ নয়। এ হাদীসের সনদে রওহ ইবনে সালাহ নামে একজন দুর্বল বর্ণনাকারী রয়েছেন। আবু নাঈম বলেছেন: “রওহ ইবনে সালাহ এ হাদীসটি এককভাবে বর্ণনা করেছেন। তাকে ইমাম ইবনে আদী দুর্বল বলে মন্তব্য করেছেন”।[২৭০] ইমাম ইবনে ইউনুস বলেছেন: “এ ব্যক্তি থেকে অনেক মুনকার (নির্ভরযোগ্য রাবীদের বর্ণনার বিপরীতমুখী) হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ইমাম দারকুত্বনী তার ব্যাপারে বলেছেন: হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে লোকটি দুর্বল”।[২৭১]

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাঃ স্বীয় ‘আলকাওয়াইদুল জালীলাঃ’ গ্রন্থের ১৩২ ও ১৫০ পৃষ্ঠায় বলেন:

[إنه لا يوجد لهذا الحديث أصلا في أي كتب الحديث ، و لا يذكره كحديث إلا من هو جاهل ، وليس لديه أدنى معرفة بعلم الحديث".]

---

[270]. আসফাহানী, আবু নাঈম আহমদ ইবন আব্দুল্লাহ, **হিলয়াতুল আউলিয়া; (স্থান বিহীন, দারুল কিতাবিল আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.)**, ৩/১২১।

[271]. শায়খ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আল-বানী, **আত্তাওয়াস সুলু আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু;** পৃ. ১১১।

“কোন হাদীসের কিতাবে এ হাদীসের কোনো ভিত্তি পাওয়া যায়না। জাহেল ও হাদীস সম্পর্কে যার কোনো জ্ঞান নেই কেবল সে ব্যতীত আর কেউই এটিকে হাদীস হিসেবে বর্ণনা করতে পারে না”।[২৭২]

তিনি আরো বলেন: “অবশ্যই আল্লাহর কাছে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা অন্যান্য রাসূলদের চেয়ে অধিক রয়েছে, তবে আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা মানুষের পারস্পরিক মর্যাদার মত নয়। কারণ, কারো পক্ষে আল্লাহর পূর্বানুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে কারো জন্যে শাফা‘আত করা সম্ভবপর নয়, পক্ষান্তরে একজন মানুষ তার মর্যাদার ওসীলায় অপর মানুষের কাছে তার অনুমতি ব্যতীতই শাফা‘আত করতে পারে, এটা এ-জন্য যে, শাফা‘আতকারী ও শাফা‘আত গ্রহীতা উভয়ই উদ্দেশ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সমভাবে শরীক। (অর্থাৎ এখানে শাফা‘আত দ্বারা তাদের উভয়ের উদ্দেশ্যই হাসিল হবে, উভয়েই উপকৃত হবে) কিন্তু আল্লাহর ব্যাপারটি এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেননা, কারো উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়া বা না হওয়া এককভাবে

---

[272]. তদেব।

আল্লাহর ইচ্ছার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল, এ-ক্ষেত্রে কেউ তার শাফা'আত দ্বারা তাঁর সাথে শরীক হতে পারে না"।[২৭৩]

উক্ত হাদীসটি সহীহ না হওয়াতে এবং রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার বিষয়টি ব্যবহারযোগ্য কোনো বিষয় না হওয়াতে এ হাদীস দ্বারাও রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদার ওসীলায় দো'আ করা বৈধ বলে প্রমাণিত হয় না।

পঞ্চম দলীল :

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাতা ফাতেমা বিনতে সা'দ মৃত্যুবরণ করলে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাঁর নিজের এবং তাঁর পূর্ববর্তী নবীগণের অধিকারের ওসীলায় আল্লাহর কাছে তার জন্য মাগফিরাত কামনা করেন"।[২৭৪]

---

[273]. তদেব।

[274]. এ হাদীসটি ইমাম হাকিম ও ইবনে হিববান বর্ণনা করে তা সহীহ বলে দাবী করেছেন। তবে প্রকৃতপক্ষে হাদীসটি সহীহ নয়।

এ হাদীস দ্বারাও রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকার ও মর্যাদার ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়।

এ দলীলের খণ্ডন:

এ হাদীসটি ইমাম হাকিম ও ইবনে হিববান বিশুদ্ধ বলে মতামত দিয়ে থাকলেও আসলে তা বিশুদ্ধ নয়। কারণ, হাদীসের সহীহ ও দুর্বল পরিচয়ের ক্ষেত্রে এ দু'জনের চেয়েও অধিক অভিজ্ঞ ইমাম ইবনে 'আদী, দারাকুত্বনী ও ইবনে মা'কূলা এ হাদীসের সনদে 'রওহ ইবনে সালাহ' নামক দুর্বল বর্ণনাকারী থাকায় এটাকে তাঁরা দুর্বল হাদীস বলে মন্তব্য করেছেন। হাদীস বর্ণনাকারীদের নির্ভরযোগ্য ও দুর্বল বলে আখ্যা দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁরা দু'জন কাঠিন্যতা আরোপ না করার কারণেই এ ব্যক্তিকে তাঁরা নির্ভরযোগ্য বলেছেন। তবে অন্যান্যরা এ ব্যক্তিকে দুর্বল বলেছেন। এমনকি এ ব্যক্তিকে তাঁরা অনেক 'মুনকার' হাদীস বর্ণনাকারী বলেও অভিযুক্ত করেছেন।[২৭৫]

---

[275]. শায়খ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আল-বানী, **সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দয়ীফাতি ওয়াল মাওদু'আঃ**; (বৈরুত: ১ম সংস্করণ), ১/৩৯৯; ইমাম সাগানী, **আল-আহাদীসুল মাওদু'আঃ**;পৃ.৭।

কাজেই এ হাদীস দ্বারাও রাসলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অধিকারের ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

আল্লাহর উপর কারো কোনো অধিকার নেই:

এ হাদীসটি সঠিক না হওয়ার প্রমাণ হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে নবী-রাসূল ও ওলিগণ নির্বিশেষে আল্লাহর উপর কারো কোনো অধিকার বলতে কিছুই নেই। যারা ঈমান ও ‘আমলে সালেহ এর গুণে গুণান্বিত হবেন, তাদেরকে মহান আল্লাহ যে পুরস্কার ও মর্যাদা দানের কথা বলেছেন, তা তাদের ঈমান ও ‘আমলের কারণে এমনিতেই আল্লাহর উপর তাদের জন্যে ওয়াজিব হয়ে যায় নি। বরং তা তাদের প্রতি তাঁর একান্ত কৃপা বিশেষ। তিনি অনুগ্রহ করে তাদের জন্য কিছু অধিকারের স্বীকৃতি দান করেছেন। তবে তা এমন কোনো অধিকার নয় যে, তা আল্লাহর নিকট থেকে দাবী করে আদায় করে নেয়া হবে বা এর ওসীলায় আল্লাহর কাছে কিছু চাওয়া যাবে। এ-ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও সাধারণ মানুষ বলে কোনো পার্থক্য নেই। আল্লাহর উপর মানুষের কোনো অধিকারের অস্বীকৃতি জানিয়ে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন:

«...لَنْ يُدْخِلَ أَحَدُ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ . فَقِيْلَ لَهُ : وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ فَقَالَ : وَ لاَ أَنَا ، إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللهُ بِرَحْمَتِه»

"...কস্মিনকালেও কাউকে তার সৎ কর্ম জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। তাঁকে বলা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! আপনিও কি পারবেন না ? তিনি বলেন: আল্লাহর রহমত দ্বারা তিনি আমাকে বেষ্টন না করলে আমিও পারবো না"।[২৭৬] আল্লাহর উপর যেখানে মানুষের কোনো অধিকারই স্বীকৃত নয়, সেখানে আবার কী করে আল্লাহর কাছে সে অধিকারের ওসীলায় কিছু চাওয়া যেতে পারে? এ-জন্যই ইমাম আবু হানীফা (রহ.) বলেছেন:

[لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، و الدعاء المأذون فيه المأمور به، ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.]

" কারো পক্ষে আল্লাহ তা'আলাকে কেবল তাঁরই নামের ওসীলা ব্যতীত এবং "আল্লাহর রয়েছে উত্তম নামাবলী, অতএব তাঁকে সে নামের ওসীলায়ই আহ্বান কর" এ আয়াত থেকে যে-সব নামাবলীর ওসীলায় তাঁকে আহবানের অনুমতি ও নির্দেশ

---

276. সহীহুল বুখারী; কিতাবুর রিক্বাক, বাব: [باب القصد و المداومة على العلم সর্বদা জ্ঞানার্জনে লেগে থাকা), ৪/৩/১৭৭।

পাওয়া যায়, সে-সব নামাবলীর ওসীলা ব্যতীত অপর কারো নামের ওসীলায় আহ্বান করা উচিত নয়''।[২৭৭] তিনি আরো বলেন:

(أكره أن يقول أحد في دعائه اللّٰهُمَّ إني أسالك بحق خلقك)

''হে আল্লাহ ! আমি তোমার সৃষ্টির অধিকারের ওসীলায় তোমার কাছে সাওয়াল করছি' কেউ তার দো'আর মধ্যে এমন কথা বলাকে আমি অপছন্দ তথা না জায়েয[২৭৮] মনে করি''।[২৭৯]

আল্লামা ইবনু আবীল 'ইয্য আল-হানাফী (রহ.) এ-জাতীয় ওসীলা করার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন:

''আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিজের উপর যে অধিকারের কথা স্বীকার করেছেন, তা ব্যতীত আল্লাহর উপর কারো কোনো অধিকার নেই। ... আল্লাহর উপর আমাদের যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা তাঁর প্রতিশ্রুতি প্রদানের কারণেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। একজন মানুষের অধিকার অপর মানুষের উপর যে-ভাবে প্রতিষ্ঠিত

---

[277]. শেখ নাসিরুদ্দীন আল-বাণী, আত্তাওয়াস সুলু আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু; পৃ.৫১। শেখ আলবানী একথাটি 'দুররুল মুকতার' গ্রন্থের (২/৬৩০) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

[278]. সালাফে সালেহীন অপছন্দ বলে নাজায়েয বুঝাতেন। এ ব্যাপারে ইমাম ইবনুল কাইয়্যেম তাঁর ই'লামুল মুওয়াক্কে'য়ীন, নামক গ্রন্থে বিস্তারিত দলীল প্রমাণাদি উপস্থাপন করেছেন। [সম্পাদক]

[279]. তদেব।

হয়, কোনো মানুষ সে-ভাবে আল্লাহর উপর নিজ থেকে কোনো অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না।''[২৮০]

তিনি আরো বলেন:''কারো অধিকারের ওসীলায় দো'আ করা আর দো'আকারী ব্যক্তির দো'আ কবুল করার মাঝে কোনো সম্পর্ক নেই। যে এরকম দো'আ করে সে যেন প্রকারান্তরে এমন কথা বলে: হে আল্লাহ! অমুক আপনার সৎ বান্দাদের মধ্যে হওয়ার কারণে আমার দো'আ কবুল কর। (আপনার অমুক সৎ বান্দা আর আমার দো'আ কবুল কর) এ দু'টি কথার মধ্যে কী সম্পর্ক ও বাধ্যবাধকতা থাকতে পারে ? বরং এ-জাতীয় কথা দো'আর মধ্যে বলা এক ধরনের সীমালঙ্ঘন বৈ আর কিছুই নয়''।[২৮১]

---

[280]. তিনি বলেন:

... "وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، كقوله تعالى: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) سورة الروم: ٤٧، ...فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق "...

দেখুন: ইবনু আবিল ইয্য আল-হানাফী, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬১।

[281]. তিনি বলেন:

"قوله بحق فلان (فإن فلانا و إن كان له حق على الله بوعده الصادق) فلا مناسبة بين ذلك و بين إجابة دعاء هذا السائل ، فكأنه يقول : لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، و أي مناسبة في هذا و أي ملازمة ؟ و إنما هذا من الاعتداء في الدعاء ".

দেখুন: তদেব; পৃ. ২৬২।

ইমাম আবু ইউছুফ (রহ.) বলেন: ‘‘কেউ তার দো‘আর মধ্যে ‘হে আল্লাহ ! আমি অমুকের অধিকার অথবা তোমার নবী ও রাসূলদের অধিকারের ওসীলায় তোমার নিকট চাচ্ছি’ এমনটি বলাকে আমি অপছন্দ করি’’।[২৮২]

উক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বা অপর কারো অধিকারের ওসীলায় দো‘আ করা আমাদের হানাফী মাযহাবে বৈধ নয়।

ষষ্ঠ দলীল:

ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণের জন্য তারা লোকমুখে বহুল প্রচলিত একটি হাদীস দ্বারা দলীল দিয়ে থাকেন। হাদীসটি নিম্নরূপ:আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

«لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ»

---

282. তিনি বলেন,

(إني أكره أن يقول أحد في دعائه : اللّٰهُمَّ إني أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك و رسلك)

নাসিরুদ্দীন আলবানী, আত্তাওয়াস সুলু আনওয়াউহু ওয়া আহকামুহু; পৃ.৫১।।
ইমাম কারখী হানাফী কর্তৃক লিখিত ‘কুদূরী’ গ্রন্থের ব্যাখ্যা এর ‘কারাহাত’ অধ্যায় থেকে একথাটি তিনি বর্ণনা করেছেন।

“হে মুহাম্মদ! তুমি না হলে অমি জগত সৃষ্টি করতাম না”।

তাদের মতে আল্লাহ তা‘আলা যদি রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওসীলায় এ-জগত সৃষ্টি করে থাকেন। তা হলে আমাদের পক্ষে তাঁর ওসীলা গ্রহণ করা অবৈধ হতে পারে না।

এ দলীলের খণ্ডন:

এ হাদীসটি লোকমুখে বহুল প্রচলিত হয়ে থাকলেও মূলত এটি কোনো হাদীস নয়। ইমাম সাগানী এটিকে মাওদু‘ হাদীস বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৮৩] এ হাদীসের অর্থ [لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا] “তুমি না হলে আমি এ-দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না”-এ মর্মে

---

[283]. আস-সুয়ূতী, আল-লাআলী উল মাসনূ‘আতু ফীল আহাদীসিল মাওদু‘আঃ; ১/২৭২; শায়খ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আল-বানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দয়ীফাতি ওয়াল মাওদু‘আঃ; পৃ.১/২৯৯।

বর্ণিত হাদীস দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করলেও ইমাম ইবনুল জাওযী ও ইমাম সুয়ূতী এ হাদীসকেও মাওদু‘ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[২৮৪]

এ দু’টি হাদীস সহীহ হলেও এর দ্বারা আমাদের পক্ষে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের ওসীলা গ্রহণ করে দো‘আ করা বৈধ হবে না। কেননা, আল্লাহর জন্য কোনো কাজ বৈধ হয়ে থাকলেও আমাদের জন্য তা বৈধ হতে হলে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ ব্যতীত তা আপনা আপনি বৈধ হয়ে যায় না। তিনি তাঁর উত্তম নামাবলীর ওসীলা গ্রহণ করে আমাদেরকে দো‘আ করতে আদেশ করার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তাঁর নাম ব্যতীত অপর কারো নামের ওসীলায় তাঁর কাছে দো‘আ করা বৈধ নয়।

---

[284]. আস্সুয়ূতী, প্রাগুক্ত; ১/২৭২; শায়খ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন আল-বানী, সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দয়ীফাতি ওয়াল মাওদু‘আঃ;১/২৯৯।

সপ্তম দলীল:

উমাইয়্যাঃ ইবন 'আব্দুল্লাহ নামক তাবেঈ থেকে একটি মুরসাল হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, "রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-অভাবী মুহাজিরদের ওসীলায় যুদ্ধে জয় কামনা করতেন"।[২৮৫] এ হাদীসেও মুহাজিরদের দো'আর কথা বর্ণিত হয় নি। যার ফলে রাসূল ও নেক মানুষদের নাম, জাতসত্তা ও মর্যাদার ওসীলায় দো'আ করা বৈধ বলে দাবীদারগণ এ হাদীস দ্বারাও দলীল দিয়ে থাকেন।

এ দলীলের খণ্ডন:

এ হাদীসটি মুরসাল হয়ে থাকলেও সনদের দিক থেকে সর্ব সম্মতভাবে তা সহীহ। কিন্তু এর দ্বারাও কারো নাম, জাতসত্তা, মর্যাদা ও হুরমতের ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

---

[285] . তাতে এসেছে,

عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال ثم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح بصعاليك المهاجرين

আত-ত্ববরানী, সুলায়মান ইবন আহমদ, আল-মু'জামুল কবীর; (মুসেল:মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.), ১/২৯২।

কেননা; এ হাদীস দ্বারা মূলত নিঃস্ব মুহাজিরদের জাত ও নামের ওসীলায় দো‘আ করার কথা উদ্দেশ্য করা হয় নি। বরং তাতে তাঁদের দো‘আর ওসীলায় দো‘আ করার কথাই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। বিশিষ্ট মনীষীদের বক্তব্যের দ্বারা এ সত্যই পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন শেখ মানাবী জামি‘উস সগীর গ্রন্থে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় লিখেছেন:

“মুসলিমদের মধ্যকার ফকীরদের দ্বারা বরকত অর্জন করে তাঁদের দো‘আর ওসীলায় রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বিজয় কামনা করেছিলেন। তাঁদের মানসিক বিপর্যয় সাধিত হওয়ার কারণে তাঁদের দো‘আ অধিক গৃহীত হওয়ার আশায় তাঁদের দো‘আর ওসীলা গ্রহণ করেছিলেন। মুল্লা ‘আলী আল-ক্বারী আল-হানাফী (রহ.) বলেন: “সম্ভবত মুহাজিরদেরকে নির্দিষ্ট করার কারণ হচ্ছে-তাঁরা ছিলেন গরীব, মজলূম, নিপীড়িত ও মুজাহিদ;ফলে তাঁদের দো‘আর প্রভাব অন্যান্য সাধারণ মু’মিন ও ধনীদের দো‘আর চেয়ে অধিক হতে পারে ভেবে তাঁদের দো‘আর ওসীলা গ্রহণ করেছিলেন”।[২৮৬]

---

[286] قال المناوي في شرح الجامع الصغير قوله يستنصر بصعاليك المسلمين أي يطلب النصر بدعاء فقرائهم تيمنا بهم ولأنهم لانكسار خواطرهم دعاءهم أقرب إجابة ورواه في شرح السنة بلفظ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين قال القاري أي

রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মর্যাদা, হক ও জাতের ওসীলা গ্রহণ করা বৈধ বলে যারা দাবী করেন তারা উক্ত দলীলসমূহ ছাড়াও আরো কিছু অপ্রচলিত হাদীস বা ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ দ্বারাও তা বৈধ বলে প্রমাণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে থাকেন। যেমন একটি ঘটনার বর্ণনায় রয়েছে: একদা উম্মে আয়মান রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশ্রাব পান করেছিলেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- তাঁকে বলেছিলেন:

"আজকের পরে তোমার কখনও পেটের পীড়া হবেনা"।[২৮৭]

অনুরূপভাবে অপর এক ঘটনায় রয়েছে যে, মালিক ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রক্ত পান করেছিলেন। এতে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন:

بفقرائهم وببركة دعائهم ... ولعل وجه التقييد بالمهاجرين لأنهم فقراء غرباء مظلومون مجتهدون مجاهدون فيرجى تأثير دعائهم أكثر من عوام المؤمنين وأغنيائهم. انتهى **দেখুন:** আব্দুররহমান আল-মুবারকপুরী, প্রাগুক্ত; ৫/ ২৯১।

287. ইবনে কাছীর, আলবেদায়াতু ওয়ান নেহায়াঃ; ২/২/২৭৩।

"আমার রক্ত যার রক্তকে স্পর্শ করেছে তাকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করতে পারবে না"।[২৮৮]

উম্মে আয়মান এর ঘটনাটির বর্ণনা কোনো হাদীস গ্রন্থে নেই। ইবনে কাছীর স্বীয় ইতিহাস গ্রন্থে ইমাম আবু ইয়া'লা এর মুসনাদের বরাত দিয়ে এ ঘটনাটি বর্ণনা করলেও তিনি তা সহীহ না দুর্বল-এ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেন নি। যদি এটিকে একটি বিশুদ্ধ বর্ণনা হিসেবেও ধরে নেয়া হয়, তবুও এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করা যাবে না। কেননা, ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, তিনি পিপাসার তাড়নায় এমনটি করেছিলেন। এর দ্বারা বরকত গ্রহণ করে বিভিন্ন অসুখের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে তা পান করেন নি। তিনি যদি এ কারণে পেটের পীড়া থেকে রক্ষা পেয়েও থাকেন, তবে তা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দো'আর বরকতে হয়ে থাকবে, তাঁর প্রশ্রাব পান করার কারণে নয়। কেননা, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশ্রাব পান করা যদি জায়েয হতো, এর দ্বারা যদি বরকত গ্রহণ করা জায়েয হতো, তা হলে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি, শরীরের ঘাম ও থুথু

---

[288]. ইবনে হেশাম, প্রাগুক্ত;১/৮০।

দ্বারা যেমন বরকত গ্রহণ করতেন, তেমনি তাঁর প্রশ্রাব দ্বারাও বরকত গ্রহণ করতেন। কিন্তু বাস্তবে এর কোনো প্রমাণ নেই। কাজেই প্রমাণিত হয় যে, এ ঘটনার দ্বারা রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর নাম ও জাতের ওসীলা গ্রহণ করার বৈধতা প্রমাণ করা যায় না।

আর মালিক ইবনে সিনান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনাটি ইবনে কাছীর ইবনে হেশাম থেকে বর্ণনা করলেও এ বর্ণনাটি বিশুদ্ধ কি না, তিনি তা উল্লেখ করেন নি। তিনি বরং এর পাশাপাশি অপর একটি ‘মুরসাল’ হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খাদেম সালিম রাদিয়াল্লাহু আনহু উহুদের যুদ্ধে রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রক্ত পান করেছিলেন।[২৮৯] এ বর্ণনাটি প্রমাণ করে যে, মালিক ইবনে সিনান এর রক্ত পান সংক্রান্ত বর্ণনাটি সঠিক নয়। ঘটনা যদি সঠিকও হয়, তবুও এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম, জাতসত্তা, মর্যাদা ও হুরমতের ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণ করা যাবে না। কেননা, মালিক ইবন সেনান রাদিয়াল্লাহু আনহু তো রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দ্বারা ওসীলা গ্রহণের জন্য তাঁর

---

[289]. ইবনে কাছীর, আলবেদায়াতু ওয়ান নেহায়াঃ;২/৪/২৪।

রক্ত পান করেন নি। বরং রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা এবং তাঁর রক্তের দ্বারা বরকত গ্রহণের উদ্দেশ্যেই তিনি তা পান করেছিলেন। আর এ-কারণেই রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- তাঁর জন্য এ দো'আ করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জীবদ্দশায় বা তাঁর তিরোধানের পর তাঁর শরীরের সাথে সম্পর্কযুক্ত কিছু দিয়ে বরকত গ্রহণ বৈধ হওয়া আর তাঁর নাম ও মর্যাদা বা অধিকার দিয়ে ওসীলা করা কোনভাবেই এক জিনিস নয়। যারা এটিকে এক ভাবেন তারা যে ভুলের মধ্যেই রয়েছেন- তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এ-ছাড়াও তারা আরো কিছু মিথ্যা হাদীস দ্বারা তা প্রমাণের চেষ্টা করে থাকেন। বর্ণনা দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার কারণে তা উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

সারকথা:

এ দীর্ঘ আলোচনার দ্বারা এ-কথা প্রমাণিত হলো যে, মহান আল্লাহ এ জগতের কোনো নবী বা ওলিকে তাঁর ও তাঁর বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য নির্ধারণ করেননি। এটি সাধারণ মানুষের মাঝে শয়তানের দেয়া একটি ভ্রান্ত ধারণা

বৈ আর কিছুই নয়। শয়তান এ ভ্রান্ত চিন্তাধারাটিকে যেমন জাহেলী যুগের মুশরিকদের মধ্যে চালিয়ে দিয়েছিল, তেমনি তা ইসলাম পরবর্তী যুগের বহু মুসলিমদের মধ্যেও চালিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে। মহান আল্লাহ অতীব দয়াবান। তিনি তাঁর বান্দাদের অপরাধ মার্জনা করার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রয়েছেন। তারা তাদের যাবতীয় সমস্যার কথা তাঁর সমীপে নিজেরাই সরাসরি উপস্থাপন করতে পারে। এ জন্য মৃত বা জীবিত কোনো নবী বা ওলিদের মধ্যস্থা গ্রহণের কোনই বাধ্যবাধকতা নেই। কেননা, সৎ ও অসৎ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই তাঁর রহমতের দরজা সমানভাবে উন্মুক্ত। তারা তাদের মনের কথা তাঁর নিকট কোনো ওসীলা ছাড়াই বলতে পারে। তবে যেহেতু আল্লাহর নিকট কিছু চাওয়ার পূর্বে কোনো সৎ কর্মের ওসীলায় চাওয়া তাঁর নিকট কিছু চাওয়ার আদাবের অন্তর্গত, সে-জন্যে তাঁরা তাঁর (আল্লাহর) নামের ওসীলায় বা ওসীলার অন্যান্য যে-সব বৈধ পন্থা রয়েছে, সে-সবের ওসীলায় তা চাইতে পারে। জীবিত সৎ মানুষের দো'আর ওসীলা গ্রহণ বৈধ ওসীলার একটি প্রকার হয়ে থাকলেও মৃত সৎ মানুষের নাম ও মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করার কোনই বৈধতা নেই। কেননা, এটি কোনো সৎকর্ম নয়। বরং এটি আল্লাহর নামের ওসীলা গ্রহণের পরিবর্তে তাঁর সৃষ্টির নামের ওসীলা গ্রহণের শামিল। এ জাতীয় ওসীলাকারীর মনের অবস্থার

পরিপ্রেক্ষিতে তা শির্কের মত জঘন্য অপরাধে পরিণত হতে পারে। সর্বোপরি এ জাতীয় ওসীলার চিন্তাধারা শয়তান কর্তৃক মুসলিম সমাজে প্রচলিত হওয়ায় এমন ওসীলা গ্রহণ করা থেকে আখেরাতে মুক্তি পাগল মুসলিমদের সতর্ক থাকা আবশ্যক।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পার্থিব ও পরকালীন বিষয়ে অলিগণের শাফা‘আত

শয়তান মুসলিমদেরকে পথভ্রষ্ট করে তার অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য কৌশল হিসেবে দ্বিতীয় যে বিষয়টিকে বেছে নিয়েছে তা হচেছ-পার্থিব ও পরকালীন বিষয়ে অলিগণের শাফা‘আত সম্পর্কিত বিষয়টি। মানুষ জীবিত থাকলে কারো পার্থিব কোনো বিষয়ে অপর কোনো মানুষের কাছে সুপারিশ করতে পারে। অনুরূপভাবে কারো কোনো বিষয়ে আল্লাহর কাছে দো‘আও করতে পারে। কিন্তু কোনো মানুষ মরে যাওয়ার পরেও কি জীবিত থাকার ন্যায় তার কাছে অপর কোনো মানুষ বা আল্লাহর কাছে কোনো বিষয়ে শাফা‘আতের জন্য তার নিকট আবেদন করা যায়? শয়তান এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ আর ওলিদের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে দিয়েছে। ইসলাম পূর্ব যুগে খ্রিষ্টানদের মধ্যে তাদের সৎ মানুষদের ব্যাপারে এবং আরবের মুশরিকদের মধ্যেও সৎ মানুষ ও ফেরেশতাদের নামে নির্মিত দেব-দেবীদের ব্যাপারে শাফা‘আত সম্পর্কে শয়তান যে ধারণা দিয়েছিল, সাধারণ মুসলিমদের মাঝে ওলিদের ব্যাপারেও সে অনুরূপ ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

শাফা'আত সম্পর্কে আরবের মুশরিক ও খ্রিস্টানদেরকে শয়তানের দেয়া ধারণা

ইসলাম পূর্ব যুগে খ্রিষ্টান এবং আরবের মুশরিকদের মাঝে শয়তান সৎ মানুষ ও ফেরেশ্তাদের নামে নির্মিত পাথর ও গাছের মূর্তি ও প্রতিমাসমূহের ব্যাপারে এ ধারণা দিয়েছিল যে, মানুষেরা যেমন একে অপরের নিকট তাদের মর্যাদা বলে সাধারণত পরস্পরের পূর্বানুমতি ছাড়াই সুপারিশ করতে পারে, তেমনি তাদের এ-সব মূর্তি ও দেব-দেবীসমূহ আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা বলে আল্লাহর অনুমতি ছাড়াই মানুষের কল্যাণে সুপারিশ করতে পারে।[২৯০] এ ধারণার ভিত্তিতেই বিশেষ করে আরবের মুশরিকরা তাদের দেব-দেবীদেরকে সাহায্য ও সুপারিশের জন্য আহ্বান

---

[290].এ সম্পর্কে আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য আল- হানাফী বলেন:

"ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال : فالمشركون و النصارى و المبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا . و المعتزلة و الخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر . و أما أهل السنة و الجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر و شفاعة غيره ، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له حدا ".

- ইবনু আবিল ইয্য আল-হানাফী, প্রাগুক্ত; পৃ.২৬০।

করতো। আল্লাহ তাদের এ-জাতীয় ধারণা ও আহবানের সমালোচনা করে বলেন:

﴿ وَيَعۡبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمۡ وَلَا يَنفَعُهُمۡ وَيَقُولُونَ هَٰٓؤُلَآءِ شُفَعَٰٓؤُنَا عِندَ ٱللَّهِۚ ﴾ [يونس: ١٨]

"আর তারা আল্লাহকে ব্যতীত এমন কিছুর উপাসনা করে যারা তাদের কোনো লাভ ও ক্ষতি করতে পারে না, আর তারা বলে এরা আল্লাহর কাছে আমাদের জন্য শাফা'আতকারী"।[২৯১] প্রথম অধ্যায়ে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের ক্ষেত্রে শির্কের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা এ বিষয়টি আলোচনা করে প্রমাণ করে দেখিয়েছি যে, আল্লাহর এ জগতে তাঁর পূর্বানুমতি ব্যতীত নিজ মর্যাদার ওসীলায় কেউ তাঁর কাছে কারো ব্যাপারে শাফা'আত করতে পারে-এমন ধারণা করা পরিচালনাগত শির্কের একটি প্রকার। আল্লাহর এ-জগতে কেউ এ-ভাবে শাফা'আত করতে পারে বলে যারা ধারণা করে, তাদের প্রশ্ন করে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ ﴾ [البقرة: ٢٥٥]

---

291. আল-কুরআন, সূরা ইউনুস:১৮।

“এমন মর্যাদার অধিকারী কে আছে যে তাঁর (আল্লাহর) পূর্বানুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে (কারো জন্যে) শাফা‘আত করতে পারে?”[২৯২] ইসলামে মৃত মানুষের এ-জাতীয় শাফা‘আতের কোনো অস্তিত্ব না থাকলেও শয়তান পরবর্তী সময়ে ধীরে ধীরে সাধারণ মুসলিম জনমনে তাদের ওলীদের ব্যাপারে অনুরূপ বা এর কাছাকাছি ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছে।

অলিগণের শাফা‘আত সম্পর্কে সাধারণ মুসলিমদের মাঝে শয়তানের দেয়া ধারণা:

শয়তান সাধারণ মুসলিম জনমনে অলিগণের শাফা‘আতের ব্যাপারে নিম্নরূপ ধারণা দিয়েছে:

(ক) ওলিগণ আল্লাহ তা‘আলা ও সাধারণ মানুষের মাঝে মধ্যস্থতাকারী হওয়ায় মৃত্যুর পরেও তাঁরা নিজ নিজ মর্যাদা বলে মানুষের পার্থিব সমস্যাদি সমাধানের ক্ষেত্রে আল্লাহর নিকট শাফা‘আত করে থাকেন।

(খ) আখেরাতে তাঁদের কোনো ভয়-ভীতি না থাকায় সে-দিন তাঁরা কেবল তাঁদের ভক্তদের মুক্তির চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন।

---

[292]. আল-কুরআন, সূরা বাক্বারাঃ : ২৫৫।

(গ) তাঁদের অনুসারী বা ভক্তদের মাঝে যারা জাহান্নামে যাওয়ার ফয়সালা প্রাপ্ত হবে, তাদেরকে তাঁরা নিজ নিজ মর্যাদা বলে শাফা'আত করে জাহান্নামে প্রবেশ করা থেকে রেহাই দিয়ে জান্নাতে নিয়ে যাবেন।

ওলিদের শাফা'আতের ব্যাপারে এ-জাতীয় ধারণা সাধারণ মুসলিম জনমনে অত্যন্ত প্রবলভাবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে বলেই প্রতীয়মান হয়। যার কারণে পার্থিব সমস্যাদি সমাধানের জন্য যেমন তাদেরকে জীবিত ও মৃত ওলি ও পীরদের দরবার ও কবরে যেতে দেখা যায়, তেমনি ওলিদের পরকালীন শাফা'আত প্রাপ্তির আশায় তাদেরকে দেশের বাইরের বড় বড় ওলিদের কবরে গমন করা ছাড়াও দেশের মধ্যকার মৃত ওলিদের কবর এবং জীবিত তথাকথিত ওলি সাঈদাবাদী ও দেওয়ানবাগী ...ইত্যাদি পীরের দরবারেও ভীড় জমাতে দেখা যায় এবং সেখানে যেয়ে নানাভাবে তাঁদের তা'যীম ও সম্মান করে তাদের ইহ-পরকালীন সমস্যাদির ক্ষেত্রে তাঁদের নিকট সুপারিশ কামনা করতে দেখা যায়। হাজীগণ যেমন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কা'বা শরীফের উদ্দেশ্যে হজ্জের সময় কুরবানীর জন্তু সাথে নিয়ে মিনা উপত্যকায় গমন করেন, তেমনিভাবে অনেক মুসলিমদেরকে

ওলিদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিশেষ করে বার্ষিক ওরস উপলক্ষে ওরসের স্থলে বা দরবারে গরু, ছাগল, ভেড়া ও টাকা-কড়ি মানত ও হাদিয়া হিসেবে নিয়ে যেয়ে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কুরবানী করতে দেখা যায়। এ-ছাড়াও দেশের বিভিন্ন এলাকায় আরো কিছু ভণ্ড পীর রয়েছে, যাদেরকে শরী'আতের চেয়ে মা'রিফাত নিয়েই অধিক ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। আখেরাতে বড়পীর আব্দুল কাদির জীলানী ও খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তীর শাফা'আতে মুক্তির আশায় তাঁদের মৃত্যু দিবস উপলক্ষে তাদেরকে ওরস পালন করতেও দেখা যায়। মাঝে-মধ্যে তাঁদের কবর যিয়ারতে যাওয়ার সময় তা পত্রিকান্তরে প্রচার করেও যেতে দেখা যায়।

শয়তানের দেয়া এ তিনটি ধারণার অসারতা:

শয়তানের দেয়া এ তিনটি ধারণার মধ্যকার প্রথমটির অসারতা আমরা এ অধ্যায়েরই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি। বাকী দু'টি ধারণার অসারতা ইন-শাআল্লাহ শাফা'আত সম্পর্কে ইসলামের মূলকথা কী, তা বর্ণনার সময় প্রমাণ করবো।

কোন কোনো শরী'আতী পীরদের দৃষ্টিতে শাফা'আত

শরী‘আত পালন করেন এমন এক শ্রেণীর পীরগণকেও শয়তান তাঁদের নিজেদের এবং তাদের শাফা‘আতের ব্যাপারে তাদেরকে মারাত্মক বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে রেখেছে। তাদের নিজেদের ব্যাপারে তাদেরকে এমন ধারণা দিয়েছে যে, তারা আল্লাহর উপাসনা ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করার ফলে আল্লাহর ওলিতে পরিণত হয়েছেন। যার ফলে আখেরাতে তাদের নিজেদের মুক্তির বিষয়ে তাদের কোনো চিন্তা নেই। সে দিন তারা শুধু নিজেদের মুরীদদের মুক্তির ব্যাপার নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকবেন। হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ চলাকালে তাদের কোনো ভক্তের পা পিছলে গেলে তাঁরা তাকে হাত ধরে টেনে জান্নাতে নিয়ে যাবেন। উদাহরণস্বরূপ চরমোনাইর পীর মাওলানা মুহাম্মদ এছহাক মরহুমের কথাই বলা যায়, তিনি একাধিক পীরের হাতে বায়‘আত করা বৈধ হওয়া ও এর উপকারিতা বর্ণনা প্রসঙ্গে স্বীয় পীর মাওলানা কারামত আলী জৌনপুরী (রহ.) সাহেবের একটি বক্তব্য উপস্থাপন করেন। মাওলানা কারামত আলী বলেন:

“একদা আমার পীর মাওলানা সৈয়দ আহমদ সাহেব-এর কাছে কোনো এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হুজুর যেসব লোক দুই তিন পীরের কাছে মুরীদ হন, কেয়ামতের দিন পীরগণ ঐ মুরীদকে আপন আপন দিকে টানাটানি করিয়া ছিড়িয়া ফেলিবে নাকি ? তখন উত্তর করিলেন, কেয়ামতের দিন পা পিছলাইয়া যাওয়ার দিন; টানাটানি করিয়া ছিঁড়িয়া ফাড়িয়া ফেলিবার দিন নহে। যখন কোনো ব্যক্তির পা পিছলাইয়া যায়, তখন একা এক ব্যক্তি হাত ধরিয়া তাহাকে সাহায্য করিলে তাহার খুব শক্তি হয়, কিন্তু যখন দুই-তিন ব্যক্তি তাহার হাত ধরে, তখন তাহার শক্তি আরও বাড়িয়া যায়। মাওলানা কারামত আলী মরহুম সাহেব এই কথার উত্তরে বলেন, ছোবহানাল্লাহ ! কি সুন্দর দেল আকর্ষণীয় উত্তর দিয়াছেন। সত্যই কেয়ামতের অবস্থা এইরূপ হইবে এবং আল্লাহর হুকুমে সেই দিন নিঃসন্দেহে পীরগণ থেকে সাহায্য পাওয়ার আশা করা যায় এবং তিনি দো‘আ করিয়া বলেন, আল্লাহ পাক হক্কানী পীরদের উপর মুরীদদের এ‘তেকাদ ঠিক রাখুন”।[২৯৩]

---

[293]. মাওলানা মুহাম্মদ এছহাক, ভেদে মা‘রেফত; পৃ.২৫-২৬।

হাশরের ময়দানে পীরদের কর্তৃক মুরীদদের সাহায্য ও সহযোগিতা সংক্রান্ত.কোন কোনো পীরগণের উক্ত বিশ্বাসের প্রতি লক্ষ্য করলে কয়েকটি বিষয় প্রমাণিত হয়। যেমন:

1. ওলি ও পীরগণ নিজেদেরকে একেকজন কামিল মানুষ বলে মনে করেন। অথচ কুরআনের শিক্ষানুযায়ী কারো পক্ষে নিজের ব্যাপারে এমন ধারণা করা সঠিক নয়।
2. হাশরের ময়দানের ভয়াবহ অবস্থা দৃশ্যে তাদের মনে নিজেদের মুক্তির ব্যাপারে কোনো ভয়-ভীতির উদ্রেক হবে না। অথচ কুরআন শরীফে হাশরের ময়দানে সকল মানুষের যে অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে, তা সে বর্ণনার পরিপন্থী।
3. তারা হাশরের ময়দানে বিচার চলাকালীন সময়ে তাদের বিপদগ্রস্ত মুরীদদের ব্যাপারে সুপারিশ করার অনুমতি পাবার ব্যাপারে নিশ্চিত। অথচ হাদীসের বর্ণনানুযায়ী হাশরের ময়দানে কোনো ওলির এ-জাতীয় শাফা'আত স্বীকৃত নয়। বরং তাঁদের শাফা'আত স্বীকৃত হয়েছে কেবল জাহান্নামীদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনার ব্যাপারে। যা আমরা পরবর্তী আলোচনার দ্বারা জানতে পারবো।

কোন মানুষই নিজেকে সৎ মানুষ হওয়ার সনদ দিতে পারে না:

মানুষ যতই আল্লাহর উপাসনা ও তাকওয়ার পথ অবলম্বন করুক না কেন, বেশী হলে সে তার 'আমল আল্লাহর কাছে গৃহীত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারে। কোনো অবস্থাতেই তা গৃহীত হয়েছে বলে নিশ্চিত হতে পারেনা। তার 'আমলের অবস্থা যা-ই হোক না কেন, তিনি এ নিয়ে কোনো প্রকার আত্মতৃপ্তিও বোধ করতে পারেন না। নিজেকে আল্লাহর কাছে অতি সম্মানী ও মর্যাদাবান বলেও মনে করতে পারেন না। কেননা, কে প্রকৃত মুত্তাকী ও পরহেজগার তা কেবল আল্লাহই ভাল করে জানেন। কেউই নিজেকে পরিশুদ্ধ মানুষ হওয়ার সনদ দিতে পারে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿فَلَا تُزَكُّوٓاْ أَنفُسَكُمۡۖ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ٣٢﴾ [النجم: ٣٢]

"অতএব তোমরা নিজেকে পরিশুদ্ধ মানুষ হওয়ার সনদ দান করো না, তোমাদের মধ্যে কে মুত্তাকী তা তিনিই ভাল করে জানেন"।[294] একজন মু'মিন যখন এ-কথা বলতে পারে না যে,

[294]. আল-কুরআন, সূরা: নাজম:৩২।

আমি একজন মুত্তাকী ও পরহেজগার হয়ে গেছি, তখন সে তো কখনও নিজেকে আল্লাহর কাছে বড় মর্যাদার অধিকারী বলেও ভাবতে পারে না। সে নিজের মর্যাদার ওসীলায় আখেরাতে মানুষের মুক্তির জন্য শাফা'আত করা নিয়ে ভাবা তো দুরের কথা, এ দুনিয়াতেও সে তার নিজের মর্যাদা ও সম্মানের দোহাই দিয়ে আল্লাহর কাছে তার নিজের বা পরের জন্য কিছু চাওয়াকেও বৈধ মনে করতে পারে না। বরং এ-জাতীয় চাওয়াকে সে আল্লাহর সমীপে বেআদবী ও অনধিকার চর্চা করা বলেই গণ্য করবে। এ-সব চিন্তা-ভাবনা করার বদলে একজন মু'মিনের অন্তর সর্বদা আল্লাহর কাছে বিনয়ী হয়ে থাকবে। আল্লাহর শাস্তির ভয়ে তার অন্তর সর্বদা আতঙ্কিত থাববে। কখনও নিজেকে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপদ ভাবতে পারবে না।

যেমন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوۡمِ ٱلدِّينِ ۝٢٦ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنۡ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشۡفِقُونَ ۝٢٧ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمۡ غَيۡرُ مَأۡمُونٖ ۝٢٨ ﴾ [المعارج: ٢٦، ٢٨]

"এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত, নিশ্চয়

তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে শঙ্কাহীন থাকা যায় না"।[২৯৫] এই যদি হয় একজন প্রকৃত মু'মিনের বৈশিষ্ট্য তখন একজন পীর আখেরাতে কীভাবে নিজেদেরকে আল্লাহর শাস্তি থেকে এতো নিরাপদ ভাবতে পারেন। সত্যিই তা আশ্চর্যের বিষয় !

কুরআন ও হাদীসের আলোকে শাফা'আতের মূলকথা:

কুরআন ও হাদীস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ইসলাম শাফা'আত বা সুপারিশকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে:

এক.দুনিয়াবী বিষয়ে শাফা'আত।

দুই. পরকালীন বিষয়ে শাফা'আত।

দুনিয়াবী বিষয়ে পরস্পরের নিকট শাফা'আত করা বৈধ হওয়ার শর্তসমূহ:

শাফা'আত যদি পার্থিব কোনো বিষয়ে কোনো জীবিত মানুষের কাছে চাওয়া হয়, তবে নিম্নে বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে তা চাওয়া ও করার বৈধতা রয়েছে:

---

[295]. আলকুরআন, সূরা: মা'আরিজ:২৭-২৯।

প্রথম শর্ত: এ শাফা‘আতটি কোনো উপকারী বিষয়ে এবং কারো এমন কোনো অধিকারের ক্ষেত্রে হতে হবে যা নষ্ট হয়ে গেছে অথবা নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

দ্বিতীয় শর্ত: তা যেন কোনো অপরাধমূলক কাজে বা শরী‘আতের কোনো হদ (শাস্তি) রহিতকরণের ক্ষেত্রে না হয়।

তৃতীয় শর্ত:যার নিকট শাফা‘আত চাওয়া হবে তিনি স্বাভাবিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শাফা‘আত করবেন এমন ধারণার ভিত্তিতে তার নিকট শাফা‘আত কামনা করতে হবে। কোনো প্রকার কারামত বা অলৌকিক পন্থা অবলম্বনের ধারণায় নয়।

কারো শাফা‘আত যদি উক্ত শর্তসমূহ পূর্ণ করে তা হলে তা যেমন একটি কৃতজ্ঞতা পাওয়ার যোগ্য কাজ হবে, তেমনি এর দ্বারা আল্লাহ তা‘আলার নিকট থেকে পুণ্য পাওয়ারও আশা করা যাবে। অন্যথায় তা পাপের কাজ হিসেবে গণ্য হবে। এ-জাতীয় শাফা‘আত প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةٗ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ وَمَن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةٗ سَيِّئَةٗ يَكُن لَّهُۥ كِفۡلٞ مِّنۡهَاۗ ﴾ [النساء: ٨٥]

“যে লোক সৎ কাজের জন্য কোনো শাফা‘আত করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক কোনো মন্দ

কাজের জন্য শাফা‘আত করবে, সে তার বোঝারও একটি অংশ পাবে”।[২৯৬]

উল্লেখ্য যে, এ-জাতীয় শাফা‘আত কোনো জীবিত অনুপস্থিত অথবা মৃত মানুষের নিকট চাওয়া যায় না। কেননা, তা তাদের নিকট কামনা করা তাদেরকে গায়েবের জ্ঞানী বলে বিশ্বাস করার নামান্তর। আর কারো ব্যাপারে এমন ধারণা করা জ্ঞানগত শির্কের অন্তর্গত।

দুনিয়াবী বিষয়ে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত:

কোন জীবিত মানুষের নিকট যেয়ে দুনিয়াবী কোনো বিষয়ে আল্লাহর কাছে সুপারিশ বা শাফা‘আত করার জন্য তাকে বলা যেতে পারে। তিনিও দু’টি কথা বলে আল্লাহর কাছে সে ব্যক্তির জন্য শাফা‘আত করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে শাফা‘আতকারীর সবচেয়ে পরহেজগার হওয়া কোনো জরুরী ব্যাপার নয়। বরং অপেক্ষাকৃত কম পরহেজগার লোকের কাছেও এ-জাতীয় শাফা‘আত চাওয়া যেতে পারে। কেননা, আল্লাহর কাছে শাফা‘আতের ক্ষেত্রে মূল ওসীলা হচ্ছে ব্যক্তির মুখের দুটি কথা, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, তার মর্যাদা ও সম্মান নয়। কোনো দুনিয়াবী বিষয়ে শাফা‘আত করার জন্য কোনো অনুপস্থিত বা মৃত মানুষের

[296]. আল-কুরআন, সূরা নিসা :৮৫।

কাছে কোনো আবদার করা যায়না। কেননা, জীবিতরা কোনো গায়েবের আওয়াজ শুনতে পারেন না। আর মৃতদের কবরের পার্শ্বে যেয়ে তাদের কাছে সুপারিশের জন্য কোনো আবেদন করলে কুরআনের কথানুযায়ী তারা কারো কোনো আবেদন শুনতে পান না, পেলেও তারা কারো আবেদনে সাড়া দিতে পারেন না।[২৯৭] সকল মানুষই মরে যাওয়ার পর বরযখী জীবনে তারা নিজের বা পরের উপকারে আসতে পারে এমন কোনো কর্ম করতে পারেন না। তাদের রূহ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে আমাদের জন্যে কোনো কল্যাণ কামনা করে দো'আ করলেও আল্লাহর নিকট এর কোনো কার্যকারিতা নেই। কেননা, কবরের জীবন সে রকম

---

[297].এ সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ﴾ [فاطر: ١٤]

মৃত মানুষেরা উপকার করতে পারে এ ধারণার ভিত্তিতে তাদের নামে নির্মিত মূর্তিকে লক্ষ্য করে "তোমরা যদি তাদেরকে উপকারের জন্য আহবান কর, তা হলে তারা তোমাদের আহবান শ্রবণ করবে না, শুনলেও তারা তোমাদের আহবানে সাড়া দেবে না। (তাদেরকে আহবানজনিত কারণে তোমরা যে শির্ক করেছ) কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের সে শির্ককে অস্বীকার করবে"। অর্থাৎ বলবে: আমরা তোমাদেরকে আমাদেরকে আহবানের কথা শিক্ষা দেই নি। এটি তোমাদের মনগড়া কাজ বৈ আর কিছুই নয়। আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির :১৪।

কোনো ‘আমলের জীবন নয়। এ-জন্যই রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বা কোনো ওলির কবরে গিয়ে বা দূর থেকে তাঁদের কাছে নিজের জন্য কোনো দো‘আ করার আবেদন করা যায় না। সাহাবা ও তাবেঈগণের যুগে মুসলিমরা বহুবিধ সমস্যায় পতিত হয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা কখনও রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কবর মুবারকে যেয়ে তাঁর নিকট সমস্যা সমাধানের জন্য আল্লাহর নিকট দো‘আ করার ব্যাপারে কোনো আবেদন করেছেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আখেরাতে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত:

জীবিত থাকাবস্থায় কোনো দুনিয়াবী বিষয়ে শাফা‘আতের ক্ষেত্রে বিষয়টি যদি উপরে বর্ণিত শর্ত পূর্ণ করে, তা হলে এমন বিষয়ে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত করার ব্যাপারে তাঁর আগাম অনুমতি রয়েছে। আমরা ইচ্ছা করলেই পরস্পরের জন্য এমন কোনো বিষয়ে আল্লাহর কাছে শাফা‘আত করতে পারি। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহর কাছে শাফা‘আতের বিষয়টি দুনিয়াবী শাফা‘আত থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কেননা, এ দিনে শাফা‘আতের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে আল্লাহ তা‘আলার হাতে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই তিনি বলেছেন:

﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعٗاۖ ﴾ [الزمر: ٤٤]

“আপনি বলে দিন- শাফা‘আতের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন”।[২৯৮]এ দিনে কেউ তার নিজের মর্যাদা ও সম্মানের দিক বিবেচনা করে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে তার নিজের বা পরের জন্য কোনো সুপারিশ করাতো দুরের কথা, এ দিনে কেউ তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোনো কথাই বলতে পারবে না। এ দিবসের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ [هود: ١٠٥]

“যখন সেই দিন আসবে, তখন আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কেউ কোনো কথা বলতে পারবে না।”[২৯৯] আল্লাহর ভাষায় :

﴿ لِكُلِّ ٱمْرِيٍٕ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۝٣٧ ﴾ [عبس: ٣٧]

“সে দিন সকল মানুষেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে”।[৩০০] সে দিন কাফির ও মু’মিন নির্বিশেষে কারো জন্যে কারো শাফা‘আত থাকবে না। সে-জন্য সে দিনে কারো শাফা‘আতের আশায় না থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য আল্লাহ তা‘আলা মু’মিনদেরক নির্দেশ করে বলেছেন:

---

298. আল-কুরআন, সূরা দুখান:৩৯।

299. আল-কুরআন, সূরা হুদ:১০৫।

300. আল-কুরআন, সূরা আবাসা:৩৭।

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقۡنَٰكُم مِّن قَبۡلِ أَن يَأۡتِيَ يَوۡمٞ لَّا بَيۡعٞ فِيهِ وَلَا خُلَّةٞ وَلَا شَفَٰعَةٞۗ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]

“হে মু’মিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে জীবিকা দান করেছি তাথেকে তোমরা ব্যয় কর সে-দিন আগমনের পূর্বে যেদিন থাকবে না কোনো (পুণ্যের)ক্রয়-বিক্রয়, কোনো বন্ধুত্ব ও শাফা‘আত”।[৩০১] সে-দিনটি এমন যে, সে-দিনে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত মানুষের জন্য কোনো বন্ধু ও শাফা‘আতকারী থাকবে না। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ وَأَنذِرۡ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحۡشَرُوٓاْ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ لَيۡسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِيّٞ وَلَا شَفِيعٞ لَّعَلَّهُمۡ يَتَّقُونَ ٥١ ﴾ [الانعام: ٥١]

“এ কুরআনের দ্বারা আপনি তাদেরকে ভয় প্রদর্শন করুন যারা তাদের প্রতিপালকের কাছে এমন অবস্থায় একত্রিত হওয়াকে ভয় করে যখন তাদের কোনো বন্ধু ও শাফা‘আতকারী থাকবে না, হতে পারে এতে তারা ভীত হবে”।[৩০২]

---

[301]. আল-কুরআন, সূরা বাকারাঃ: ২৫৪।

[302]. আল-কুরআন, সূরা আন‘আম:৫১।

সে দিন এমন যে, জান্নাতীদের জান্নাতে চলে যাওয়ার পর যখন তারা তাদের জাহান্নামবাসী আত্মীয়স্বজন ও পরিচিতজনদের জন্য শাফা'আত করার অনুমতি পাবেন, তখন তারা তাদের স্বজনদের অপরাধের খবর না জেনে কোনো দেবতা, প্রতিমা, কবর ও কবর পূজারী আত্মীয়ের জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আত করলে তাদের সে শাফা'আত আল্লাহ তা'আলার নিকট গৃহীত হবে না। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ فَمَا تَنفَعُهُمۡ شَفَٰعَةُ ٱلشَّٰفِعِينَ ۝٤٨ ﴾ [المدثر: ٤٨]

"অতএব (মুশরিকদের জন্য) কোনো সুপারিশকারীদের সুপারিশ কাজে আসবে না"।[৩০৩] মুশরিকরা আজ যাদেরকে আল্লাহর শরীক করে নিয়েছে এবং যাদেরকে আজ তাদের মর্যাদার ওসীলায় তাদের দুনিয়াবী উদ্দেশ্য পূরণের জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আতকারী বলে ভাবছে, কাল আখেরাতের ভয়াবহ দিনে তারা তাদের কথা স্মরণ করলেও তারা তাদেরকে শাফা'আতকারী হিসেবে পাবে না। বরং সে দিন সবকিছু তাদের ধারণার বাইরে দেখে মুশরিকরা তাদের শরীকদের অস্বীকার

---

303 .আল-কুরআন, সূরা মুদ্দাস্সির:৪৮।

করবে। আত্মরক্ষার জন্য তারা বলবে:আমরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে কখনও শরীক করিনি। যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوٓاْ أَيْنَ شُرَكَآؤُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۝٢٢ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ۝٢٣ ٱنظُرْ كَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْۚ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۝٢٤ ﴾ [الانعام: ٢٢، ٢٤]

"আর যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, অতঃপর যারা শির্ক করেছিল, তাদেরকে বলব: যাদেরকে তোমরা অংশীদার বলে ধারণা করতে, তারা (এখন) কোথায়? অতঃপর তাদের শির্কের পরিণাম এ-কথা ব্যতীত আর কিছুই হবে না যে, তারা বলবে: হে আমাদের প্রতিপালক ! আল্লাহর শপথ, আমরা মুশরিক ছিলাম না। লক্ষ্য করে দেখ, কিভাবে তারা নিজেদের বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা বলবে। আর তারা তাদের দেবতাদের শাফা'আতের ব্যাপারে যে মিথ্যা কথা রচনা করেছিল, তা (এখন) তাদের থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে"।[৩০৪] অর্থাৎ তা মিথ্যায় প্রতিফলিত হলো।

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

---

[304]. আল-কুরআন, সুরা আন'আম:২২-২৫।

﴿ وَيَوۡمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبۡلِسُ ٱلۡمُجۡرِمُونَ ١٢ وَلَمۡ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمۡ شُفَعَٰٓؤُاْ وَكَانُواْ بِشُرَكَآئِهِمۡ كَٰفِرِينَ ١٣ ﴾ [الروم: ١٢، ١٣]

"যেদিন কেয়ামত সংঘটিত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতাশ হয়ে যাবে। তারা যাদেরকে আল্লাহর শরীক করে নিয়েছিল তাদের মধ্যকার কেউ তাদের সুপারিশকারী হবে না, (অবস্থা বেগতিক দেখে) তারা তাদের শরীকদের অস্বীকার করবে"।[৩০৫] অর্থাৎ তখন তারা মিছেমিছি বলবে: আমরা তাদেরকে আল্লাহর সাথে কখনও শরীক করিনি।

যারা ওলিদেরকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী মনে ক'রে তাঁদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে, আখেরাতে ওলিগণ সে-সব লোকদের শত্রুতে পরিণত হবেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسۡتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعَآئِهِمۡ غَٰفِلُونَ ٥ ﴾ [الاحقاف: ٥]

"সে ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে যে আল্লাহকে ব্যতীত এমন কাউকে আহ্বান করে যে কেয়ামত পর্যন্ত তার আহবানে সাড়া দেবে না? তাঁরা তো তাদের আহ্বান সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর। যখন মানুষদেরকে হাশরের দিন একত্রিত করা

---

[305]. আল-কুরআন, সূরা রুম :১২।

হবে, তখন তাঁরা তাদের শত্রু হবে এবং তাঁরা তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে"।[৩০৬]

সাধারণ মুশরিক ও মুসলিম মুশরিকরা আখেরাতে যে অবস্থায় হাজির হবে

সেদিন ইসলাম পূর্ব যুগের মুশরিক এবং ইসলাম পরবর্তী যুগের মুসলিম মুশরিক সকলেই আল্লাহর সমীপে তাদের সুপারিশকারীগণ ছাড়াই একাকী হাজির হবে, তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক পরিপূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাদের এ অবস্থা দৃশ্যে মহান আল্লাহ্ বলবেন:

﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ ۖ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ ۚ لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿٩٤﴾ ﴾ [الانعام: ٩٤]

"তোমরা আমার কাছে এমনভাবে নিঃসঙ্গ হয়ে এসেছ যেমনভাবে আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম। আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছিলাম তা তোমরা পশ্চাতেই রেখে এসেছ। আমি তো তোমাদের সাথে তোমাদের সুপারিশকারীদেরকে দেখছি না, যাদের সম্পর্কে তোমাদের দাবী ছিল যে, তারা তোমাদের ব্যাপারে (আমার) অংশীদার। বাস্তবিকই তোমাদের পরস্পরের

---

[306]. আল-কুরআন, সূরা আহক্বাফ: ৫-৬।

সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে এবং তোমাদের দাবী উধাও হয়ে গেছে”।[৩০৭]

সে দিন এমন যে, তাতে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্যে অন্য কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না।

যেমন আল্লাহ বলেন:

﴿ مَا لَكُم مِّن دُونِهِۦ مِن وَلِيّٖ وَلَا شَفِيعٍۚ ﴾ [السجدة: ٤]

“তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই”।[৩০৮]

এ-সব আয়াতসমূহ দ্বারা যে-সব বিষয়াদি প্রমাণিত হয় তা হলো নিম্নরূপ:

1. **আখেরাতে শাফা‘আতের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন ব্যাপার। সে দিন কেবল তিনি ব্যতীত মানুষের**

---

[307]. আল-কুরআন, সূরা আনআম:৯৪।

[308] . আল-কুরআন, সূরা সেজদা: ৪।

জন্য স্বেচ্ছা প্রনোদিত অপর কোনো বন্ধু বা সুপারিশকারী থাকবে না।

2. সে দিন একমাত্র রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ব্যতীত অন্যান্য সকল নবী ও ওলিগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় নিজের পরিণতি নিয়েই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সময় অতিবাহিত করবেন। তাঁরা আল্লাহর শাস্তির ভয়ে আতঙ্কিত থাকবেন। আখেরাতে সৎমানুষ বা অলিগণের জন্য আল্লাহর অভয়বাণী থাকলেও তাদের জন্য জান্নাতের ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত তারা এ উৎকণ্ঠার মধ্যেই সময় অতিবাহিত করবেন। সে-জন্য এ সময়ে তাঁদের পক্ষে অন্যের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা করারও কোনো অবকাশ থাকবে না।
3. সেদিন মুশরিক ও মু'মিন নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য তাদের ঈমান ও 'আমল ব্যতীত অপর কোনো সাহায্যকারী, শাফা'আতকারী ও বন্ধু থাকবে না।
4. সে দিন কেউই আল্লাহর কাছে তার নিজের মর্যাদা ও সম্মানের দিক বিবেচনা করে আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত তার নিজের বা অপর কারো কোনো বিষয়ে কোনো কথা বলতে পারবে না।

5. সেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজের কর্মের হিসেব প্রদানের জন্য আল্লাহর সম্মুখে একাকী হাজির হবে। কারো সাথে কোনো সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী থাকবে না।

6. মুশরিকরা যে-সব মৃত সৎ মানুষ ও ফেরেশ্তাদের দেব-দেবী এবং জিনদেরকে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী ব'লে মনে করে তাদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করতো, আখেরাতে তারা তাঁদেরকে সুপারিশকারী হিসেবে পাবে না। এমনকি সে দিন তাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো সম্পর্কও থাকবে না। অনুরূপভাবে ইসলাম পরবর্তী যুগে তথাকথিত অলি, গউছ ও কুতুব নামের যাদেরকে ইহকাল ও আখেরাতে সাধারণ মানুষের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশাকরী বলে মনে করে তাঁদেরকে সুপারিশের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে, আখেরাতে তাঁদেরকেও সুপারিশকারী হিসেবে পাওয়া যাবে না। বরং যারা তাঁদেরকে উক্ত ধারণার ভিত্তিতে সাহায্য ও সুপারিশের জন্য আহ্বান করছে, আখেরাতে তারা তাঁদের সুপারিশ পাওয়া তো দুরের কথা, তখন তাঁরা তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করবেন।

7. যারা জান্নাতে যাওয়ার পর অন্যের জন্য সুপারিশের অনুমতি পাবেন, তাঁরা না জেনে কোনো মুশরিকদের জন্য সুপারিশ

করলে তাদের সে সুপারিশ কারো কোনো উপকারে আসবে না।

কারা আখেরাতে শাফা'আতের অনুমতি পাবেন:

আখেরাতে কেবল তারাই শাফা'আতের অনুমতি পাবেন যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা শাফা'আতের অনুমতি প্রদান করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥ﴾ [سبا: ٢٣]

"তাঁর কাছে কেবল তাদের সুপারিশই উপকারী হবে, যাদেরকে তিনি সুপারিশ করার জন্য অনুমতি দেবেন"।[৩০৯] অপর আয়াতে আল্লাহ বলেন:

﴿ يَوۡمَئِذٖ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا ١٠٩ ﴾ [طه: ١٠٩]

[309]. আল-কুরআন, সূরা সাবা :২৩।

“দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার কথায় তিনি সন্তুষ্ট হবেন, কেবল সে ব্যতীত সে দিন কারো সুপারিশ সেদিন কারো উপকারে আসবে না”।[৩১০]

আখেরাতে যারা শাফা‘আতের অনুমতি পাবেন কুরআন ও হাদীসের বর্ণনানুযায়ী তাঁরা হলেন: রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-, মু’মিন, মু’মিনদের মৃত নাবালক শিশু, কুরআন, রোযা, জান্নাত, জাহান্নাম ও শহীদগণ। তবে সকলের শাফা‘আতের সময় এক নয়। বরং তাদের শাফা‘আত দু’টি পর্যায়ে বিভক্ত।

শাফা‘আতের প্রথম পর্যায়: হাশরের ময়দানে যারা শাফা‘আতের অনুমতি পাবেন:

যারা হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ চলা কালীন সময়ে শাফা‘আত করবেন, বিভিন্ন হাদীসের বর্ণানানুযায়ী তারা হলেন নিম্নরূপ:

রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা‘আত:

---

310. আল-কুরআন, সূরা ত্বা-হা :১০৯।

বিভিন্ন হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একাধিক শাফা'আত রয়েছে। সে-গুলো হলো:

1. **শাফা'আতে কুবরা বা বড় শাফা'আত:** তাঁর প্রথম এ শাফা'আতটি হবে হাশরের মাঠের ভয়াবহ অবস্থা থেকে সমগ্র হাশরবাসীদের মুক্তির জন্যে। হাশরবাসীরা যখন আদম **আলাইহিসি সালাম** থেকে আরম্ভ করে একে একে নূহ, ইব্রাহীম, মূসা ও ঈসা **আলাইহিমুস সালাম**-এর কাছে গিয়ে তাদের এ অবস্থা থেকে উত্তরণ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর কাছে শাফা'আত করার জন্য আবেদন করবেন, তখন তাঁরা সবাই নিজেদের ত্রুটি বিচ্যুতির কথা স্মরণ করে সুপারিশ করতে অপারগতা প্রকাশ করবেন। অবশেষে যখন হাশরবাসীরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নিকট যেয়ে সুপারিশ করার জন্য আবেদন করবে, তখন তিনি বলবেন: আমি এ-কাজের উপযুক্ত।[৩১১] তবে যেহেতু আল্লাহর অনুমতি

---

[311]. হাশরের মাঠে রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর এ শাফা'আত সংক্রান্ত হাদীসটি হাদীস গ্রন্থসমূহে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। দেখুন: মুসলিম, প্রাগুক্ত; (ঈমান অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: সর্বনিম্ন জান্নাতবাসীর স্থান), ১/১৮৩।

ব্যতীত সেখানে কোনো কথা বলা যাবে না, সে-জন্য তিনি মাকামে মাহমূদে আরোহণ করে সেজদা রত হয়ে এমন মনোরম ও মনোমুগ্ধকর ভাষায় আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা করবেন যেমনটি তিনি অতীতে কখনও করেন নি। এমতাবস্থায় আল্লাহ তাঁকে সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন। তিনি বিচারকার্য আরম্ভ করার জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আত করলে আল্লাহ তা মঞ্জুর করবেন এবং বিচার কার্য শুরু করবেন।

2. দ্বিতীয় শাফা'আত হবে তাঁর উম্মতের মধ্যকার কিছু লোকদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্যে। শাফা'আতের ব্যাপারে যে দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে এ-জাতীয় শাফা'আতের কথা এ মর্মে রয়েছে যে, আল্লাহ বলবেন:

«...أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الأَيْمَنِ»

"তোমার উম্মতের মধ্যকার যাদের কোনো হিসাব নেই তাদেরকে জান্নাতের ডানের দরজা দিয়ে প্রবেশ করাও"।[৩১২]

312. আহমদ, প্রাগুক্ত; ২/৪৩৫।

৩. তৃতীয় শাফা'আত হবে তাঁর উম্মতের মধ্যকার এমন সব লোকদের জন্যে যাদের পাপ ও পূণ্য সমান হয়ে যাবে। এরাও ইন-শাআল্লাহ তাঁর শাফা'আতে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এ বিষয়ে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

«السَّابِقُ يَدْخُلُ الجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ و الْمُقْتَصِدُ بِرَحْمَةِ اللهِ، وَالظَّالِمُ لِنَفْسِه وَأَصْحَابُ الأَعْرَافِ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم»

''অগ্রগামীরা বিনা হিসেবে আর মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারীরা আল্লাহর রহমতে জান্নাতে প্রবেশ করবে, যারা নিজেদের নফসের উপর জুলুম করেছে এবং যাদের পাপ ও পূণ্য সমান হয়ে গেছে তারাও রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আতে জান্নাতে প্রবেশ করবে''।[৩১৩]

4. চতুর্থ শাফা'আত হবে তাঁর উম্মতের মধ্যকার এমন সব লোকদের জন্য যাদের পুণ্যের চেয়ে পাপের সংখ্যা অল্প পরিমাণে বেশী হবে। আক্বীদা বিষয়ক কিতাবাদিতে রাসূলুল্লাহ

---

313. শিববীর আহমদ উছমানী, **ফতহুল মুলহিম বি শরহে সহীহ মুসলিম;** (করাচী: মাকতাবাতুল হেজায, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন), ১/৩৬১; **ফতহুল বারী বি শরহিল বুখারী;**১১/৪২৮।

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ-জাতীয় শাফা‘আতের কথা পাওয়া গেলেও কোনো কিতাবে এর সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণের বর্ণনা পাওয়া যায় না। সম্ভবত শাফা‘আত সংক্রান্ত সাধারণ হাদীসসমূহ বিবেচনা করেই এ শাফা‘আতের কথা বলা হয়ে থাকে। যেমন রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেছেন:

«شَفَاعَتِيْ لأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ أُمَّتِيْ»

"আমার উম্মতের মধ্যকার কবীরা গুনাহকারীদের জন্য আমার শাফা‘আত হবে"।[৩১৪] অপর হাদীসে বলেন:

«لِكُلِّ نَبِيٍ دَعْوَةٌ يَدْعُوا بِهَا وَأُرِيْدُ أَنْ أَخْتَبِأَ دَعْوَتِيْ شَفَاعَةً لِأُمَّتِيْ فِيْ الآخِرَةِ»

"প্রত্যেক নবীর জন্য আল্লাহর নিকট একটি আহ্বান রয়েছে যা তাঁরা করবেন। আর আমি আমার সে শাফা‘আত আখেরাতে আমার উম্মতদের শাফা‘আত করার জন্য জমা রাখতে চাই"।[৩১৫]

---

[314]. তিরমিযী, প্রাগুক্ত; (অধ্যায়: সিফতিল কিয়ামাঃ, পরিচ্ছেদ নং: ১১), ৪/৬২৫।

[315]. মুসলিম, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল ঈমান, বাব: ইখতেবাউন নাবীয়্যি দাওয়াতাশ শাফা’আতি লি উম্মাতিহি), ১/১৮৮।

উক্ত ধরনের হাদীসসমূহ দ্বারা এ শাফা‘আতের কথা প্রমাণিত হলেও তা সকল অপরাধীদের জন্য সমানে পাইকারীভাবে হবে না। বরং তা হবে এমন সব অপরাধীদের জন্যে যাদের পাপের সংখ্যা পুণ্যের চেয়ে অল্প পরিমাণে বেশী হয়েছে। তাদের অবস্থা এমন যে, একজন পরীক্ষার্থীকে যেমন অল্প নম্বর যোগ দিলে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারে, তেমনি তাদেরকেও অল্প পুণ্য যোগ দিলে তারাও জান্নাতে চলে যেতে পারে। এমনি ধরনের পাপীদেরকে পূণ্য গ্রেস দেয়া স্বরূপ আল্লাহর অনুমতিক্রমে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাদের জন্য শাফা‘আত করবেন। পরীক্ষায় যারা আদৌ গ্রেস পাবার যোগ্য নয়, তাদের যেমন কোনো গ্রেস দেয়া হয় না, তেমনি যারা পুণ্য গ্রেস পাওয়ার যোগ্য নয়, তাদের জন্যেও হাশরের মাঠে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর কোনো শাফা‘আত হবে না। বরং এ ধরনের লোকেরা তাদের অপরাধের মাত্রানুযায়ী অল্প-বেশী সময়ের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করবে। অল্প ও বেশী অপরাধী সকলেই যদি তাঁর শাফা‘আত পেয়ে হাশরের মাঠেই জাহান্নামে যাওয়া থেকে মুক্তি পেয়ে যায়, তা হলে অপরাধীদের ব্যাপারে শাস্তির ভয় প্রদর্শন করে যে-সব আয়াত ও হাদীস বর্ণিত হয়েছে, সে-সবের কী অর্থ দাঁড়াবে? সকল

অপরাধীরা যদি সেদিন তাঁর শাফা‘আত পেয়ে মু’মিন ও সৎকর্মশীলদের সাথেই জান্নাতে চলে যায়, তা হলে দুনিয়ায় মু’মিনদের এত কষ্ট করারই-বা কী হেতু থাকতে পারে? তা ছাড়া ফাছিক ও নাফরমান মু’মিনদের জাহান্নামে যাওয়া সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহেরই-বা কী অর্থ থাকতে পারে ?

5. পঞ্চম শাফা‘আত হবে সকল জান্নাতীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবার জন্যে। আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম** বলেন:

«أَنَا أَوَّلُ شَفِيْعٍ فِيْ الْجَنَّةِ»

“জান্নাতে প্রবেশ করার ব্যাপারে আমি হবো প্রথম শাফা‘আতকারী...”।[৩১৬]

হাশরের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর এ-কয়টি শাফা‘আতের কথাই কিতাবাদিতে পাওয়া যায়। তবে এ-ছাড়াও অপরাধী মু’মিনদের জাহান্নামে প্রবেশের পর সেখান থেকে তাদেরকে পুনরায় বের করে নিয়ে আসার জন্যেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আরো কিছু শাফা‘আত রয়েছে, যা আমরা পরে বর্ণনা করবো।

---

[316].মুসলিম, প্রাগুক্ত;১/১৮৮; আহমদ, প্রাগুক্ত; ৩/১৪০; ইবনে কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম;৪/৬৬।

কুরআন ও রোযার শাফা'আত:

যারা বেশী বেশী কুরআন তেলাওয়াত করেন এবং ফরয রোযা পালন ছাড়াও প্রতি মাসে নফল রোযা পালন করেন, হাশরের ময়দানে কুরআন ও রোযা তাদের জন্য শাফা'আত করবে। আবু উমামাঃ আলবাহিলী **রাদিয়াল্লাহু আনহু** থেকে বর্ণিত হয়েছে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন:

«اِقْرَءُوْا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيْعًا لأَصْحَابِهِ»

তোমরা কুরআন পাঠ কর। কেননা, তা কেয়ামতের দিন এর পাঠকারীদের জন্য শাফা'আতকারী হিসেবে আগমন করবে"।[৩১৭]

অপর হাদীসে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন:

«إِنَّ الصِّيَامَ وَالْقُرْآنَ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

"নিশ্চয় রোযা ও কুরআন কেয়ামতের দিন বান্দার জন্য শাফা'আত করবে"।[৩১৮]

জান্নাত ও জাহান্নামের শাফা'আত:

---

[317].মুসলিম, প্রাগুক্ত; (কিতাবু সালাতিল মুসাফিরীন.., বাব:ফাজাইলু তিলাওয়াতিল কুরআন...), ১/৫৫৩।

[318]. আহমদ, প্রাগুক্ত; ২/১৭৪।

যারা দুনিয়ায় থাকাকালে আল্লাহর নিকট অধিকহারে জান্নাত কামনা করবে এবং জাহান্নাম থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইবে, কেয়ামতের দিন জান্নাত ও জাহান্নাম তাদের জন্য শাফা‘আত করবে। জান্নাত বলবে: হে আল্লাহ! এ লোকটি দুনিয়ায় থাকাকালে তোমার কাছে আমাকে অধিকহারে কামনা করেছে, তাই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আর জাহান্নাম বলবে: হে আল্লাহ! এ লোকটি আমার শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তোমার কাছে অধিক হারে আশ্রয় চেয়েছে, সুতরাং তাকে আমার কাছে দেবেন না। জান্নাত ও জাহান্নামের শাফা‘আত প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أَكْثِرُوْا مَسْأَلَةَ اللهِ الْجَنَّةَ وَالاِسْتِعَاذَةَ بِه مِنَ النَّارِ، فَإِنَّهُمَا شَافِعَتَانِ ومُشَفَّعَتَانِ»

“আল্লাহর কাছে অধিকহারে জান্নাত কামনা কর এবং জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাও। কেননা, জান্নাত ও জাহান্নাম শাফা‘আতকারী হবে এবং তাদের শাফা‘আত গৃহীত হবে”।[৩১৯]

---

[319]. এ হাদীসটি আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম তাঁর ‘হাদিউল আরওয়াহ’ গ্রন্থে এ সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন। দেখুন:পৃ. ১৪৮। আবু শুজা’ শেরওয়াই ইবন শহরদার ইবন শেরওয়াই আদ-দাইলমী, মুনাদুল

মৃত সন্তানাদির শাফা‘আত:

আখেরাতে হাশরের ময়দানে শাফা‘আতকারীদের মাঝে রয়েছে মু’মিনদের সেই সব সন্তানাদি যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ قَدَّمَ ثَلاَثَةً مِنْ وَلَدِهَا إِلاَّ كَانَ لَهَا حِجَابًا مِنَ النَّارِ. فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : وَ اثْنَيْنِ ، قَال: واثْنَيْنِ»

“তোমাদের মধ্যকার যে মহিলার তিনটি সন্তান মারা যাবে, তার সে সন্তানরা তার জন্য জাহান্নামের আগুনের সামনে পর্দা স্বরূপ হয়ে দাঁড়াবে। উপস্থিত এক মহিলা বললো: দু’টি সন্তান মারা গেলে কী হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন:দু’টি সন্তান মারা গেলেও একই অবস্থা হবে”।[৩২০] ইবনে মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন:

ফেরদাউস;সম্পাদনা: সাঈদ ইবন বাসইয়ূনী যাগলুল, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.), ১/৭২।

320. বুখারী, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল ইলম, পরিচ্ছেদ: জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য কি পৃথক কোন দিন নির্দ্দিষ্ট করা হবে?), ১/১/ ৬০-৬১।

«مَنْ قَدَّمَ ثَلاَثَةً لَمْ يَبْلُغُوْا الحُلْمَ كَانُوْا لَهُ حِصْنًا حَصِيْنًا مِنَ النَّارِ. قَالَ أَبُو ذَرٍّ: قَدَّمْتُ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: وَاثْنَيْنِ. فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ :قَدَّمْتُ وَاحِدًا ؟ قَالَ : وَوَاحِدًا، وَلٰكِنْ إِنَّمَا ذَلِكَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُوْلَى»

"যে ব্যক্তির তিনটি নাবালক সন্তান মারা যাবে, তারা সে ব্যক্তির জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে নিরাপদ দূর্গে পরিণত হবে। (একথা শুনে) আবু যর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: আমার দু'টি সন্তান মারা গেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: দু'টি সন্তান মারা গেলেও তাই হবে। (উপস্থিত জনগণের মধ্য থেকে) উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন:আমার একটি সন্তান মারা গেছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: একটি সন্তান মারা গেলেও তাই হবে, তবে এ সুযোগ কেবল তারাই পাবে যারা সন্তান মারা যাওয়ার প্রাক্কালে ধৈর্য ধারণ করেছে"।[৩২১]

শহীদদের শাফা'আত:

বিশুদ্ধ হাদীসে হাশরের ময়দানে শহীদদের পক্ষ থেকে তাঁদের নিকটাত্মীয়দের মধ্যকার সত্তর জনের ব্যাপারে শাফা'আত করার কথা বর্ণিত হয়েছে। যেমন বিশিষ্ট সাহাবী মিকদাম ইবন

---

[321].তিরমিযী, প্রাগুক্ত; (জানাইয অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: যার এক সন্তান মারা গেছে তার কী ছাওয়াব রয়েছে?), ৩/৩৬৬।

মা‘দিই কারিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে শহীদের ফযীলত সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ বলেন: “আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য মোট ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে”। এ বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে একটি হচ্ছে- “শহীদ তাঁর পরিবারের মধ্য থেকে সত্তর ব্যক্তির ব্যাপারে শাফা‘আত করবে”।[৩২২]

উল্লেখ্য যে, হাশরের ময়দানে উক্ত এ-সব শাফা‘আত ব্যতীত সাধারণভাবে অন্যান্য নবী, ওলি ও মু’মিনদের শাফা‘আতের কোনো সুনির্দিষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। বরং তাঁদের শাফা‘আত পরবর্তী পর্যায়ে হবে বলে হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

---

[322]. হাদীসের শব্দ হচ্ছে,

عن المقدام بن معد يكرب سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشهيد ثم الله ست خصال. و ذكر منها:" ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه

বুখারী, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল ইলম, পরিচ্ছেদ: জ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য কি পৃথক কোন দিন নির্দ্দিষ্ট করা হবে?), ১/১/ ৬০-৬১।

[322].তিরমিযী, প্রাগুক্ত; (জানাইয অধ্যায়, পরিচ্ছেদ: যার এক সন্তান মারা গেছে তার কি ছাওয়াব রয়েছে?), ৩/৩৬৬। দেখুন:মুসলিম, প্রাগুক্ত; হাদীস নং-১৮৮৫ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর থেকে, তিরমিযী, প্রাগুক্ত; হাদীস নং-১৬৬৩ ইবনে কাছীর, তাফছীরুল কুরআনিল ‘আজীম; ৪/১৭৫; আবু দাউদ, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল জিহাদ, বাব: ফদলিশ শহীদ), ৩/১৫।

শাফা‘আতের দ্বিতীয় পর্যায়: জাহান্নামীদের জাহান্নামে প্রবেশের পর যারা শাফা‘আতের অনুমতি পাবেন:

হাশরের ময়দানে মহান আল্লাহ যখন তাঁর বান্দাদের মাঝে ন্যায় ও ইনসাফের সাথে ফয়সালা করবেন, তখন তাঁর অনুমতিক্রমে জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর জাহান্নামবাসীরা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। এ পর্যায়ে আল্লাহ তা‘আলা পুনরায় শাফা‘আতের অনুমতি প্রদান করবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে জান্নাতবাসীদের জন্য রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা‘আত:

এ পর্যায়ে জান্নাতবাসীদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি শাফা‘আত থাকার বর্ণনা আক্বীদা বিষয়ক কিতাবাদিতে পাওয়া যায়। তবে কোনো কিতাবেই এর পিছনে কী দলীল রয়েছে, অনেক চেষ্টা করেও আমি এর কোনো দলীল খোঁজে পাই নি[323]।

---

[323] শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-উসাইমীন বলেন, এগুলো মুমিনদের পক্ষ থেকে পরস্পরের দো‘আ থেকে নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া বুখারীতে (হাদীস নং ৪০৬৭; মুসলিম, ২৪৯৮) এসেছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উবাইদ আবি আমেরের জন্য জান্নাতে উঁচু মর্যাদার দো‘আ করেছিলেন। অনুরূপভাবে আবদুল্লাহ ইবন কাইস আবু মূসার জন্যও রাসূল সে রকম দো‘আ

জাহান্নামবাসীদের জন্য শাফা‘আত:

হাশরের ময়দানে যারা শির্কের অপরাধে দন্ডিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ না করে অন্যান্য অপরাধজনিত কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের জন্য এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর তিন থেকে চারটি শাফা‘আতের কথা আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত শাফা‘আত সংক্রান্ত সুদীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাঁর জাহান্নামী উম্মতদের জন্য আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি ও অনুনয় বিনয় করে বলবেন:

«... رَبِّ أُمَّتِيْ أُمَّتِيْ، فَيُحِدُّ لَهُ حَدًّا فَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ»

"...প্রভু আমার উম্মত! আমার উম্মত! তখন আল্লাহ তাঁকে (কিছু লোকদের) শাফা‘আতের জন্য একটি সীমারেখা নির্ধারণ করে দেবেন, ফলে তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন"।[৩২৪] আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীস অনুযায়ী এ-ভাবে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-পরপর তিনবার আমার উম্মত আমার উম্মত এ-কথা বলে আল্লাহ

করেছিলেন। তদ্রূপ আবু সালামার জন্য রাসূলের অনুরূপ দো‘আ ছিল। (মুসলিম, হাদীস নং ৯২০) [সম্পাদক]

[324]. বুখারী, প্রাগুক্ত; (ঈমান অধ্যায়), ৩/৬/৪৩।

তা‘আলাকে ডাকতে থাকবেন এবং প্রতিবারেই আল্লাহ তা‘আলা তাঁকে নির্দিষ্ট কিছু লোকদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে এনে জান্নাতে প্রবেশ করানোর অনুমতি দেবেন। তবে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এ ধরনের শাফা‘আত চার বার হওয়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।[৩২৫] হাদীস দু’টি খুবই দীর্ঘ হওয়ার কারণে এখানে তা বর্ণনা করা থেকে বিরত থাকলাম।

জাহান্নামীদের জন্য ফেরেশ্তা, নবী ও মু’মিনদের শাফা‘আত:

রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পর পর তিন থেকে চার বার শাফা‘আতে তাঁর উম্মতের মধ্যকার শির্ক ব্যতীত অন্যান্য অপরাধে জাহান্নামবাসী অসংখ্য মু’মিন নর-নারী মুক্তি পাওয়ার পরেও তাঁর উম্মতের মধ্যকার কিছু লোক জাহান্নামে থেকে যাবে। তখন জান্নাতবাসী মু’মিনরা তাদের পরিচিত অনেককে শেষ পর্যন্ত জান্নাতে দেখতে না পেয়ে তারা সে-সব লোকদের জন্যে আল্লাহর নিকট ফরিয়াদ জানাবে। তখন আল্লাহ তাদেরকে সে-সব লোকদের জন্য শাফা‘আতের অনুমতি প্রদান করবেন। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হাদীসে এ কথাগুলো এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

---

[325].মুসলিম, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল ঈমান, বাব:সবচেয়ে নিম্ন স্তরের জান্নাতির মর্যাদা), ১/১৮০-১৮১।

«...حَتَّى إِذَا خَلُصَ الْمُؤْمِنُوْنَ مِنَ النَّارِ فَوَ الَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ ! مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَشَدَّ مُنَاشَدَةً لِلَّهِ فِيْ اسْتِقْصَاءِ الْحَقِّ، مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ يومَ الْقِيَامَةِ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ فِيْ النَّارِ. يَقُوْلُوْنَ : رَبَّنَا ! كَانُوْا يَصُوْمُوْنَ مَعَنَا ، وَ يُصَلُّوْنَ وَ يَحُجُّوْنَ. فَيُقَالُ لَهُمْ :أَخْرِجُوْا مَنْ عَرَفْتُمْ . فَتُحْرَمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلى رُكْبَتِهِ. ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ! مَا بَقِيَ فِيْهَا أَحَدٌ مِمَّنْ أَمَرْتَنَا بِهِ. فَيَقُوْلُ :ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدتُّمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ دِيْنَارٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوْهُ. فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا. ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا ! لَمْ نَذَرْ فِيْهَا أَحَدًا مِمَّنْ أَمَرْتَنَا. ثُمَّ يَقُوْلُ اللهُ :ارْجِعُوْا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِيْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرٍ فَأَخْرِجُوْهُ. فَيُخْرِجُوْنَ خَلْقًا كَثِيْرًا. ثُمَّ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا! لَمْ نّذّرْ فِيْهَا خَيْرًا. فَيَقُوْلُ اللهُ تَعَالَى : شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ و شَفَعَ النَّبِيُّوْنَ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ لَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ ، فَيَقْبِضُ اللهُ قَبْضَةً مِنَ النَّارِ فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوْا خَيْرًا قَطُّ»

"...অবশেষে যখন (নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য জাহান্নামে প্রবেশকারী) মু'মিনরা (রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা'আতে) নাযাত পাবে, তখন আল্লাহর শপথ যার হাতের মধ্যে আমার আত্মা! তোমাদের প্রত্যেকেই কেয়ামতের দিন তার অধিকার পরিপূর্ণভাবে আদায়ের লক্ষ্যে তাদের জাহান্নামবাসী ভাইদের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে অধিকভাবে অনুনয়-বিনয় করতে থাকবে। তারা বলবে:প্রভু হে! তারা আমাদের সাথে রোযা পালন করতো, নামায আদায় করতো ও হজ্জ করতো। তখন

তাদেরকে বলা হবে:তোমরা যাদের চিনতে পারো, তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এসো। এ-সময়ে তাদের পরিচিত জনদের মুখমণ্ডল জাহান্নামের উপর হারাম করা হবে, তখন তারা তাদের চিনতে পেরে অসংখ্য লোকদের বের করে নিয়ে আসবে এমতাবস্থায় যে, তাদের কারো উভয় পায়ের জঙ্ঘার অর্ধ পর্যন্ত, কারো হাঁটু পর্যন্ত আগুনে পুড়ে গেছে। এরপর তারা বলবে:প্রভু হে! যাদের আপনি বের করে নিয়ে আসার জন্য আমাদেরকে আদেশ করেছিলেন, তাদের কাউকেই আমরা রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ তা'আলা পুনরায় বলবেন: ফিরে যাও, যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ওজনের কল্যাণ পাও তাদেরকে বের করে নিয়ে এসো। এবারও তারা অনেক লোককদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। অতঃপর বলবে: আল্লাহ আপনি যাদেরকে বের করে নিয়ে আসতে আদেশ করেছিলেন, তাদের একজনকেও আমরা সেখানে রেখে আসিনি। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে আবার বলবেন: ফিরে যাও, যাদের অন্তরে অণু পরিমাণ কল্যাণ পাও, তাদেরকেও বের করে নিয়ে এসো। এবারও তারা অনেক লোককে বের করে নিয়ে এসে বলবে: প্রভু হে! কল্যাণ আছে এমন কাউকে আমরা জাহান্নামে রেখে আসিনি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন:**ফেরেশ্তা, নবীগণ ও মু'মিনরা শাফা'আত করলো,** শুধুমাত্র রহমানুর রাহীম ব্যতীত আর কারো শাফা'আত অবশিষ্ট

থাকেনি। এ-কথা বলে আল্লাহ একমুষ্টি আগুন তাঁর হাতে নেবেন এবং সেখান থেকে এমন কিছু লোকদের বের করে আনবেন যারা কখনও কোনো ভাল কাজ করেনি''।[৩২৬]

আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসের এ অংশ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ফেরেশ্তা, নবী, ওলি ও সালেহীনদের শাফা'আত হবে সে সকল অপরাধীদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনার ক্ষেত্রে, যারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। কাউকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে না দেয়ার জন্য তাঁদের কোনো শাফা'আত হবে-এ জাতীয় কোনো কথার প্রমাণ নেই। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, পীর ও মাশায়েখগণ আখেরাতে কারো জন্যে শাফা'আতের অনুমতি পাবেন কি না, তা নিশ্চিতভাবে না জানা সত্ত্বেও তারা তাদের ভক্তদেরকে তাদের শাফা'আতের ব্যাপারে আশ্বস্ত করে থাকেন। মু'মিন ও অলিগণের শাফা'আত জাহান্নামবাসীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার ক্ষেত্রে হয়ে থাকলেও তারা হাশরের ময়দানেই তাদের মুরীদদেরকে জাহান্নামে যেতে না দেবার জন্যে শাফা'আত করবেন বলে প্রচার করেন। অথচ আমরা দেখতে পাই যে,

---

[326].বুখারী, প্রাগুক্ত; (কিতাবুত তাওহীদ, বাব নং ২০, হাদীস নং ৭০০১), ৬/২৭০৭; মুসলিম, প্রগুক্ত; (কিতাবুল ঈমান, বাব নং ৮০, হাদীস নং ১৮২), ১/১৬৯; ক্বুরত্ববী; প্রাগুক্ত; ৩/২৭৪।

আখেরাতের ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে- এ দিনে কারো রক্তের সম্পর্ক কারো কোনো উপকারে আসবে না।[৩২৭] সে দিন কোনো পিতা তার সন্তানের এবং কোনো সন্তান তার পিতার কোনো কাজে আসবে না।[৩২৮] যেখানে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-তাঁর নিকটাত্মীদেরকে এই বলে সাবধান করে দিয়েছিলেন:

«لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا»

327.আল্লাহ বলেন:

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَ أَوْلاَدُكُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةِ.

কেয়ামতের দিন তোমাদের বংশের সম্পর্ক ও সন্তানাদি কোনই কাজে আসবে না"। আল-কুরআন, সূরা মুমতাহিনাঃ: ২।

328.আল্লাহ বলেন:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمۡ وَٱخۡشَوۡاْ يَوۡمٗا لَّا يَجۡزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِۦ وَلَا مَوۡلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِۦ شَيۡـًٔاۚ ﴾ [لقمان: ٣٣]

'হে লোক সকল ! তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, এবং এমন এক দিনকে ভয় কর যেদিন কোন পিতা তার সন্তান এবং কোন সন্তান তার পিতার কোন উপকারে আসবে না"। আল-কুরআন, সূরা লুক্বমান: ৩৩।

'আমি (আখেরাতে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষার জন্য) তোমাদের কোনই উপকার করতে পারবো না'',[329] সেখানে পীর ও মাশায়েখগণ তাঁদের নিকটাত্মীয় ও ভক্তদের জন্য কিভাবে শাফা'আত করার আশ্বাস দিতে পারেন, সত্যিই তা হতবাক করার মত বিষয়।

আখেরাতে ওলিগণকে অভয় প্রদানের তাৎপর্য:

কুরআনুল কারীমে মহান আল্লাহ অলিগণের সংজ্ঞা প্রদান পূর্বক তাঁদেরকে একটি অভয় বাণী এ মর্মে দান করেছেন যে,

﴿ أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ۝٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۝٦٣ ﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣]

"জেনে রেখো! নিশ্চয় আল্লাহর অলিগণের কোনো ভয় নেই, তাঁরা চিন্তিতও হবেনা। ওলিগণ তাঁরাই যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে''।[330] অনেক সাধারণ লোকেরা এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে মনে করেন যে, যেহেতু অলিগণের আখেরাতে কোনো ভয় ও ভীতি নেই, সুতরাং

329.বুখারী, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল ওয়াসায়া, বাব: নং ১১, হাল ইয়াদখুলুন নিসা-উ ওয়াল ওয়ালাদু ফিল আকারিব), ৩/১০১২; মুসলিম, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল ঈমান, বাব:৮৯, হাদীস নং ২০৪), ১/১৯২।

330.আল-কুরআন, সূরা: ইউনুস: ৬২।

আখেরাতে তারা শুধু তাঁদের ভক্তদের মুক্তির জন্য সুপারিশ নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন। এমনকি এ আয়াতের ভিত্তিতে একদিন আমি নিজেই একজনের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছিলাম। আসলে আখেরাতের ভয়াবহ অবস্থা সম্পর্কে তাদের যথার্থ জ্ঞান না থাকার কারণেই তারা মূলত এ ধরনের উক্তি করে থাকেন। এ আয়াতের সারকথা হচ্ছে: যারা মু'মিন ও মুত্তাক্বী, তারাই হলো আল্লাহর ওলি। আর তাঁদের জন্যেই রয়েছে আখেরাতে এ অভয়বাণী। এ জন্যে কারো আব্দুল কাদির জীলানী ও মঈনুদ্দীন চিশ্তীর মত সর্বজনের নিকট ওলি হিসেবে পরিচিত হওয়া কোনো জরুরী ব্যাপার নয়। বরং আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে যারাই মু'মিন ও মুত্তাক্বী বলে বিবেচিত হবে, তারাই হবে আল্লাহর ওলি এবং এ অভয়বাণী পাওয়ার যোগ্য। এ অভয়বাণী মূলত সে রকমেরই একটি অভয়বাণী যেমনটি কুরআনুল কারীমের বিভিন্ন আয়াতে অন্যান্য সৎকর্মশীলদেরকেও দান করা হয়েছে।[৩৩১] যেমন আল্লাহ তা'আলা অপর আয়াতে বলেন:

---

[331].আমরা যে-সব সৎকর্মশীলদেরকে সাধারণত আল্লাহ তা'আলার ওলি বলে মনে করি না, সেরকম সৎকর্মশীলদের জন্য অনুরূপ অভয়বাণী উচ্চারণের বিষয়টি জানার জন্য প্রয়োজনে দেখুন: সূরায়ে বাক্বারাঃ এর ৩৮, ১১২, ২৬২, ২৭৭ নং আয়াত, সূরায়ে আলে ইমরানের ১৭০ নং আয়াত, সূরায়ে নিসা এর ৮৩ নং আয়াত, সূরায়ে আন'আমের ৪৮ নং আয়াত ও সূরায়ে

﴿ يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ إِمَّا يَأۡتِيَنَّكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَقُصُّونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٣٥ ﴾ [الاعراف: ٣٥]

"হে আদম সন্তানরা! যদি তোমাদের কাছে তোমাদেরই মধ্য থেকে রাসূলগণ আগমন করে তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ বর্ণনা করে, তবে যে ব্যক্তি তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয়, তাদের কোনো আশঙ্কা নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা"।[৩৩২]এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, যারা তাক্বওয়ার পথ অবলম্বন করবে এবং নিজেকে সংশোধন করে নিবে তাদের জন্যেও ওলিদের ন্যায় সমান অভয়বাণী প্রদান করা হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, যারাই এ আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে তাঁরাই আল্লাহর ওলি হিসেবে গণ্য হবে। যদিও সাধারণ মানুষের নিকট তাঁরা ওলি হিসেবে পরিচিত নাও হতে পারেন।

আ'রাফের ৩৫ ও ৩৯ নং আয়াত। এ-সব আয়াত পাঠ করলে যে কেউই বুঝতে পারবে যে, 'আখেরাতে আল্লাহর অলিদের কোন ভয় ও চিন্তা নেই' এ অভয়বাণী শুধু তথাকথিত ওলি আল্লাহদের জন্যেই নয়, বরং আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এরকম অভয়বাণী যে কোন মু'মিন ও সৎকর্মশীলদের জন্যেও রয়েছে। লেখক

[332].আল-কুরআন, সূরা আ'রাফ:৩৫।

এ জাতীয় আয়াতসমূহে এ অভয়বাণী প্রদানের অর্থ হচ্ছে- মু'মিন, মুত্তাক্বী তথা সৎকর্মশীলদেরকে এ মর্মে আশ্বস্ত করা যে, আখেরাতে তাঁদের ভয়ের কোনো কারণ নেই, তাঁদেরকে অবশ্যই সে-দিন তাঁদের কর্মের বিনিময় স্বরূপ সম্মানজনক স্থানে পৌঁছে দেয়া হবে। এর অর্থ এ-নয় যে, তাঁরা আল্লাহর ওলি হয়েছেন বলে আখেরাতে হিসাব-নিকাশের পূর্বে তাঁরা যেমন খুশী তেমন করে ঘুরে বেড়াবেন। নিজের পরিণতির ব্যাপারে কোনো চিন্তা না করে কেবল পরের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন। আখেরাতে যেখানে রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ব্যতীত অন্যান্য সকল নবীগণ নিজের চিন্তায় মগ্ন থাকবেন, সেখানে কী করে ওলিগণ পরের চিন্তায় ব্যস্ত থাকবেন? তা ছাড়া কে সত্যিকারের অলি, তা তো প্রমাণিত হবে হিসাব-নিকাশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে। তাই হিসাবের পূর্বে সাধারণ মানুষের ন্যায় তাঁরাও নিজের কী হয়, তা নিয়ে কম-বেশী উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে থাকবেন। তাঁদের অন্তরে অন্যের চিন্তা আসলেও সে-দিনে আল্লাহর ক্রোধ ও প্রচণ্ড প্রতাপ দেখে জান্নাতে না যাওয়া পর্যন্ত মনের কথা মনের মধ্যেই থেকে যাবে। তা বের করার মত কারো সাহস হবে না। এ অভয়বাণীকে একজন ভাল পরীক্ষা দানকারীর ভাল ফলাফল লাভের আশার সাথে তুলনা করা যায়। ভাল পরীক্ষা দানকারীর অন্তরে ভাল ফলাফল লাভের আশা থাকলেও ফলাফল প্রকাশিত না হওয়া

পর্যন্ত তার অন্তরে সে আশার পাশাপাশি তার নিজের অজান্তে কোনো ভুল হয়ে যাওয়ার কারণে নম্বর কমে যায় কী না, তা নিয়ে অনেক উদ্বেগ ও উৎকন্ঠা থাকে, তেমনি ওলিগণ এ সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়ে থাকলেও মানুষ হিসেবে তাঁদের ভুল-ভ্রান্তি হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় হিসেব নিকাশের মাধ্যমে নিজেদের জান্নাতবাসী হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অন্তর আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত থাকবে এবং সে ভয়ই তাঁদেরকে অন্যের মুক্তির ব্যাপারে চিন্তা করা থেকে বিরত রাখবে। নবীগণ যেখানে আল্লাহর ভয়ে নফসী নফসী করবেন, সেখানে অলীগণ অন্যের চিন্তা করবেন, এটা কী করে সম্ভব হতে পারে!? তবে হ্যাঁ, নিজের ব্যাপারে নিশ্চিত হয়ে জান্নাতে যাওয়ার পর তাঁরা অন্যের ব্যাপারে চিন্তা করবেন এবং শাফা'আতের সুযোগ আসলেই তাঁরা তাঁদের সে সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কেননা, এটিই কুরআন, সুন্নাহ ও যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত।

সাধারণ মু'মিনরগণও শাফা'আত করবে:

হিসাব-নিকাশের পর জান্নাতীগণ জান্নাতে চলে যাওয়ার পর জাহান্নামীদের জাহান্নাম থেকে বের করে আনার জন্য রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পরপর তিন থেকে চারটি শাফা'আতের পর যখন মু'মিনদের শাফা'আতের সুযোগ আসবে,

উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সে শাফা‘আতের সুযোগ কেবল আমাদের কাছে পরিচিত ওলিদের জন্যেই হবে না, বরং তখন বেহেশ্তবাসী যে কোনো সাধারণ মু’মিনরাও তাদের পরিচিতজনদের জন্য শাফা‘আত করার সুযোগ পাবে। ولله الحمد والمنة

যারা কারো শাফা‘আত পাবে না:

মূলত শাফা‘আত হচ্ছে জাহান্নামীদের উপর আল্লাহ তা‘আলার করুণা নাযিলের একটি বিশেষ মাধ্যম। তবে এ করুণা লাভের সৌভাগ্য কেবল তাদেরই নসীব হবে যারা শির্কের মত মহা অপরাধে আল্লাহর বিচারে দন্ডিত না হয়ে অন্যান্য কবীরা গুনাহের অপরাধে দন্ডিত হয়ে জাহান্নামী হবে। আর যারা শির্কে আকবারের অপরাধে দন্ডিত হয়ে জাহান্নামী হবে তাদের জন্য সে দিন আল্লাহর কোনো করুণা নেই। কেননা, জান্নাত তাদের জন্য চিরতরে হারাম করে দেয়া হয়েছে। তাই তাদের যেমন রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা‘আত পাওয়ার সৌভাগ্য হবেনা, তেমনি তাদের অপর কোনো মু‘মিনদেরও শাফা‘আত প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য হবেনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِيْ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰه إِلاَ اللهُ خَالِصًا مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ».

“আমার শাফা‘আত লাভে সে লোকই ধন্য হবে যে নিজ থেকে একনিষ্ঠভাবে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু এর স্বীকৃতি দান করেছে”।[৩৩৩] এ কালিমার স্বীকৃতি একনিষ্ঠভাবে তারাই দিয়ে থাকবে, যারা শির্ক না করে মৃত্যুবরণ করবে। অপর হাদীসে রাসলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«أَتَانِيْ آتٍ مِن عِنْدِ رَبِّيْ فَخَيَّرَنِيْ بَيْنَ أَنْ يُدْخَلَ نِصْفُ أُمَّتِيْ الْجَنَّةَ وبَيْنَ الشَّفَاعَةِ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، وَ هِيَ لِمَنْ لاَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا»

“আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে একজন আগন্তুক আগমন করলেন এবং আমাকে আমার অর্ধেক উম্মত জান্নাতে প্রবেশ করা আর শাফা‘আত করার মধ্য থেকে যে কোনো একটিকে গ্রহণ করার জন্য এখতিয়ার দিলেন, তখন আমি শাফা‘আতকেই বেছে নিলাম। এ শাফা‘আত হবে কেবল তাদের জন্যেই যারা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করেনি”।[৩৩৪] যারা শির্কের অপরাধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শাফা‘আত থেকে বঞ্চিত হবে, তারা যে অন্যান্য সকল শাফা‘আতকারীদের শাফা‘আত পাওয়া থেকেও বঞ্চিত হবে, তা বলার অপেক্ষা

---

333. বুখারী, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল ইলম, বাবুল হিরসি আলাল হাদীস, হাদীস নং-৪০), ১/১/৫৯।

334. তিরমিযী, প্রাগুক্ত; (কিতাবু সিফাতিল কিয়ামাঃ, বাব: মা জা-আ ফীশ শাফা‘আতি); পৃ.৬২৭-৬২।

রাখেনা। এমন ব্যক্তিদের জাহান্নামে যাওয়ার কারণ না জেনে কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করলেও সে সুপারিশ তাদের জন্য কোনো কাজে আসবে না। তারা চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অধিবাসী হিসেবে সেখানে অনন্তকাল পর্যন্ত শাস্তির পর শাস্তি ভোগ করতেই থাকবে। نعوذ بالله من الشرك ومن عذابه.

উল্লেখ্য যে, হাশরের ময়দানে কোনো ওলি ও মু'মিনদের শাফা'আত করার সুযোগ না থাকা এবং জাহান্নামে প্রবেশকারীদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসার ব্যাপারে তাদের শাফা'আত হওয়া প্রসঙ্গে আমি উপরে যা বললাম, এটি আমার নিজস্ব কোনো ইজতেহাদী কথা নয়। এটি যেমন উপর্যুক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত, তেমনি তা মুসলিম মনীষীদের লেখনী দ্বারাও প্রমাণিত। আল্লামা ইবনু আবিল 'ইয্য আল-হানাফী (রহ.)ও তাঁর কিতাবে মু'মিনদের শাফা'আত প্রসঙ্গে উক্ত ধরনের কথাই বলেছেন।[৩৩৫]

---

[335]. তিনি রাসূল এর শাফা'আতের আট নং শাফা'আতের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন: " النوع الثامن : شفاعته في أهل الكبائر من أمته ، ممن دخل النار ، فيخرجون منها ، و قد تواترت بهذا النوع الأحاديث ... وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة و النبيون و المؤمنون أيضا – ".

দেখুন :ইবনু আবিল ইয্য আল- হানাফী, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৫৪-২৫৯।

আখেরাতে রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা‘আতের সংখ্যা:

আখেরাতে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কতবার শাফা‘আত করবেন, এ-নিয়ে মুসলিম মনীষীদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। ইবন আবিল ইয্য আল-হানাফীর (রহ.) মতে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-মোট আটবার শাফা‘আত করবেন।[৩৩৬] ইমাম নববী (রহ.) এর মতে মোট পাঁচবার[৩৩৭] এবং ‘তাইসীরুল আযীযিল হামীদ’ এর গ্রন্থকার মোট ছয়বারের কথা বলেছেন।[৩৩৮] তাঁরা সংখ্যা বর্ণনার ক্ষেত্রে মতবিরোধের পাশাপাশি উভয় পর্যায়ের শাফা‘আতকে একত্রিত করে বর্ণনা করেছেন। কতটি হাশরের ময়দানে এবং কতটি পরে হবে, তা ভিন্নভাবে উল্লেখ করেন নি। ফলে এ বিষয়ে যাদের গভীর জ্ঞান থাকবে না, তারা তা অধ্যয়ন করলে এ-কথা ভাবতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বোধ হয় হাশরের ময়দানে তাঁর শাফা‘আতের মাধ্যমে সকল অপরাধীদেরকে মুক্ত করে নেবেন। ফলে মুশরিক নয় এমন সকল অপরাধী মু’মিনরাই জাহান্নামে

---

[336]. তদেব।

[337]. ইমাম নববী, শরহু সহীহ মুসলিম; (স্থান বিহীন: ১ম সংস্করণ, ১৯২৯ খ্রি.), ১/৩/৩৫।

[338]. শেখ সুলাইমান ইবনে আব্দিল্লাহ, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯৪-২৯৫।

প্রবেশের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। অনুরূপভাবে তাদের আরো মনে হবে যে, মু'মিনগণ তাঁদের ভক্তদের জন্য রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মতই হাশরের ময়দানে শাফা'আত করবেন। অথচ এ ধারণা যে আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসদ্বয়ের পরিপন্থী, তা সে হাদীস অধ্যয়ন করলে যে কেউই বুঝতে পারবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সাধারণ মুসলিমদেরকে শির্কে পতিত করানোর ক্ষেত্রে শয়তানের বিভিন্ন অপকৌশল

আমরা কমবেশী সকলেই জানি যে, শয়তান অহঙ্কারবশত আল্লাহ তা'আলার আদেশকে অমান্য করে আদম আলাইহিস সালামকে সেজদা না করার কারণে মহান আল্লাহ তাকে তাঁর রমহত থেকে বিতাড়িত করে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করেছিলেন। বহিষ্কৃত হওয়ার প্রাক্কালে সে এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করে বের হয়েছিল যে, বনী আদমের মধ্যকার আল্লাহর একনিষ্ঠ অল্প সংখ্যক বান্দাদের ব্যতীত অবশিষ্ট সবাইকেই সে তার বহুমুখী ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সরল ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করবে। আল্লাহ তা'আলা তার এ প্রতিজ্ঞার জবাবে বলেছিলেন: **"আমার বান্দাদের উপর তোমার কোনো কর্তৃত্ব নেই, তবে পথভ্রষ্টদের মধ্যকার যারা তোমার অনুসরণ করবে, তাদের কথা সতন্ত্র"**।[৩৩৯] শয়তান তার এ প্রতিজ্ঞা পূরণের জন্য সকল বনী

---

[339].এ প্রসংগে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطَٰنٌ إِلَّا مَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلۡغَاوِينَ ﴾ [الحجر: ٤٢]

দেখুন: আল-কুরআন:সূরা:আল-হিজর: ৪২।

আদমের পিছনে জিন ও মানুষের মধ্যকার তার অনুসারীদেরকে দিবানিশি লাগিয়ে রেখেছে। তারা বিভিন্ন কৌশলে তাদের ঈমান ও ‘আমল নষ্ট করার কাজে সর্বদা তৎপর রয়েছে। সাধারণ মানুষতো দুরের কথা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরও ‘আমল নষ্ট করার ব্যাপারে চেষ্টা করতেও তার অনুসারীরা ত্রুটি করে নি। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বলেন:

‘‘জিনদের মধ্যকার একটি দুষ্ট জিন এসে গত রাতে আমার সালাত ভেঙ্গে দেয়ার জন্য আক্রমণ করেছিল। তাকে পাকড়াও করার ব্যাপারে আল্লাহ আমাকে সুযোগ করে দিয়েছিলেন, ফলে আমি তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে মসজিদের পায়ার সাথে বেঁধে রাখতে চেয়েছিলাম, যাতে তোমরা সকালে এসে তাকে দেখতে পাও। কিন্তু ততক্ষণে আমার মনে পড়লো সুলায়মান এর সেই দো‘আর কথা, তিনি বলেছিলেন: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে এমন রাজত্ব দান করুন যা আমার পরে আর কারো জন্যে শোভা

পায়না। তাঁর এ দো'আর কথা মনে পড়ায় আমি তাকে ছেড়ে দেই।"।[৩৪০]

রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর 'আমল নষ্ট করার ক্ষেত্রে শয়তানের অনুসারীদের ষড়যন্ত্র সীমাবদ্ধ থাকলেও তাঁর উম্মতগণের ঈমান ও 'আমল উভয়ই নষ্ট করার ক্ষেত্রে তার অনুসারীদের রয়েছে নানাবিধ কৌশল। বিভিন্ন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মানব সমাজে যে-সব শির্কী ধ্যান-ধারণা, কর্ম ও অভ্যাসের প্রচলন রয়েছে, তা তাদের ষড়যন্ত্রেরই ফসল। তারা যাকে যে কৌশল অবলম্বন করলে পথভ্রষ্ট করা যায়, তাকে সে কৌশলেই পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করে চলেছে। তাদের ষড়যন্ত্রের হাত থেকে আল্লাহর তা'আলার রহমতে কেবল তারাই রক্ষা পেতে পারে যাদের শরী'আত সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রয়েছে।

---

[340].বুখারী, প্রাগুক্ত; (আবওয়াবুল মাসাজিদ, বাব নং ৪২, হাদীস নং৪৪৯), ১/১৭৬ ;মুসলিম, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল মাসাজিদ, বাবনং-৮, হাদীস নং-৫৪১), ১/৩৮৪;= =রাহওয়ায়হ, ইসহাক ইবনে ইবরাহীম ইবন মিখলদ, মুসনাদ; সম্পাদনা: ড.আব্দুল গফুর আল-বেলূচী, (মদীনা: মাকতাবাতুল আইমান, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.); ১/১৪৮।

আল্লাহর অলিগণের ওসীলা ও তাঁদের শাফা‘আত সম্পর্কে সাধারণ মুসলিম জনমনে শয়তান যে অতিরঞ্জিত ধারণা প্রদান করেছে, সে ধারণা দু’টিকে সাধারণ জনগণের অন্তরে বদ্ধমূল করা এবং এ দু’টিকে কেন্দ্র করে তাদেরকে প্রত্যক্ষ শির্কে নিমজ্জিত করার জন্য তার রয়েছে বিভিন্ন অপকৌশল। নিম্নে তার কিছু অপকৌশলের বর্ণনা প্রদান করা হলো:

প্রথম অপকৌশল:

কোন কবরে কারো প্রয়োজন পূর্ণ হওয়া

ওলিগণ আল্লাহ ও সাধারণ মানুষের মাঝে মাধ্যম ও শাফা‘আতকারী হওয়ার বিষয় দু’টিকে প্রমাণ করার জন্য শয়তান সাধারণ মানুষদের কাছে কৌশল হিসেবে সে-সব লোকদের উদাহরণ এনে উপস্থাপন করে যারা তাদের কোনো প্রয়োজন কোনো কবরে উপস্থাপন করার পর তা অর্জিত হয়েছে বলে মনে করে। এ ধরনের লোকদের উদাহরণ উপস্থাপন করে শয়তান সাধারণ লোকদের অন্তরে এ কুমন্ত্রণা দেয় যে, অলিগণের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে বলেই সে-সব লোকদের মনস্কামনা তাঁদের কবরে পূর্ণ হয়েছে।

শয়তানের এ অপকৌশল থেকে বেরিয়ে আসার উপায়:

শয়তানের এ-জাতীয় অপকৌশল ও ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য জনগণকে জানতে হবে যে, আল্লাহই হলেন মানুষের ভাগ্যের একক নিয়ন্তা। প্রতিটি মানুষ তার জীবনে কী কর্ম করবে এবং জীবিতদের মধ্য থেকে কারা তার প্রয়োজন পূরণে সহযোগিতা বা দো'আ করবে, এ-সব কিছু আগাম জানার ভিত্তিতে তিনি হিকমত ও পরীক্ষার বিষয়কে সামনে রেখে তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে তারতম্য করেছেন। তাই সকলেই সম্পদশালী হতে চাইলেও একসাথে সবাই সম্পদশালী হতে পারেনা। সবাই সুস্থ শরীর, দীর্ঘায়ূ ও সন্তানাদি কামনা করলেও তা পায়না। আল্লাহর বিচারে যাকে যখন যা দেয়া উচিত, তখন তাকে তিনি তা দিয়ে থাকেন। সে-জন্য কেউ সন্তান আগে পায়, কেউ পরে পায়, আবার কেউ অদৌ পায়ই না। এ ভাবে যারা ভাগ্যের পরীক্ষায় পড়ে তাদের করণীয় হচ্ছে- ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য যখন যে কর্ম করা প্রয়োজন তখন তা নিজে বা অপর জীবিত মানুষদের সহযোগিতা নিয়ে করতে হবে। অতঃপর কর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য আল্লাহর উপরে অগাধ আস্থা রেখে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষা করতে হবে। মনে মনে এ দৃঢ় বিশ্বাস লালন করতে হবে যে, আজ হোক কাল হোক আল্লাহর ইচ্ছায় আমার ভাগ্যে

পরিবর্তন আসবেই। কোনো অবস্থাতেই ধৈর্যহারা হয়ে আল্লাহর উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ভাগ্য পরিবর্তনের আশায় অন্য কারো দারস্থ্ বা শরণাপণ্ণ হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বিশেষ করে কোনো মৃত ওলি বা দরবেশের কবরের দারস্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা, কোনো মানুষ তিনি যত বড় মাপেরই ওলি হয়ে থাকুন না কেন- মরে গেলে তাঁর পক্ষে পরের উপকার করাতো দূরের কথা তখন তিনি তাঁর নিজেরই কোনো উপকার করতে পারেন না। ইহজগতে থাকাবস্থায় মানুষের দেহের সাথে তার আত্মার স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে বিধায়, একজন মানুষ সাধ্যানুযায়ী তার নিজের ও অপর মানুষের উপকার করতে পারে। কিন্তু মরে যাওয়ার পর তার দেহের সাথে আত্মার স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকেনা বিধায়, তার পক্ষে নিজের ও পরের কারোই কোনো উপকার করা সম্ভব হয়না। সে-জন্য তখন তাঁরা জীবিতদের দো'আর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকেন। তাই সাধারণ, ওলি ও দরবেশ নির্বিশেষে সকলের কবর যিয়ারতে কেবল তাদের মাগফিরাত কামনা ও তাদের জন্য দো'আ করার উদ্দেশ্যেই যেতে হয়, তাঁদের কাছে কিছু চাওয়ার জন্যে নয়।

এতো হলো শরী'আতে কথা। কিন্তু শয়তান কবর যিয়ারতের এ উদ্দেশ্যকেই সাধারণ মানুষের কাছে বিকৃত করে

দিয়েছে। তাদের এ বুদ্ধি দিয়েছে যে, কবর যিয়ারতের উক্ত বিধান ওলিদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কেননা, তাঁরা আল্লাহর সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভ করে জান্নাতবাসী হয়ে গেছেন। সুতরাং তাদের জন্য মাগফিরাতের দো'আ করার কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁদের কবর যিয়ারতে যেতে হবে নিজের প্রয়োজনের কথা তাঁদের জানানোর জন্যে! কেননা, তাঁরা মরেও মরেন নি। তাঁদের এ মৃত্যু কেবল স্থান পরিবর্তন বৈ আর কিছুই নয়। দুনিয়াতে থাকাকালে যেমন তাঁরা মানুষের কল্যাণ করেছেন, ইন্তেকালের পরেও তাঁরা মানুষের কল্যাণের জন্য নিজেদের নিবেদিত করে রেখেছেন। যারা তাঁদের কাছে নিজেদের প্রয়োজনের কথা জানায়, তাঁরা তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন?! নাউজুবিল্লাহ ।

শয়তানের এ প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচার উপায়:

শয়তানের এ-জাতীয় প্রবঞ্চনা থেকে বাঁচতে হলে আমাদেরকে জানতে হবে যে, বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনো কবরে আবদার করে কারো উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে থাকলেও আসলে তা কবরস্থ ওলির কারণে পূর্ণ হয়েছে বলে মনে করার কোনো কারণ

নেই। কেননা, কবরে আবেদনকারীর উদ্দেশ্য দু'ভাবে পূর্ণ হতে পারে:

এক, কবরে অবেদনকারীর প্রয়োজন যদি সন্তান দান, রোগ মুক্তি ইত্যাদির মত বিষয় হয় যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অপর কেউ পূর্ণ করতে পারে না, তা যদি কোনো কবরে চেয়ে বা কবরের কূপের পানি ও গাছের ফল খেয়ে কেউ পেয়ে থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে, আসলে সে ব্যক্তির এ প্রয়োজন আল্লাহ তা'আলাই পূর্ণ করেছেন। এর সাথে সে ওলির মধ্যস্থতা ও শাফা'আতের কোনই সম্পর্ক নেই। আল্লাহই সে ব্যক্তির ঈমানী পরীক্ষা গ্রহণের জন্য তার ভাগ্যে তা বিলম্বে দানের বিষয়টি লিখে রেখেছিলেন। সে যদি কবরে না যেয়ে ধৈর্যের সাথে এ সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার বাড়ীতে বসেই আল্লাহর কাছে বিনয়ের সাথে তা চাইতে থাকতো, তা হলে ঠিক এ সময়েই তার বাড়ীতে বসেও তার এ উদ্দেশ্য পূর্ণ হতো। কিন্তু তা না করে কবরে যাওয়ার কারণে তার ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষায় সে অকৃতকার্য হয়েছে বলে নিজেকে প্রমাণ করে দিল।

দুই, আর যে সকল প্রয়োজন আল্লাহ ব্যতীত অপর কোনো মানুষ বা জিনের পক্ষে স্বাভাবিকভাবে পূর্ণ করা সম্ভব, কারো এমন কোনো প্রয়োজন কোনো কবরে আবেদনের পর পূর্ণ হয়ে থাকলে বুঝতে হবে যে, শয়তান নিজেই কবরে আবেদনকারী এবং অন্যান্য আরো লোকদের ঈমান নষ্ট করার জন্য সে ব্যক্তির প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়েছে।

আমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে, কারো উত্তম জীবন ও জীবিকা লাভ করা তার ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল নয়। আমরা এ-জগতে যেমন নিজেদের ইচ্ছায় আগমন করি নি, তেমনিভাবে সবাই আল্লাহর কাছে উত্তম জীবিকা চাইলেও তা সমানভাবে পাই না। আবার যারা আল্লাহকে বিশ্বাসই করেনা তারাতো আল্লাহর কাছে কিছুই চায় না। তা সত্ত্বেও তারা এ দুনিয়ায় আমাদের অনেকের চেয়ে ভাল জীবন ও জীবিকা লাভ করে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জীবন ও জীবিকার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছাধীন। তিনি ইচ্ছা করে আমাদের সৃষ্টি করেছেন। সুস্থ জীবন ও উত্তম জীবিকা লাভের জন্য আমাদেরকে সতর্কতা অবলম্বন এবং ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম করার নির্দেশ করেছেন এবং

কারা কী করবে তা আগাম জানার আলোকে আমাদের ভাগ্যে তা লিখে রেখেছেন। এখন আমরা যদি তাঁর তাওহীদে বিশ্বাসী হয়ে সুস্থ জীবন ও উত্তম জীবিকা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম করে তাঁর কাছে তা কামনা করি, তা হলে তা পাই আর না পাই, অন্তত আমাদের ঈমান ঠিক থাকবে। আর যারা তাঁকে বিশ্বাস করেনা, অথচ উত্তম জীবন ও জীবিকা লাভের জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করে, অথবা তাঁর উপর বিশ্বাস রাখে কিন্তু মৃত অলিগণের কাছে বা তাঁদের মাধ্যম ও শাফা'আতে উত্তম জীবন ও জীবিকা চেয়ে তা পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাজ করে, তিনি হিকমতের ভিত্তিতে তাদের অনেককেও তা দিয়ে থাকেন কেননা; তারা সকলেই তাঁর সৃষ্টি। তারা তাঁকে বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, তাঁর তাওহীদে বিশ্বাসী হোক আর না-ই হোক এবং তাঁর কাছে সরাসরি কিছু চাক আর না-ই চাক, কাফির-মুশরিক-মুসলিম নির্বিশেষে সকলের জন্যই তাঁর দান অবারিত।[৩৪১] তাই কোনো কবরে কারো

---

[341].এ প্রসংগে আল্লাহ বলেন:

{كُلًّا نُمِدُّ هَؤُلاَءِ وَ هَؤُلاَءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَ مَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُوْراً

প্রয়োজন পূর্ণ হলে এতে কারো বিভ্রান্ত হবার কোনই অবকাশ নেই।

এছাড়াও আমাদের আরো মনে রাখতে হবে যে, কালোবাজারী করে সম্পদ অর্জন করলে তা যেমন আল্লাহরই দান হয়ে থাকে, তেমনিভাবে কোনো কবরে কিছু চাওয়ার পর তা পেলে তাও আল্লাহরই দান হয়ে থাকবে। এতে কালোবাজারী করা যেমন বৈধ হয়ে যাবেনা, তেমনি এতে কবরে কিছু চাওয়াও বৈধ হয়ে যাবেনা। সম্পদ দেওয়ার মালিক যেমন আল্লাহ, তেমনি বিপদ থেকে রক্ষা করার মালিকও তিনিই। এতে মৃত অলিগণের ওসীলা ও শাফা'আতের কোনই হাত নেই। 'কুরায়শরা লাত, উয্যা, মানাত ও হুবল নামের সৎ মানুষ ও ফেরেশ্তাদের মূর্তি ও জিনের মাধ্যম ও শাফা'আতে আল্লাহর কাছে উত্তম জীবন ও জীবিকা এবং বৃষ্টির জন্য আবদার করে অনেক সময় তা পেতো।[৩৪২] তাই বলে কি এ-কথা স্বীকার করা যাবে যে, তারা তাদের দেব-দেবীদের ওসীলা ও শাফা'আতেই এ-সব পেতো? বা তাদের দেব-দেবীদের এ-সব

"আমি তোমার রবের দান থেকে এদের ও ওদের সবাইকে দিয়ে থাকি। আর তোমার রবের দান কারো জন্যে নিষিদ্ধ নয়"। আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল: ২০।

[342]. ইবনে তাইমিয়্যাঃ, এক্বতেদাউস সিরাতিল মুস্তাকীম; পৃ. ৩২০।

দেয়ার যোগ্যতা ছিল? তা যদি স্বীকার করা না যায়, তা হলে আমাদের কিছু প্রাপ্তির পিছনেও মৃত ওলিগণের মধ্যস্থতা, শাফা'আত ও দানের বিষয়কে স্বীকার করা যাবে না। কেননা, তাঁরা ওয়াদ, সুয়া', ইয়াগুছ, য়াউক ও নছর এবং ফেরেশ্তা ও জিনদের মতই আল্লাহর সৃষ্ট জীব। তাঁরা আল্লাহর ওলি হয়ে এবং ফেরেশ্তারা আল্লাহর অনুগত বান্দা হয়েও যদি আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছার বাইরে নিজ থেকে মানুষের কোনো উপকার করতে না পারেন, তা হলে আমরা যাদের ওলি বলে মনে করি, তাঁরাও মৃত্যুর পর মানুষের কোনো উপকার করতে পারবেন না। প্রকৃতপক্ষে ওলিদের ব্যাপারে এ ধরনের ধারণা করা কুফরী বৈ আর কিছুই নয়।

এ সম্পর্কে প্রখ্যাত হানাফী আলেম আল্লামা শামী বলেন:

(إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله اعتقاده ذلك كفر)

"যদি (কেউ) এ ধারণা করে যে, আল্লাহ ব্যতীত মৃত মানুষেরা পার্থিব বিষয়াদি পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করেন, তা হলে তার এ ধারণা কুফরের অন্তর্গত বলে বিবেচিত হবে"।[৩৪৩]

---

[343]. ইবনে 'আবিদীন, প্রাগুক্ত;২/১৭৫।

রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কারো কোনো উপকার করতে পারেন না:

কোন মৃত মানুষ যদি কারো উপকার করতে পারে তা হলে সর্বাগ্রে তা আমাদের রাসূল-**সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম**- এরই পারার কথা। অথচ বাস্তবতা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর তিরোধানের পর মুসলিমগণ বহু অপ্রত্যাশিত ঘটনার শিকার হয়েছিলেন; কিন্তু বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য কখনও কোনো সাহাবীকে তাঁর রওজা মুবারকে যেয়ে তাঁর নিকট কোনো অভিযোগ করতে বা সাহায্য চাইতে দেখা যায় নি। বা তাঁকে তাঁদের বিপদ দূর করতে এবং সমস্যার সমাধান করে দেয়ার জন্য কিছু বলেছেন বলেও কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সাহাবীগণ যেমন তাঁর কাছ থেকে কোনো সাহায্য চাননি, তেমনি তিনি নিজ থেকে আগ্রহী হয়েও তাঁদের কোনো উপকার করেন নি। তাঁর যদি কোনো উপকার করার সামর্থ্য থাকতো, তা হলে তাঁর তিরোধানের পরপরই খিলাফতের বিষয় নিয়ে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে কোনো বিতর্কের সৃষ্টি হতো না। ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু-কে একজন অগ্নিপূজকের হাতে শহীদ হতে হতো না। ‘উছমান

রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বিদ্রোহীদের হাতে নির্মমভাবে শাহাদৎ বরণ করতে হতো না। 'উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হত্যার বিষয়কে নিয়ে 'আলী ও মু'আবিয়া এর মধ্যে কোনো যুদ্ধবিগ্রহ হতো না। ইয়াজীদ ইবনে মু'আবিয়ার সৈনিকদের দ্বারা মদীনায় লুটতরাজ, গণহত্যা ও শ্লীলতাহানির মত জঘন্য কর্ম সংঘটিত হতো না। সর্বোপরি কারবালা প্রান্তরে ইয়াযীদের সৈন্যদের হাতে তাঁর দৌহিত্র হোসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর নির্মমভাবে শাহাদৎ বরণ করতে হতো না। তাঁর হাদীসসমূহ মানুষের বানানো হাদীসের সাথে মিলে একাকার হয়ে যেতো না। ইমাম বুখারী ও অন্যান্য মুহাদ্দিসগণ তাঁর রওযা মুবারকের পার্শ্বে যেয়ে তাঁর নিকট থেকে তাঁর হাদীসগুলো জেনে নিতেন। ফলে মুসলিম উম্মাহের মাঝে বিভিন্ন 'আমলের ক্ষেত্রে তাঁর হাদীসকে কেন্দ্র করে কোনো মতভেদের সৃষ্টি হতো না। তাঁর হাদীসসমূহের মধ্যে কোন্টি নাসিখ ও কোন্টি মানসূখ, তাও জেনে নেয়া সম্ভব হতো। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি তিনি এ-সব ক্ষেত্রে কোনো কিছুই করতে পারেন নি। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁর এ-সব ক্ষেত্রে কাউকে কোনো সাহায্য করার কোনই সামর্থ্য নেই। এই যদি হয় দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ মানব ও আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় মানুষের অবস্থা, তা হলে তাঁর

উম্মতের মাঝে এমন কে থাকতে পারেন, যিনি মৃত্যুর পর জীবিত মানুষের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন? বস্তুত কোনো মানুষ মরে যাওয়ার পর যদি তার ব্যাপারে এ ধারণা করা হয় যে, তিনি এখনও মানুষের উপকার করতে পারেন এবং এ ধারণার ভিত্তিতে যদি সে ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয়, তা হলে তা হবে প্রকাশ্য শির্ক। এ-জাতীয় শির্ককারীদের ব্যাপারে আল্লাহ বলেন:

﴿ إِن تَدۡعُوهُمۡ لَا يَسۡمَعُواْ دُعَآءَكُمۡ وَلَوۡ سَمِعُواْ مَا ٱسۡتَجَابُواْ لَكُمۡۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يَكۡفُرُونَ بِشِرۡكِكُمۡۚ ﴾ [فاطر: ١٤]

"তোমরা যদি তাদেরকে (সাহায্যের জন্য) আহ্বান কর, তা হলে তারা তোমাদের ডাক শুনবে না, আর শুনলেও তারা তোমাদের ডাকের কোনো জবাব দিবেনা। আর কেয়ামতের দিন তারা তোমাদের শির্ককে অস্বীকার করবে"।[৩৪৪] তারা বলবে: প্রভু হে ! আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি বলে ওরা আমাদের প্রতি মিছেমিছি যে ধারণা করেছিল, সে ধারণার ভিত্তিতেই ওরা আমাদেরকে তাদের সাহায্য করার জন্য আহ্বান করেছে। আমরা

[344]. আল-কুরআন, সূরা ফাতির : ১৪।

কখনও তাদেরকে সাহায্যের জন্য আমাদেরকে আহ্বান করতে বলিনি। আপনাকে সাহায্যের জন্য আহ্বান না করে আমাদেরকে আহ্বান করার করণে ওরা যে শির্ক করেছে, আমরা তাদেরকে তা শিক্ষা দেইনি।

ওলিগণ কারো উপকার করতে না পারার প্রমাণ

ওলিগণ যে মৃত্যুর পর মানুষের কোনো উপকার করতে পারেন না এর জ্বলন্ত প্রমাণ হলো- দীর্ঘকাল থেকে তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মূর্খ মানুষেরা কত শির্কী কর্ম করে চলেছে, কত লোকেরা তাঁদের কবরে সেজদা করছে, তাঁরা জীবিত থাকতে এমনটি কেউ করলেতো তাঁরা তাতে অবশ্যই বাধা দিতেন। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে যে-সব শির্কী কর্ম করা হচ্ছে, তাথেকে তাঁরা কাউকে বারণ করছেন না। এতে প্রমাণিত হয় যে, তাঁরা আসলে কিছুই করতে পারেন না। যদি পারতেন তা হলে অন্তত তাঁদের কবরে সেজদা করা থেকে লোকদের বারণ করতেন। সাধারণ লোকেরা তাঁদেরকে অসীম শক্তির অধিকারী বলে মনে করে। তাঁরা যা চান তাই করতে পারেন বলে মনে করে। ২০০৩ সালে যখন ইরাক ইঙ্গ-মার্কিনীদের অবৈধ হামলার শিকার হয়, তখন ওলীদের গোপন শক্তি থাকার ব্যাপারে বিশ্বাসী লোকেরা ভেবেছিল এবার বুশ-

ব্লেয়ারের খবর হয়ে যাবে। যে মাটিতে শুয়ে আছেন গউছুল আ'যম আব্দুল কাদির জীলানী, সে মাটিতে এবার ওদের বারোটা বাজবেই। তাঁর অভিসম্পাতে ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে। কিন্তু দেখা গেল হিতে বিপরীত হয়ে গেল। ওরা এ-সব মুসলিমদের কাল্পনিক বিশ্বাসকে মিথ্যায় পর্যবসিত করে দিয়ে এক মাসের মধ্যেই সমগ্র ইরাক দখল করে নিল। কই বড় পীরতো তাঁর দেশ রক্ষার জন্য কিছুই করলেন না। এমনকি তাঁদের শক্তিতে বিশ্বাস পোষণকারীদের প্রবঞ্চনা করার জন্য শয়তানের পক্ষ থেকেও কিছু করা সম্ভব হলোনা। হাজারো নিরপরাধ শিশু ও নারী অন্যায়ভাবে দুস্কৃতিকারী দখলদারদের হাতে নির্মমভাবে আত্মাহুতি দিল, তা দেখেও তিনি কিছু করলেন না। এরপরেও কি এ-কথা বিশ্বাস করা যায় যে, ওলিগণ অনেক কিছু করতে পারেন!? কেউ হয়তো বলতে পারেন যে, সাদ্দাম হোসেনের স্বৈরশাসন থেকে দেশের জনগণকে রক্ষার জন্য হয়তো আব্দুল কাদির তাঁকে সাহায্যের জন্য আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়া না দিয়ে নীরব ছিলেন। এমন চিন্তাকারীকে বলবো: সাদ্দাম হোসেনকে যদি সরাতেই হয়, তা হলে তা বুশ আর ব্লেয়ারকে দিয়ে কেন? সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী তিনি নিজেই তো তাকে সরানোর জন্য যথেষ্ট ছিলেন। তা না হয় আল্লাহর কাছে বলে দিতেন-প্রভু! সাদ্দামকে সরিয়ে দাও। ফলে আল্লাহ তাকে সরিয়ে দিতেন। কিন্তু তিনি কিছুই

করলেন না। যা হবার তা-ই হয়ে গেল। এ-সব কিছু মিলে এ-কথা প্রমাণিত হয়ে গেল যে, আসলে ওলিগণ সাধারণ মানুষের মতই মৃত। সাধারণ মৃত মানুষের মত তাঁরাও কারো জন্যে কিছুই করতে পারেন না। কোনো অন্যায়ের কথা তাঁরা নিজ থেকে জানতে পারেন না, জানতে পারলেও তাঁরা তা রোধ করতে পারেন না। সে জন্যেই যুগ যুগ ধরে তাঁদের কবরকে কেন্দ্র করে শির্কী কর্ম অহরহ হয়েই চলেছে। এর পরেও কি আমরা তাঁদের নিয়ে এ-সব আকাশকুসুম ও অলীক কল্পনা লালন করতেই থাকবো? اللَّهُمَّ لا.

দ্বিতীয় অপকৌশল:

বেলায়তের দাবীদারদের দ্বারা কিছু তেলেশমাতি প্রকাশ

আমাদের এ বিষয়টি জানা আবশ্যক যে, যারা ঈমান ও সৎ কর্ম করে বা না করে ওলি হওয়ার দাবী করে এবং বাহ্যিকভাবে চমক সৃষ্টিকারী কিছু কাজ-কর্ম দ্বারা তারা জনগণকে নিজেদের ওলি হওয়ার কথা প্রচার করতে চায়, তারা কোনো দিনই আল্লাহর ওলি নয়। প্রকৃত পক্ষে তারা শয়তানেরই ওলি। এদের দ্বারা কিছু আশ্চর্যজনক কাজ-কর্ম সংঘটিত হয়ে থাকলেও তা মূলত শয়তানেরই তেলেশমাতি। শয়তান এদের কারো অবগতি এবং কারো অবগতির বাইরে তাদের রক্ত-মাংসের সাথে মিশে গিয়ে

তাদের দ্বারা অনেক অদ্ভূত কর্ম সংঘটিত করায়। অনেক সময় তাদের কাছে কেউ আগমন করলে তারা আগমনকারীকে কোনো জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই তার নাম ও আগমনের উদ্দেশ্য বলে দিতে পারে। অনেক সময় তাদের সামনে উপস্থিত লোকদেরকে তারা কারো আগমনের আগাম সংবাদ দেয়। বাস্তবের সাথে তাদের কথা মিলেও যায়। অনেকে যখন পাগলের বেশে গোরস্থান ও বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ায় তখন মস্তবড় একজন আল্লাহওয়ালা ও অচেনা মানুষের আকৃতিতে এসে শয়তান নিজেকে তাদের কাছে খিযির--এর পরিচয় দিয়ে কিছু উপদেশবাণী দিয়ে যায়। কখনও খিযির এর পরিচয় দিয়ে সাধারণ মানুষের সেবা করার জন্য কোনো গাছ বা কোনো বস্তু দিয়ে যায়। আবার কাউকে স্বপ্নের মাঝে কিছু দিয়ে জনগণকে তা তা'বীজ হিসেবে ব্যবহার করতে দেয়ার উপদেশ দিয়ে যায়। আবার যখন তারা কোনো ওলির কবরের পার্শ্বে বসে মুরাকাবা করে তখন অদৃশ্যে থেকে সে তাদের সাথে অনেক সময় কথাও বলে।

শয়তানের এ ধরনের তেলেশমাতি প্রকাশ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাঃ (রহ.) বলেন:

"যারা শয়তাদের পছন্দনীয় কর্ম যেমন: শির্ক, ফাসেকী ও অপরাধমূলক কাজ করে, শয়তান তাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন

করে। ফলে তাদের বন্ধু যাতে তার কাশফ প্রকাশ করতে পারে সে-জন্যে কখনও তারা তাকে গায়েব সম্পর্কিত কোনো বিষয়ের তথ্য প্রদান করে। কখনও যাকে সে কষ্ট দিতে চায় তাকে তারা হত্যা, অসুস্থতা ইত্যাদি দ্বারা কষ্ট দেয়, কখনও কোনো মানুষকে সে ধরে আনতে চাইলে তারা তাকে ধরে নিয়ে আসে, কখনও তারা তার জন্য মানুষের কোনো অর্থ সম্পদ, খাদ্য দ্রব্য ও পোশাক ইত্যাদি চুরি করে এনে দেয় এবং সে এ-সবকে ওলিদের কারামত বলে মনে করে, কখনও তারা তাকে বাতাসে উড়িয়ে অনেক দূরবর্তী কোনো স্থানে নিয়ে যায়, কখনও ‘আরাফার দিন বিকেলে মক্কা শরীফে নিয়ে যায় এবং তাৎক্ষণিকই আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং সে এটাকে (নিজের) কারামত বলে মনে করে, অথচ সে মুসলিমদের হজ্জ করেনি, হজ্জের জন্য কোনো এহরামও বাঁধেনি, তলবিয়াও পাঠ করেনি, কা‘বা শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা ও মারওয়াতে সা‘য়ীও করেনি, অথচ সর্বজন বিদিত ব্যাপার যে, এ ধরনের কর্ম মারাত্মক ধরনের পথ ভ্রষ্টতা ”।[৩৪৫]

---

[345].তিনি বলেন:

و الشياطين يوالون من يفعل ما يحبونه من الشرك و الفسوق و العصيان ، فتارة يخبرونه ببعض الأمور الغائبة ليكاشف بها ، و تارة يؤذون من يريد إيذائه بقتل أو تمريض و نحو ذلك ، و تارة يجلبون له من يريد من الإنس ، و تارة يسرقون له ما يسرقون من أموال الناس من نقود وطعام و ثياب و غير ذلك ،

তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন:

“মুশরিকদের পথভ্রষ্টতার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সেই সব বিষয়াদি যা তারা কবর নামের প্রতিমার কাছে দেখতে বা শুনতে পায়। উদাহরণস্বরূপ সে-সব বিষয়ের কথা বলা যায় যা তারা কোনো অনুপস্থিত ব্যক্তির আগমন সম্পর্কে আগাম সংবাদ অথবা এমন কোনো বিষয় যার দ্বারা কোনো প্রয়োজন পূর্ণ হয়েছে বা অনুরূপ কিছু শুনতে বা দেখতে পায়। সেই সব মুশরিকদের মধ্যকার কেউ যখন কোনো কবর ফেটে উজ্জ্বল কোনো শেখকে বেরিয়ে এসে তাকে আলিঙ্গন করতে অথবা তার সাথে কথা বলতে দেখে, তখন সে মনে করে এই শেখ হলেন কবরস্থ নবী।

فيعتقد أنه من كرامات الأولياء ، و تارة يحملونه في الهواء فيذهبون به إلى مكان بعيد فيذهبون به إلى مكة عشية عرفة و يعودون به فيعتقد هذا كرامة مع أنه لم يحج حج المسلمين : لا أحرم و لا لبى و لا طاف بالبيت وبين الصفا و المروة و معلوم أن هذا من أعظم الضلال."

ইবনে তাইমিয়্যাঃ, আল-ক্বা’ইদাতুল জালীলাঃ ফিত তাওয়াসসুলি ওয়াল অছীলাঃ; সম্পাদনায় সৈয়দ রশীদ রেজা, (...: মাকতাবাতিছ ছেক্বাফাতিত দ্বীনিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীণ), পৃ. ২৯।

অথচ প্রকৃতপক্ষে নবীর কবর ফেটে যায় নি, শয়তানই তাকে তা নাটক করে দেখিয়েছে”।[৩৪৬]

তিনি আরো বলেন:

“যারা মৃত কোনো নবী বা অপর কাউকে আহ্বান করতে বা তাদের নিকট সাহায্যের জন্য আবেদন করতে অভ্যস্ত হয়েছে তারা দূর থেকে যখন তাঁদেরকে সাহায্যের জন্য আবেদন করে তখন তারা তাঁদের আকৃতিতে কাউকে দেখতে পায় অথবা যাকে তারা দেখতে পায় তাকে তারা তাঁদের আকৃতির মত বলে মনে করে এবং সে দৃশ্যমান লোক তাদেরকে বলে: আমি অমুক, এই বলে সে তাদের সাথে কথা বলে, তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়, তখন তারা মনে করে: যে মৃত ব্যক্তিকে তারা সাহায্যের জন্য আহ্বান করেছিল সেই ব্যক্তিই তাদের সাথে কথা বলেছে ও

---

[346]. তিনি বলেন,

إن من أعظم ضلال المشركين ما يرونه أو يسموعونه عند الأوثان كإخبار عن غائب أو أمر يتضمن قضاء حاجة و نحو ذلك ، فإذا شاهد أحدهم القبر انشق و خرج منه شيخ بهي عانقه أو كلمه ، ظن أن ذلك هو النبي المقبور ، و القبر لم ينشق و إنما الشيطان مثل له ذلك

ইবনে তাইমিয়্যাঃ, আত্তাওয়াস্সুল ওয়াল ওসীলাতু ; পৃ.৩১, ৩২।

তাদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দিয়েছে, অথচ এ কথোপকথনকারী হচ্ছে জিন ও শয়তান''।[৩৪৭]

এভাবে বিভিন্ন উপায়ে শয়তান তার তেলেশমাতি প্রকাশ করে এদেরকে ও সাধারণ লোকদেরকে তাদের ওলি হওয়া এবং তাদের দ্বারা সংঘটিত বিষয়াদিকে তাদের ওলি হওয়ার নিদর্শন বা কারামত বলে বুঝাতে চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে যারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর ওলি সাধারণত তাঁদের দ্বারা কোনো কারামত প্রকাশিত না হওয়ায় এবং তাঁদের দ্বারা শয়তানের কোনো তেলেশমাতিও প্রকাশিত না হওয়ায় অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে সাধারণ মানুষ হিসেবে গণ্য করে।

অপরদিকে যে সকল সৎ ব্যক্তিদের দ্বারা তাঁদের জীবনকালে আল্লাহ কোনো কারামত প্রকাশ করেছিলেন, তাঁদের কবরগুলোকেও শয়তান তার তেলেশমাতি প্রকাশের আস্তানায় পরিণত করে। তাঁদের কবরের খাদিমদের রক্ত-মাংসে মিশে যেয়ে যেমন তাদের দ্বারা অনেক তেলেশমাতি প্রকাশ করে, তেমনি কবরে অবস্থান গ্রহণকারী বা যিয়ারতকারীদেরকেও নানাভাবে তেলেশমাতি দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে। সময়ের পরিবর্তনে ধর্মের ক্ষেত্রে মানুষের অজ্ঞতা যতই বাড়ছে শয়তানের তেলেশমাতী

---

[347]. তদেব; পৃ.৩০।

প্রকাশের ধরনও ততই বাড়ছে। যারা ফকিরী বেশে রাস্তায় উলঙ্গ বা অর্ধ উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়, শয়তান তাদের সাথেও মিশে তার তেলেশমাতি প্রকাশ করছে। এ অবস্থায় কবরে যারা ঘুরে বেড়ায়, অজ্ঞ লোকদের দৃষ্টিতে তাদেরকেও ওলি বানিয়ে ছাড়ে। এ-জাতীয় ওলিদের প্রসঙ্গে মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন:

“কেউ যদি তার কাশফ দ্বারা অদৃশ্য কোনো বিষয় বা ভবিষ্যতের কোনো বিষয়ের সংবাদ দেয়, তা হলে এটি সে ব্যক্তির কামিল হওয়ার কোনো দলীল নয় এবং এটি তার আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ারও প্রমাণ বহন করেনা। কারণ, কারো কাশফ হওয়ার জন্য সে ব্যক্তির মুসলিম হওয়া শর্ত নয়। কেননা, কাশফ একজন পাগল ও কাফির ব্যক্তিরও হতে পারে। প্রকৃত কথা হলো: অদৃশ্য সম্পর্কে কাশফ হওয়ার বিষয়টি শরীরের একটি গোপন শক্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত। এটি একজন কাফির, ফাসিক ও পাগলেরও হতে পারে এবং তাদের অধিকাংশ কাশফ বাস্তবের সাথে মিলেও যায়। এ-জাতীয় কাশফ প্রকাশকারীদের আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়ার সাথে কোনই সম্পর্ক নেই। তবে সাধারণ লোকেরা বর্তমানে এ ধরনের কাশফের দ্বারাই আকৃষ্ট হয়। যখনই এমন কোনো ব্যক্তির দ্বারা কোনো কাশফ হতে দেখে, তখনই তারা সে ব্যক্তিকে কামিল মানুষ বলে মনে করে, ফলে নিজেরা

এতে বিভ্রান্ত হয়, অপরকেও বিভ্রান্ত করে''।[৩৪৮] তাই কারো দ্বারা কোনো কাশফ হওয়া বা কোনো ধরনের তেলেসমাতি প্রকাশিত হওয়া দেখলেই আমাদের বিভ্রান্ত হওয়া চলবে না। এ-জাতীয় লোকদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য ইমাম শাফিঈ (রহ.) বলেন:

"إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ، و يطير في الهواء ، فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب و السنة."

''যখন তোমরা কোনো ব্যক্তিকে পানির উপর চলতে এবং বাতাসে উড়ে বেড়াতে দেখ, তখন কুরআন ও সুন্নাতের সাথে সে ব্যক্তির কর্ম ও আচরণ মিলিয়ে না দেখে তার দ্বারা প্রতারিত হবে না।''।[৩৪৯]

মানুষের ঘাড়ে শয়তানের সওয়ার হওয়ার প্রমাণ:

যারা ওলি না হয়েও বেলায়তের মিথ্যা দাবী করে, শয়তান যে তাদের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে তেলেশমাতি দেখায় এর প্রমাণে

---

[348].মুহাম্মদ শফী', মাজালিসু হাকীমিল উম্মাত; (দিল্লী: রববানী বুক ডিপো, সংস্করণ বিহীন, ১৩৯৬হি:), পৃ. ৪৯-৫০।

[349]. ইবনু আবিল ইয্য আল-হানাফী, প্রাগুক্ত ; পৃ.৫৭৩।

মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ هَلۡ أُنَبِّئُكُمۡ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَٰطِينُ ۝ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ۝ ﴾ [الشعراء: ٢٢١، ٢٢٢]

"আপনি বলুন:আমি কি তোমাদেরকে তাদের সন্ধান দেব যাদের উপরে শয়তানরা অবতীর্ণ হয় ? শয়তানতো অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক মিথ্যুক ও পাপিষ্ঠের উপর"।[৩৫০]

শয়তান মানুষদের পথভ্রষ্ট করার জন্য যেমন বেলায়তের মিথ্যা দাবীদার ও পাপিষ্ঠদের সাথে সখ্যতা গড়ে তুলে, তেমনি সে অনেক ভাল মানুষদেরকেও বিভ্রান্ত করার জন্য তাদের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলার চেষ্টা করে। যারা শরী'আতের জ্ঞানে পরিপক্ক থাকেন আল্লাহর রহমতে তারা তার বিভ্রান্তির হাত থেকে রক্ষা পান। কিন্তু যাদের জ্ঞানের পরিধি স্বল্প তারা অনেক সময় তার বিভ্রান্তির শিকার হন। একদা আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.)-কেও শয়তান বিভ্রান্ত করতে এসেছিল। তিনি বলেন:

---

[350]. আল-কুরআন, সূরা শু'আরা: ২২১-২২২।

‘‘একদা আমি উপাসনায় লিপ্ত ছিলাম, হঠাৎ করে একটি বড় আরশ দেখতে পেলাম, যার উপরে রয়েছে একটি নূর, সে নূর থেকে আমাকে সম্বোধন করে বলা হলো: হে আব্দুল কাদির ! আমি তোমার রব, অন্যের উপর আমি যা হারাম করেছি, তোমার জন্য তা হালাল করে দিলাম। এ-কথা শুনার পর আব্দুল কাদির বললেন: (أنت الله الذي لا إله إلا هو) তুমি কি সেই আল্লাহ যিনি ব্যতীত অপর কোনো ইলাহ নেই? হে আল্লাহর শত্রু ! দূর হও এখান থেকে। তিনি বলেন: এ-কথার পর আরশের সেই আলো ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল এবং তা অন্ধকারে পরিণত হল। অবশেষে আমাকে লক্ষ্য করে শয়তান বললো : দ্বীনের ব্যাপারে তোমার অগাধ জ্ঞান ও তোমার নিজের অবস্থা সম্পর্কে তোমার সম্যক অবগতির দ্বারা আমার চক্রান্ত থেকে তুমি বেঁচে গেলে। আমি এই প্রক্রিয়ায় সত্তর ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করেছি’’।[৩৫১]

---

[351]. ইবনে তাইমিয়্যাহ, আত-তাওয়াসসুলু ওয়াল ওসীলাতু; পৃ. ৩১। আব্দুল কাদির জীলানী (রহ.)-কে প্রশ্ন করা হয়েছিল : এ আলো যে শয়তানের, তা আপনি কী করে বুঝলেন? জবাবে তিনি বলেন : আমি তার কথা (قد أحللت لك ما حرمت على غيرك) এর দ্বারা তাকে বুঝতে পেরেছি। কেননা, আমি জানি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শরী’আত রহিত

শয়তান যদি আব্দুল কাদির জীলানীর মত ব্যক্তিকে বিভ্রান্ত করার জন্য চেষ্টা করতে পারে, তা হলে যারা জ্ঞান ও তাকওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর সমতুল্য নয়, তাদের কাছে যে সে কতভাবে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে থাকবে, তা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুত যারা নিজেদেরকে আল্লাহর ওলি বলে প্রচার করে, যারা বেলায়ত লাভের ফিকির নিয়ে বিভিন্ন কবর ও জঙ্গলে পাগল বা মজ্যুব হয়ে ঘুরে বেড়ায়, শয়তান এদেরকে অধিক হারে তার তেলেশমাতী দেখিয়ে বিভ্রান্ত করে। সে জঙ্গলে ও কবরে তাদের নিকট খিযির এর পরিচয় দিয়ে আগমন করে। আবার কারো কাছে আব্দুল কাদির (রহ.)-এর নিকট আগমনের ন্যায় আল্লাহর পরিচয় দিয়ে আগমন করে। যেমন মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী এমনটি দাবী করেছে। সে নাকি আল্লাহ তা'আলাকে একটি যুবকের মত দেখেছে।[৩৫২]

ও পরিবর্তন হবার নয়। তা ছাড়া সে বলেছিল: আমি তোমার রব। কিন্তু তার পক্ষে (أنا الله الذي لا إله إلا هو) এ কথা বলা সম্ভব হয়নি। এথেকেও তার শয়তান হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পেরেছি।"

[352]. দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪০ নং টীকা দ্রষ্টব্য।

মোটকথা যারাই আল্লাহর ওলি হওয়ার শরী'আত নির্ধারিত ঈমান ও তাকওয়ার পথ বাদ দিয়ে বৈরাগ্য অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহর ওলি হতে চায় এবং এ অবস্থায় আল্লাহ, রাসূল, খিযির ও কোনো ওলির সাথে সাক্ষাৎ পেতে চায়, শয়তান তাদের সাথে কোনো একটি আকর্ষণীয় আকৃতিতে এসে বলে- আমি আল্লাহ বা রাসূল বা খিযির অথবা সেই অলি, যার সাথে তুমি সাক্ষাতের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো। কিন্তু তারা তাদের অজ্ঞতার কারণে এ কথা বুঝে উঠতে পারেনা যে, আসলে তাদের সাথে যে সাক্ষাত করেছে সে হলো শয়তান।

আল্লাহ ও রাসূলকে কারা স্বপ্নে দেখতে পারেন?

আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে স্বপ্নে কেবল তারাই দেখতে পারেন যারা ঈমান ও 'আমলে সালেহ এর গুণে গুণান্বিত।[৩৫৩] কিন্তু, যাদের অবস্থা উপরে বর্ণিত হয়েছে তারা

---

[353]. যারা আহলুত তাওফীক কেবল তাঁরাই রাসূল কে স্বপ্নে দেখতে পারে। কিন্তু যারা তাদের দলভুক্ত নয়, তাদের স্বপ্নে দেখার বিষয়টি সত্য হতেও পারে, আবার মিথ্যাও হতে পারে। কেননা, শয়তানের চক্রান্তের মাধ্যমে একজন যিন্দিক তথা কাফিরের দ্বারাও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটতে পারে, যেমন তা হয়ে থাকে একজন সত্যবাদীর জন্য কারামতস্বরূপ। তবে উভয়ের মাঝে

কোনো দিন তাঁদেরকে জাগ্রত অবস্থায় দেখাতো দূরের কথা, কখনো স্বপ্নে দেখারও কথা নয়। তা ছাড়া আল্লাহ তা‘আলাকে জাগ্রত অবস্থায় পৃথিবীতে থাকাকালে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও দেখেন নি। মে‘রাজের রাতে কোনো এক স্থানে আল্লাহর সাথে তাঁর একান্ত কথা-বার্তা হওয়ার সময় তিনি কি আল্লাহ তা‘আলাকে স্বচক্ষে দেখেছিলেন? এ নিয়ে মুসলিম মনীষীদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। কারো মতে স্বচক্ষে দেখেছেন। তবে অধিকাংশ মনীষীদের মতে স্বচক্ষে দেখেন নি। বরং অন্তর চক্ষু দিয়ে দেখেছিলেন।[৩৫৪] এবং পর্দার অন্তরাল থেকেই উভয়ের

পার্থক্য অর্জিত হবে কিতাব ও সুন্নাতের অনুসরণের দিক বিবেচনা করে। যিনি কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী হবেন তাঁর স্বপ্ন সত্য হবে, আর যিনি কিতাব ও সুন্নাতের অনুসারী হবেন না, তার স্বপ্ন মিথ্যা হবে। দেখুন: ইবনে হাজার আসক্বালানী, ফতহুলবারী; ১২/৩৮৫।

ثم ذكر أنه عام في أهل التوفيق وأما غيرهم فعلى الاحتمال فان خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء كما يقع للصديق تحصل التفرقة بينهما باتباع الكتاب والسنة انتهى.

[354]. এ প্রসঙ্গে মুল্লা আলী ক্বারী হানাফী বলেন:

"إن أهل السنة و الجماعة و إن أجازوا رؤية الله في الدنيا عقلا ، وواقعة و ثابتة في العقبى سمعا ونقلا ، لكنهم اختلفوا في جوازاها في الدنيا شرعا . والذين أثبتوها في الدنيا خصوا وقوعها له صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، على

মাঝে কথা-বার্তা হয়েছিল। কুরআনুল কারীম দ্বারা এ কথারই সত্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহান আল্লাহ বলেন:

﴿ ۞وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحۡيًا أَوۡ مِن وَرَآيِٕ حِجَابٍ أَوۡ يُرۡسِلَ رَسُولٗا فَيُوحِيَ بِإِذۡنِهِۦ مَا يَشَآءُۚ ﴾ [الشورا: ٥١]

"আর কোনো মানুষের পক্ষে এমনটি হওয়া সম্ভবপর নয় যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তবে তিনি মানুষের সাথে ইলহাম বা পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন। অথবা (সে জন্য) তিনি কোনো দূত প্রেরণ করেন, অতঃপর সে দূত আল্লাহ যা চান তা তাঁর অনুমতিক্রমে পৌঁছে দেন"।[৩৫৫] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহ মানুষের সাথে মোট তিনভাবে কথা বলেন:

خلاف في ذلك بين السلف والخلف من العلماء و الأولياء... ثم قال و الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم إنما رأى ربه بفؤاده ، لا بعينه"

--:দেখুন: ইবনু আবিল ইয্য আল-হানাফী, প্রাগুক্ত;পৃ. ১৮৪।

355. মাওলানা মুহাম্মদ শফী';প্রাগুক্ত; পৃ.১২২৬।

এক, ওহী অর্থাৎ গোপন পন্থায় ইলহাম বা স্বপ্নের মাধ্যমে। এ প্রক্রিয়ায় তিনি নবী-রাসূল ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন।

দুই, পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলেন।

তিন, রাসূল তথা ফেরেশ্তা প্রেরণের মাধ্যমে কথা বলেন। মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী'ও উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৩৫৬]

আল্লাহ তা'আলা যখন মানুষের সাথে উপর্যুক্ত এ তিন মাধ্যমে কথা বলে থাকেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই এ-কথা প্রমাণিত হয় যে, মে'রাজের রজনীতে তিনি রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে পর্দার অন্তরাল থেকেই কথা বলেছিলেন। মূসাও আল্লাহ তা'আলাকে সরাসরি দেখার জন্য আবেদন করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বলেছিলেন:

﴿ قَالَ لَن تَرَىٰنِي وَلَٰكِنِ ٱنظُرۡ إِلَى ٱلۡجَبَلِ فَإِنِ ٱسۡتَقَرَّ مَكَانَهُۥ فَسَوۡفَ تَرَىٰنِيۚ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُۥ لِلۡجَبَلِ جَعَلَهُۥ دَكّٗا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقٗاۚ ﴾ [الاعراف: ١٤٣]

356. তদেব; পৃ.১২২২।

“তুমি আমাকে কস্মিনকালেও (সরাসরি) দেখতে পারবে না, তবে তুমি পাহাড়ের দিকে তাকাও সেটি যদি স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে, তা হলে তুমি আমাকে দেখতে পাবে। অতঃপর যখন তাঁর প্রভু পাহাড়ের উপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, তখন তিনি সেটাকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন”।[৩৫৭] এ আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, এ দুনিয়াতে থাকাবস্থায় বা আখেরাতের পূর্বে আল্লাহ তা‘আলাকে চর্মচক্ষে দেখা কোনো নবী-রাসূল ও ওলিদের পক্ষেও সম্ভবপর নয়।

যুক্তির দিক থেকে দুনিয়ায় আল্লাহ তা‘আলাকে স্বচক্ষে দেখার সম্ভাবনা থাকলেও বাস্তবে যখন মূসা এবং আমাদের রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে আল্লাহ তা‘আলাকে সরাসরি দেখা সম্ভব হয়নি, তখন অন্য কারো পক্ষে যে তা আদৌ সম্ভবপর হবে না, তা বলা-ই বাহুল্য। এর পরেও কেউ যদি এ দুনিয়ায় আল্লাহকে সরাসরি স্বচক্ষে দেখেছে বলে দাবী করে, তবে সে যে একজন মস্তবড় মিথ্যুক হবে, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যারা রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু

---

357. আল-কুরআন, সূরা আ‘রাফ : ১৪৩।

আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ব্যতীত অপর কারো জন্যে এ পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলাকে স্বচক্ষে দেখার কথাকে বিশ্বাস করে এদেরকে ইমাম কাওয়াশী অমুসলিম বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩৫৮]

আক্বীদা বিষয়ক কবিতায় জনৈক কবি বলেন:

و من قال في الدنيا يراه بعينه ** فذاك زنديق طغا و تمردا

و خالف كتاب الله و الرسل كلها ** و زاغ عن الشرع الشريف و أبعدا

"যে বলে আল্লাহকে দুনিয়ায় স্বচক্ষে দেখা যায়, সে হলো যিন্দীক, সে তো সীমালজ্ঘন করেছে। আল্লাহর কিতাব এবং সকল রাসূলদের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। আর শরী'আত থেকে বিপথগামী হয়ে বহু দূরে চলে গেছে"।[৩৫৯]

অপর দিকে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাতের পর তাঁকেও তাঁর সাহাবীগণ কখনও জাগ্রত অবস্থায়

---

[358].ইমাম কাওয়াশী সূরা নাজম এর তাফসীরে বলেন:

"ومعتقد رؤية الله تعالى هنا بالعين لغير محمد صلى الله علية وسلم غير مسلم."

:দেখুন:ইবনু আবিল ইয্য আল-হানাফী, প্রাগুক্ত;১৮৪।

[359]. তদেব; পৃ.১৮৬।

দেখতে পায়নি। এমতাস্থায় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে জাগ্রত অবস্থায় দেখার কথা বলে তারা আসলে শয়তানকেই দেখে। "রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-কে যারা স্বপ্নে দেখে তারা তাঁকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখতে পাবে"[৩৬০] এ মর্মে একটি হাদীস বর্ণিত হয়ে থাকলেও রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুখ নিঃসৃত মূল বাণীটি কী, এ নিয়ে এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইমাম মুসলিম এর বর্ণনায় বর্ণনাকারীগণ সন্দেহ প্রকাশ করে বলেছেন:"যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে, অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখলো"।[৩৬১] রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মূল বাণী যদি "সে যেন আমাকে জাগ্রত

---

360. " مَنْ رَأَنِيْ فِيْ المَنَامِ فَسَيَرَانِيْ فِي الْيَقْظَةِ وَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِيْ الشَّيْطَانُ ".বুখারী, প্রাগুক্ত; কিতাবুর রু'য়া, বাব নং ১০, হাদীস নং ৬৫৯২), ৬/২৫৬৭; ইবনে হাজার 'আসক্বালানী, ফতহুলবারী; ১২/৩৮৩; মুসলিম, প্রাগুক্ত; (কিতাবুর রু'য়া, হাদীস নং ২২৬৬), ৪/১৭৭৫।

361.ইমাম মুসলিম এর বর্ণনায় সন্দেহ প্রকাশ করে বলা হয়েছে (فسيراني في اليقظة أو لكأنما رأني في اليقظة) "আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে অথবা সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থার মতই দেখলো"এ কথা বর্ণিত হয়েছে। ইমাম ইসমাঈলী উক্ত কথার বদলে বলেছেন: (فقد رأني في اليقظة) "যে আমাকে স্বপ্নে দেখলো সে যেন আমাকে জাগ্রত অবস্থায়ই দেখলো"। দেখুন:মুসলিম, প্রাগুক্ত; ৪/১৭৭৫।

অবস্থায় দেখলো” এমনটি হয়, তা হলে এ হাদীস নিয়ে কোনো জটিলতা নেই। তা না হয়ে যদি রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মূল বাণী “সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে” হয়ে থাকে, তা হলে এ হাদীসের সঠিক অর্থ কী হবে, এ নিয়ে মনীষীগণ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তাঁরা বলেছেন:

যদি রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর মূল বাণী হয় “সে আমাকে জাগ্রত অবস্থায় দেখবে”- তা হলে এ বাক্যটি তাঁদের মতে একটি জটিল বাক্য। এর সমাধানে তারা মোট ছয়টি মতামত ব্যক্ত করেছেন। যা সংক্ষিপ্তাকারে নিম্নে বর্ণিত হলো:

এক, এটি রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- একটি উপমা স্বরূপ বলেছেন। অর্থাৎ -যে তাঁকে স্বপ্নে দেখবে, তার এ দেখাটি তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় দেখার মতই হবে।

দুই. যে এমনটি দেখবে সে জাগ্রত হয়ে তার এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা যথাযথভাবে দেখতে পাবে।

তিন. এ হাদীসটি তাঁর সমসাময়িক লোকদের সাথে সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ-তাঁর সময়কার যে ব্যক্তি তাঁকে না দেখে ইসলাম গ্রহণ করার পর এমন স্বপ্ন দেখবে, সে তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় কিছু দিন পরে হলেও দেখতে পারে।

চার. যে এমন স্বপ্ন দেখবে সে রাসূলের আয়নাতে তাঁকে দেখতে পাবে। যেমনটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু দেখেছিলেন।

পাঁচ. যে এমনটি দেখবে, সে কেয়ামতের দিন তাঁকে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সাথে দেখতে পাবে।

ছয়. যে এমনটি দেখবে, সে বাস্তবে তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় দেখতে পাবে। তবে এ অর্থ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাস্তব কিছু সমস্যা রয়েছে যা তা গ্রহণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকে।[৩৬২] হাদীসবিদ ইবনে হাজার 'আসক্বালানী উক্ত

---

[362].তিনি বলেন:

الحاصل من الأجوبة ستة أحدها أنه على التشبيه والتمثيل ودل عليه قوله في الرواية الأخرى فكأنما رأني في اليقظة، ثانيها: أن معناها سيرى في اليقظة، ثالثها:أنه

বাহ্যিক অর্থকে একটি জটিল ও অবিশ্বাস্য অর্থ বলে মন্তব্য করেছেন।[৩৬৩]

খিযির এর সাক্ষাৎ:

خاص بأهل آلاف ممن آمن به قبل أن يراه، رابعها:أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك ، وهذا من أبعد المحامل، خامسها: أنه يراه يوم القيامة بمزيد الخصوصية لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام، سادسها: أنه يراه في الدنيا حقيقة و يخاطبه ، و فيه ما تقدم من الإشكال

দেখুন: ইবনে হাজার, ফাতহুলবারী, ১২/৩৮৫।

[363]. এক দল সালেহীন থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নে দেখার পর পুনরায় তারা তাঁকে জাগ্রত অবস্থায়ও দেখেছেন। কিছু বিষয় সম্পর্কে তারা তাঁকে জিজ্ঞাসাও করেছেন। এবং জিজ্ঞাসার ফলাফলও সঠিকমত পেয়েছেন। ইবনে হাজার এ-কথা উল্লেখ করে বলেন: তাদের এ দাবী যদি সত্যি হয়, তা হলে তা একটি জটিল বিষয় হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, এতে তারা সাহাবী হওয়ার মর্যাদা পাবেন, এবং কেয়ামত পর্যন্ত যারা এভাবে রাসূলকে দেখেছে বলে দাবী করবে, তারাও সাহাবী হওয়ার মর্যাদা পাবে। অপর পক্ষে এমনও কিছু মনীষী রয়েছেন, যাঁরা রাসূলকে স্বপ্নে দেখেছেন বলে বর্ণানা করেছেন, কিন্তু তারা তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় দেখার কথা বলেন নি। সে-জন্য যারা রাসূলকে জাগ্রত দেখার কথা বলেন তাদের কথাকে বাহ্যিক অর্থে গ্রহণ করলে তা একটি জটিল অর্থ বলেই প্রতীয়মান হয়। **দেখুন: তদেব।**

খিযির আলাইহিস সালাম জীবিত আছেন কি না, এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। যদি তিনি জীবিত থাকতেন, তা হলে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ও তাঁর সাহাবীদের সাথে কম হলেও দু'একবার সাক্ষাৎ করতেন। কিন্তু তাঁদের সাথে কখনও তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়না। এমতাবস্থায় বেলায়তের দাবীদার ও পাগলদের সাথে তাঁর সাক্ষাতের কথা কী করে সত্য হতে পারে? এতে প্রমাণিত হয় যে, বেলায়তের দাবীদারগণ শর'য়ী দৃষ্টিতে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর ওলি নয়, তারা শয়তানের অলি। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, বর্তমানে সাধারণ মানুষের কাছে এরাই হলো আল্লাহর বড় অলি। শয়তান এদের মাধ্যমেই সমাজে তার ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করে রেখেছে। বড় বড় ওলিদের কবরে আস্তানা গেড়ে বসে থেকে সেখানে নিবেদনকারীদের যে-সব মনোবাঞ্ছা তার পক্ষে পূর্ণ করা সম্ভব, তা সে পূর্ণ করে দিচ্ছে। আর এর দ্বারা সাধারণ লোকদেরকে সহজেই তার শিকারে পরিণত করছে। সাধারণ লোকেরা এ-গুলোকে সে-সব ওলি ও বেলায়তের মিথ্যা দাবীদারদের রূহানী শক্তির বলে প্রকাশিত কারামত হিসেবে মনে করছে।

প্রকৃত ওলির পরিচয়:

যারা ঈমান ও তাক্বওয়ার গুণে গুণান্বিত মহান আল্লাহর দৃষ্টিতে তাঁরাই যে সত্যিকারের ওলি সে কথা আমরা এ পরিচ্ছেদের মধ্যেই একটু পূর্বে বর্ণনা করে এসেছি। সে অনুযায়ী যারাই এ'দুটি গুণ অর্জন করতে সক্ষম হবে তাঁরাই হবে আল্লাহর অলি। মানব সমাজে তাদের পরিচিতি আলেম, ডাক্তার, প্রকৌশলী, বিজ্ঞানী, কৃষক, ক্ষেতমজুর, ঝাড়ুদার ও মুচি যা-ই থাকুক না কেন, তারা প্রত্যেকেই একেকজন আল্লাহর ওলি হয়ে থাকবে। তাদের প্রত্যেকের জন্যেই আখেরাতে শান্তিময় জীবন লাভের অভয়বাণী থাকবে। প্রত্যেক মুসলিমকে নিজের পরকালীন মুক্তির জন্য ঈমান ও তাক্বওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতেই হবে। যারা এ যোগ্যতা অর্জনের চেষ্টা করেন, তারা কস্মিনকালেও নিজেদেরকে আল্লাহর ওলি হয়েছেন বলে দাবী করতে পারেন না। ওলিদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে আখেরাতে যে অভয়বাণীর কথা বলা হয়েছে, তারা বেশী হলে সেই সুসংবাদ প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এর জন্য তাঁরা নিশ্চিত হতে পারেন না। কেননা, তাদের ধর্ম-কর্ম আল্লাহর

কাছে গৃহীত হচ্ছে কি না, তা তো কেবল আল্লাহ্‌ ব্যতীত আর কেউই সঠিক করে বলতে পারেনা। তাঁরা নিজের ধর্ম-কর্ম স্রেফ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই করে থাকেন বলে কোনো দিনই তাঁরা নিজের ব্যাপারে ‘আমি আল্লাহর ওলি হয়ে গেছি’ বলে এ ধরনের কোনো দাবী করতে এবং এ নিয়ে কোনো আত্মতৃপ্তিও অনুভব করতে পারেন না। এ ধরনের দাবী করা কোনো সুস্থ মস্তিষ্ক ও প্রকৃত মু’মিনের কাজ হতে পারে বলেও তাঁরা মনে করতে পারেন না। তাঁদের দ্বারা কোনো কারামত প্রকাশিত হয়ে থাকলে কারো কাছে তাঁরা তা বলে বেড়াতেও পারেন না।

তৃতীয় অপকৌশল :

ওলিগণ মানুষের আহ্বান শ্রবণ করতে পারেন বলে ধারণা প্রদান

যে মানুষ মরে যায়, সে মানুষ আমাদের দৃষ্টিতে কোনো ওলি হোন আর না-ই হোন, তিনি মরে যাওয়ার পর তার আর কোনো অনুভূতি থাকেনা। তাকে হাজার বার আহ্বান করলেও তিনি আর তা শুনতে পান না। এটিই হচ্ছে বাস্তবতা। কিন্তু, শয়তান অলিগণের ব্যাপারে সাধারণ জনমনে একটি স্বতন্ত্র ধারণা দিতে

চেষ্টা করেছে যে, তাঁরা মরেও মরেন না। তাঁরা কেবল ইনতেকাল বা স্থানান্তরিত হন। স্থান পরিবর্তনের পর তাঁদের রূহানী শক্তি পূর্বের চেয়ে আরো বৃদ্ধি পায়। এ কারণেই যে যেখান থেকেই তাঁদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করুক না কেন, তাঁরা নিজ নিজ কবর থেকেই তা শুনতে পান এবং আহ্বানকারী ব্যক্তির উপকার করেন। প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেন।

শয়তানের এ অপকৌশল ছিন্ন করার জন্য আমাদেরকে দু'টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে হবে:

এক, মানুষের দেহ থেকে আত্মা বেরিয়ে যাওয়ার পর মানুষ কি মরে যায়, না ইন্তেকাল করে? মৃত্যুর পর রূহ কোথায় যায় ?

দুই, মৃত মানুষের শ্রবণের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য কী?

মানুষ মরে না ইন্তেকাল করে?

এ-কথা সত্য যে, আমাদের দেহের সাথে রূহের সহঅবস্থান যতদিন থাকে, ততদিন আমরা এ ইহজগতে জীবিত থাকি। আর যখন তা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন আমাদের এ দেহ

মরে যায়। আমাদের দেহ মরে যাওয়ার মাধ্যমে আমরা বরযখী জগতে স্থানান্তরিত হই। এটি হচ্ছে পরজগতের প্রথম ধাপ। এ সময় আমাদের দেহ মরে গেলেও রূহ মরে না। এমতাবস্থায় একজন মানুষ মরে যাওয়ার পর তিনি মরে গেছেন না ইন্তেকাল করেছেন কোনটি বলবো ?

মৃত্যুর মাধ্যমে সকল মানুষ পরজগতে স্থানান্তরিত হলেও কুরআনুল কারীমের পরিভাষায় তাদেরকে স্থানান্তরিত হয়েছেন না বলে মরে গেছেনই বলা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ আর অসাধারণ মানুষ বলে কুরআন ও হাদীসে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মৃত্যুকে মৃত্যু বলেই আখ্যায়িত করেছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ۝٣٠ ﴾ [الزمر: ٣٠]

“নিশ্চয় তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে”।[৩৬৪]

অপর স্থানে বলেছেন:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُۚ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْۚ ﴾ [ال عمران: ١٤٤]

“আর মুহাম্মদ একজন রাসূল মাত্র, তাঁর পূর্বেও রাসূলগণ অতিবাহিত হয়েছেন, তিনি যদি মরে যান বা নিহত হন, তা হলে তোমরা কি তোমাদের পিছনে ফিরে যাবে”।[৩৬৫]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণও তাঁর মৃত্যুকে ইন্তেকাল না বলে মৃত্যু বলেই মনে করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর যখন ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু অন্যরূপ চিন্তা করেছিলেন, তখন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু সবাইকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন:

[مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ وَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللّٰهَ حَيٌّ لاَيَمُوْتَ.]

---

364. আল-কুরআন, সূরা যুমার:৩০।

365. আল-কুরআন, সূরা আলে ইমরান: ১৪৪।

"যে মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উপাসনা করে সে নিশ্চিতভাবে জেনে রাখুক যে, মুহাম্মদ মৃত্যুবরণ করেছেন। আর যে আল্লাহর উপাসনা করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ নিশ্চিত জীবিত, তিনি মরেন না"।[৩৬৬] রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মৃত্যুকে আল্লাহ ও সাহাবীদের দৃষ্টিতে যদি ইন্তেকাল না বলে মৃত্যু বলা হয়, তা হলে অন্য কারো মৃত্যুকে মৃত্যু না বলে ইন্তেকাল বা স্থানান্তরিত বলার কোনো যৌক্তিকতা থাকে না। তর্কের খাতিরে যদি তা স্বীকার করেও নেয়া হয়, তবুও কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট প্রমাণ ছাড়া মৃতদের রূহের শ্রবণের বিষয়টি স্বীকার করা যায়না।

মৃত্যুর পর মানুষের রূহ কোথায় যায়?

---

[366].বুখারী, প্রাগুক্ত; (কিতাবু ফাযাইলিস সাহাবাহ, বাব নং-৫, হাদীস নং ৩৪৬৭), ৩/১৩৪১;বায়হাক্বী, আহমদ ইবনে হুসাইন, আস্সুনানুল কুবরা; (মক্কা: মাকতাবাতু দারুল বায, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আত্বা, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯৪ খ্রি.), ৮/১৪২;ইবনে কাছীর, তাফসীরুল রুরআনিল আজীম; ১/৪১০।

মৃত মানুষের রূহের শ্রবণ করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পূর্বে মৃত্যুর পর মানুষের রূহ কোথায় যায়-এ বিষয় সম্পর্কে আমাদের সঠিক ধারণা হলে মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত অনেক জিজ্ঞাসারই জবাব আমরা অতি সহজেই অবগত হতে পারবো।

এ বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও মনীষীগণের মতামত যাচাই করে যা জানা যায় তা হলো:মানুষ মরে যাওয়ার পর নাকীর ও মুনকার ফেরেশ্তাদ্বয়ের জিজ্ঞাসাবাদের পূর্বে মানুষের শরীরের সাথে রূহের সম্পর্ক হয় এবং জিজ্ঞাসাবাদের পর সে সম্পর্ক পুনরায় বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর রূহ কোথায় যায় আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য আল-হানাফী এর বর্ণনানুযায়ী এ নিয়ে মনীষীদের বিভিন্ন মতামত রয়েছে। নিম্নে এর উল্লেখযোগ্য কয়কেটি মত বর্ণিত হলো:

1. মু'মিনদের রূহসমূহ জান্নাতে অবস্থান করে এবং কাফিরদের রূহসমূহ জাহান্নামে অবস্থান করে।
2. মু'মিনদের রূহসমূহ জান্নাতের বাইরে এর দরজার নিকটবর্তী প্রাঙ্গনে থাকে, সেখানে থেকেই তারা জান্নাতের সুঘ্রাণ ও জীবিকা লাভ করে।

3. ইমাম মালিক (রহ.) বলেন: আমার নিকট এ মর্মে সংবাদ পৌঁছেছে যে, রূহসমূহ মুক্ত থাকে এবং তা যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়ায়।

4. কা'ব আল-আহবার এর মতে মু'মিনদের রূহ সপ্তম আকাশে অবস্থিত 'ইল্লিয়্যীন' নামক স্থানে অবস্থান করে এবং কাফিরদের রূহ সপ্তম জমিনের নিচে 'সিজ্জীন' নামক স্থানে থাকে।

5. ইমাম ইবনে হাযাম বলেন: শরীর সৃষ্টির পূর্বে রূহ যেখানে ছিল মৃত্যুর পর তা সেখানে অবস্থান করে।

6. ইমাম ইবনে 'আব্দিল বার বলেন:শহীদদের রূহসমূহ জান্নাতে থাকে এবং অন্যান্য সাধারণ মু'মিনদের রূহ তাদের কবর প্রাঙ্গনে থাকে।[৩৬৭]

7. শেখ আব্দুর রহমান আল-জাযা-ইরী বলেন: কবরে জিজ্ঞাসাবাদের পর মানুষের রূহসমূহ ইল্লিয়্যীন অথবা সিজ্জিনে থাকে এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা এ-ভাবেই বন্দী অবস্থায় থাকে। প্রত্যেকের শরীরের সাথে তার রূহের সম্পর্ক ঠিক সেভাবে হয়ে থাকে যেভাবে মোবাইল ফোনের সংযোগ টাওয়ারের সাথে থাকে। এ সংযোগের

---

[367].আল্লামা ইবনু আবিল ইয্য আল-হানাফী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৫৩, ৪৫৪।

মাধ্যমেই একজন কবরবাসী তাকে যিয়ারতকারী ও সালামকারীদের সম্পর্কে অবগত হয়ে থাকে।[৩৬৮]

৪. ইমাম ইবনু কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ বলেন: রূহ দু'প্রকার:এক, শাস্তি ভোগকারী রূহ। দুই, আরাম ভোগকারী রূহ। যারা শাস্তির মধ্যে রয়েছে তারা কেউ কারো সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতে পারে না। আর যারা শান্তিতে রয়েছে তারা পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করে।[৩৬৯]

উপর্যুক্ত মতামতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করলে এ-কথা প্রমাণিত হয় যে, মৃত্যুর পর রূহ কোথায় যায়, এ ব্যাপারে সুনিশ্চিত করে কিছু বলা কঠিন। এ ক্ষেত্রে কোনো সুনির্দিষ্ট দলীল না থাকার কারণেই মনীষীগণ এ ব্যাপারে উপর্যুক্ত মতামত ব্যক্ত করেছেন। রূহ কবরে থাকে এ-কথা যদি নিশ্চিত করে বলা না যায়, তা হলে রূহকে সম্বোধন করে কিছু বললে তা শ্রবণ করতে পারে, এ-কথা নিশ্চিত করে বলার কোনো উপায় নেই।

মৃত মানুষের শ্রবণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য :

---

[368].শেখ আব্দুর রহমান আল-জাযাইরী, 'আক্বীদাতুল মু'মিন; পৃ.৪১৮।

[369]. ইবনু কাইয়্যিম, কিতাবুর রূহ; পৃ.২৬।

কুরআন ও হাদীসের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিদান করলে দেখা যায় যে, জীবিত মানুষ যেভাবে শ্রবণ করতে পারে মৃত মানুষ সেভাবে শ্রবণ করতে পারেনা। এ বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য আমরা নিম্নে বর্ণিত আয়াতসমূহের প্রতি লক্ষ্য করতে পারি। যারা জীবিত থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান-বুদ্ধি খাটিয়ে সত্যকে গ্রহণ না করে মৃত মানুষের ন্যায় আচরণ করে মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন:

﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ ٱلۡمَوۡتَىٰ ﴾ [الروم: ٥٢]

“তুমি মৃতদের শ্রবণ করাতে পারবে না”।[৩৭০] অপর আয়াতে বলেছেন:

﴿ وَمَا يَسۡتَوِي ٱلۡأَحۡيَآءُ وَلَا ٱلۡأَمۡوَٰتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُسۡمِعُ مَن يَشَآءُۖ وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ ٢٢ ﴾ [فاطر: ٢٢]

“শ্রবণ করার ক্ষেত্রে জীবিত আর মৃতরা এক নয়, নিশ্চয় আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান, তুমি কবরে শায়িতদেরকে শুনাতে পারবে না”[৩৭১] অত্র আয়াত দু’টিতে আল্লাহ তা‘আলা জীবিত মুশরিক ও কাফিরদের কর্তৃক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা না শুনার অবস্থাকে কবরবাসীদের শ্রবণ না করার অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন। কবরবাসীরা শ্রবণ

---

[370]. আল-কুরআন, সূরা রূম:৫২।

[371]. আল-কুরআন, সূরা ফাতির:২২।

করতে পারে কি না, এ-কথা বলা এ আয়াত দু'টির মুখ্য উদ্দেশ্য না হয়ে থাকলেও যেহেতু আয়াত দু'টিতে মুশরিকদের শ্রবণ না করার অবস্থাকে মৃত মানুষ বা কবরস্থ মানুষের না শুনার সাথে তুলনা করা হয়েছে, এতে প্রমাণিত হয় যে, আসলে মৃত মানুষেরা নিজ থেকে কিছু শুনতে পারে না। কেননা, একটি বস্তুকে অপর বস্তুর বৈশিষ্ট্যের সাথে তুলনা কেবল তখনই করা হয় যখন সংশ্লিষ্ট বৈশিষ্ট্যে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য থাকে বা অপর বস্তুর মধ্যে সে বৈশিষ্ট্যটি অধিকমাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এতে বুঝা যায় যে, মৃতরা নিজ থেকে আদৌ কিছু শুনতে পারে না বলেই মুশরিকদের না শুনাকে মৃতদের না শুনার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

উপর্যুক্ত আয়াত দু'টির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত হাদীসবিদ আল্লামা আলবানী (মৃত ১৯৯৯ খ্রি.)বলেন:''উক্ত আয়াত দু'টিতে মুশরিকদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা না শুনার অবস্থাকে মৃত মানুষের শ্রবণ না করার অবস্থার সাথে তুলনা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মৃত লোকেরা আসলে নিজ থেকে কিছুই শ্রবণ করতে পারে না। একজন মানুষের সাহসিকতার প্রশংসা করে যদি তাকে সিংহের সাথে তুলনা করা হয়, তা হলে এতে যেমন সিংহের দুর্দান্ত সাহসিকতা প্রমাণিত হয়, ঠিক তেমনি উক্ত আয়াত দু'টিতে কাফিরদের শ্রবণ না করাকে মৃত মানুষের শ্রবণ না করার সাথে তুলনা করাতে

মৃতদের শ্রবণ না করার কথাই প্রমাণিত হয়। শুধু তা-ই নয়, আরবী ভাষায় দক্ষ প্রতিটি মানুষই এ তুলনার দ্বারা এ-কথাই বুঝবে যে, মৃতরা শ্রবণ করার ক্ষেত্রে জীবিতদের চেয়ে অধিক অক্ষম। আর সে কারণেই জীবিতদের শ্রবণ না করাকে মৃতদের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মৃতরা আদৌ কিছুই শ্রবণ করতে সক্ষম নয়"।[৩৭২]

মৃতরা নিজ থেকে জীবিতদের কর্মের ভাল-মন্দ অবগত হতে পারলে সর্বপ্রথম তা নবী ও রাসূলগণেরই অবগত হওয়ার কথা। তাদের পরবর্তী উম্মতগণ শরী'আত অনুসারে চলেছে কি না, বা তাঁদেরকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করে কেউ শির্ক করেছে কি না, তা তাঁদের খুব ভাল করেই জানা থাকার কথা। কিন্তু কুরআনের বক্তব্যানুযায়ী প্রতীয়মান হয় যে, তাঁরা মৃত্যুর পর এ-সব বিষয়ে নিজ থেকে কিছুই অবগত হতে পারেন না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ ۞يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَآ أُجِبْتُمْۖ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآۖ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّٰمُ ٱلْغُيُوبِ ١٠٩ ﴾ [المائدة: ١٠٩]

"যেদিন আল্লাহ সকল রাসূলদেরকে একত্রিত করবেন তখন তিনি তাঁদেরকে বলবেন:তোমরা (তোমাদের পরবর্তী উম্মতদের

---

372. নু'মান ইবন মুহমূদ, প্রাগুক্ত;পৃ. ২৭-২৮।

পক্ষ থেকে) কী উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন: (এ ব্যাপারে) আমাদের কোনই জ্ঞান নেই, আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহা জ্ঞানী"।[৩৭৩] রাসূলগণ মরে যাওয়ার পর মোট দু'টি মাধ্যমে তাঁদের জ্ঞান আহরণের সম্ভাবনা থাকতে পারে:

এক.মৃত্যুর পরেও হয়তো তাঁরা জীবিত থাকার ন্যায় নানাভাবে জ্ঞান আহরণ করে থাকবেন এবং সে অনুযায়ী কারা তাঁদের অনুসরণ করলো আর কারা করলো না, তা তাঁরা জেনে থাকতে পারেন।

দুই.নতুবা মৃত্যুর পর আল্লাহ তা'আলা নিজ থেকে তাদেরকে শ্রবণ করার ও জানার এমন কোনো অতিরিক্ত যোগ্যতা দিয়ে থাকবেন, যার মাধ্যমে তাঁরা মরে গিয়ে থাকলেও দুনিয়ায় কে কী করলো, তা শুনে ও জেনে থাকবেন।

কিন্তু এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলগণ মরে যাওয়ার পর জ্ঞান আহরণের উপর্যুক্ত দু সম্ভাবনার কোনো সম্ভাবনা দিয়েই তাঁরা কোনো জ্ঞান আহরণ করতে পারেন না। জীবিত মানুষেরা কী করে, তাঁরা এর কোনো কিছুই অবগত হতে পারেন না। যদি পারতেন, তা হলে তাঁরা তাঁদের পরবর্তী উম্মতদের অনুসরণের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন। তাঁদেরকে

---

[373]. আল-কুরআন, সূরা মা-ইদাহ :১০৯।

সাহায্যের জন্য আহ্বান করে যারা শির্ক করেছে, আখেরাতে তাঁরা আল্লাহর প্রশ্নের জবাবে সে-সব লোকদের কর্মের অবস্থা বর্ণনা করতেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা এ-সব কিছুই অবগত হতে পারেন না, সে-জন্যে তাঁরা সেদিন বলবেন, প্রভু ! এ-সবতো অদৃশ্যের ব্যাপার। কাজেই তা কেবল আপনারই জানার কথা। আমাদের পক্ষে তা জানার বা শুনার কোনই উপায় নেই। রাসূলগণ যদি মৃত্যুর পর তাঁদের উম্মতদের কর্ম সম্পর্কে কিছুই শুনতে ও জানতে না পারেন, তা হলে অবশিষ্ট ওলি ও সাধারণ মানুষেরা যে কিছুই শুনতে ও জানতে পারবে না, তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

দেহে প্রাণ থাকলেই কেবল সকল জীব শ্রবণ করতে পারে

উপর্যুক্ত আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয় যে, মানুষসহ সকল জীবের দেহের সাথে যতক্ষণ তাদের রূহের স্বাভাবিক সম্পর্ক থাকে, ততক্ষণ তাদের দেহ জীবিত থাকে এবং ততক্ষণ পর্যন্তই সকল জীব শুনতে পারে। অন্যথায় নয়। দেহ মরে যাওয়ার পর রূহ মরে না গেলেও রূহের শ্রবণ করার মত নিজস্ব কোনো যোগ্যতা অবশিষ্ট থাকে না। আর সে-জন্যই রাসূলগণ আখেরাতে উপর্যুক্ত জবাব দেবেন। পক্ষান্তরে মুশরিকরা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে যে সকল ফেরেশ্তাদের উপাসনা করতো তারা জীবিত থাকার কারণে তাদেরকে কেন্দ্র করে মুশরিকরা যা কিছু করতো আখেরাতে তারা আল্লাহ তা'আলার এ জাতীয় প্রশ্নের জবাবে

রাসূলগণের ন্যায় জবাব না দিয়ে বলবেন:ওরা আমাদের উপাসনা করেনি, ওরা বরং জিনের তথা শয়তানের উপাসনা করতো। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন:

﴿ وَيَوۡمَ يَحۡشُرُهُمۡ جَمِيعٗا ثُمَّ يَقُولُ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ أَهَٰٓؤُلَآءِ إِيَّاكُمۡ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ۝٤٠ قَالُواْ سُبۡحَٰنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمۖ بَلۡ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٱلۡجِنَّۖ أَكۡثَرُهُم بِهِم مُّؤۡمِنُونَ ۝٤١ ﴾ [سبا: ٤٠، ٤١]

"আর যেদিন তিনি সবাইকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফেরেশ্তাদের বলবেন: এরা কি তোমাদেরই উপাসনা করতো? তারা বলবে:আপনি পূত পবিত্র, আপনিই আমাদের অভিভাবক, ওরা নয়। বরং তারা জিনেরই উপাসনা করতো এবং তাদের অধিকাংশরাই এদের উপর ঈমান আনয়ন করতো।"[৩৭৪] এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মুশরিকরা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে যে ফেরেশ্তাদেরকে কেন্দ্র করে শির্ক কর্ম করতো, সে ফেরেশ্তারা জীবিত থাকায় তারা সে সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। আর সে-জন্যই আল্লাহর উপর্যুক্ত প্রশ্নের জবাবে রাসূলগণের ন্যায় তাদের অজ্ঞতার কথা না বলে তাঁরা বলবেন:ওরা আমাদের উপাসনা করেনি, বরং তারা জিন তথা শয়তানের উপাসনা করেছে।

---

[374]. আল-কুরআন, সূরা সাবা :৪১।

অনুরূপভাবে দেখা যায় আল্লাহ তা'আলা আখেরাতে যখন ঈসা ﷺ কে খ্রিস্টানদের ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, তখন তিনিও সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকার কারণে বলবেন:

﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ ۖ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ۚ﴾ [المائدة: ١١٧]

"আপনি আমাকে যা বলতে আদেশ করেছিলেন আমি তাদেরকে কেবল তাই বলেছি যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো, যিনি আমার ও তোমাদের পালনকর্তা, আমি যতদিন তাদের মাঝে ছিলাম, ততদিন তাদের সম্পর্কে অবগত ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে লোকান্তরিত করলেন, তখন থেকে আপনিই তাদের সম্পর্কে অবগত রয়েছেন..."।[৩৭৫] ঈসা আলাইহিস সালামের উক্ত জবাব থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ দুনিয়াবী পরিবেশে জীবিত না থাকলে কারো পক্ষে এ দুনিয়ার মানুষেরা কি করছে, তা নিজ থেকে জানার বা শ্রবণ করার কোনই উপায় নেই।

অনুরূপভাবে দেখা যায়, আরবের মুশরিকরা ওয়াদ, সুয়া', ইয়াগুছ ও অন্যান্য যে-সব মূর্তিসমূহকে সাহায্যের জন্য আহ্বান করতো, সে-সব মূর্তিসমূহের সবাই তাদের আহ্বান না শুনলেও

[375]. আল-কুরআন, সূরা মা-ইদাঃ: ১১৮।

অন্তত ওয়াদ, সুয়া'...ইত্যাদি মূর্তিগুলো সৎ মানুষদেরকে কেন্দ্র করে তৈরী হওয়ার কারণে তাঁদের পক্ষে তা শ্রবণ করার কথা। কিন্তু আল্লাহর কথানুযায়ী প্রমাণিত হয় যে, তারাও মুশরিকদের সে-সব আহ্বান সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর রয়েছেন।

যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥٓ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ وَهُمْ عَن دُعَآئِهِمْ غَٰفِلُونَ ۝٥ ﴾ [الاحقاف: ٥]

"যে ব্যক্তি আল্লাহকে ব্যতীত এমন কাউকে আহ্বান করে যে কেয়ামত পর্যন্ত তার আহবানে সাড়া দেবে না, সে ব্যক্তির চেয়ে পথভ্রষ্ট আর কে হতে পারে ? তাঁরা তো তাদের আহ্বান সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর।"[৩৭৬] উক্ত এ-সব আয়াতসমূহ দ্বারা এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, কোনো মানুষ মরে যাওয়া বা ইন্তেকাল করার পর- তিনি কোনো ওলি হোন আর না-ই হোন না কেন- তিনি নিজ থেকে জীবিতদের কর্মকাণ্ডের কোনো খোঁজ-খবর রাখতে পারেন না। আল্লাহ যদি কাফের ও মু'মিন নির্বিশেষে তাদেরকে বিশেষ কোনো মুহূর্তে কিছু শুনাতে চান, কেবল তা ব্যতীত তারা নিজ থেকে কারো কোনো কথা বা আহ্বান শ্রবণ করতে পারেন না।

---

376. আল-কুরআন, সূরা আহক্বাফ :৫-৬।

মৃতদের বিশেষ মুহূর্তে শ্রবণ :

মৃতরা নিজ থেকে কিছুই শ্রবণ করতে পারে না, এটি হচ্ছে কুরআনের মূল কথা। তবে হাদীস দ্বারা বিশেষ একটি সময়ে তাদের শ্রবণের কথা প্রমাণিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«إِنَّ الْمَيِّتَ إِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِه إِنَّه لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ إِذَا انْصَرَفُوْا»

"মৃত ব্যক্তিকে যখন কবরে রাখা হয় তখন তাকে দাফনকারীরা ফিরে যাওয়ার সময় সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়"।[৩৭৭]

আল্লামা ইবনে আবিদীন এ হাদীস প্রসঙ্গে বলেন:"এ হাদীসে মৃতের শ্রবণের বিষয়টি মৃত ব্যক্তির কবরে রাখার সময়ে সওয়াল-জাওয়াবের প্রারম্ভে^র সাথে সংশ্লিষ্ট। তাই এ হাদীসের সাথে কুরআনের কোনো সংঘর্ষ নেই"।[৩৭৮]

শায়খ আলবানী বলেন:"এ হাদীসটি মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা এবং তাকে প্রশ্ন করার জন্য ফেরেশ্তাদের আগমনের সময়ের

---

[377].মুসলিম, প্রাগুক্ত; (কিতাবুল জান্নাতি..., বাব নং ১৭, হাদীস নং ২৮৭০), ৪/২২০১;মুহাম্মদ ইবনে হিববান আল-বুস্তী, সহীহ ইবনে হিববান; (বৈরুত: মুআছছাছাতুর রিছালাঃ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.), ৭/৪৪২।

[378]. ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত; ৩/১৮০।

সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং মৃতের শ্রবণের ক্ষেত্রে এ হাদীসকে সাধারণ অর্থে গ্রহণের কোনো উপায় নেই''।[৩৭৯]

আল্লামা নু'মান ইবন মাহমূদ আলূসী এ প্রসঙ্গে হানাফী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেমদের উক্তিসমূহ মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকহ গ্রন্থসমূহ থেকে উদ্ধৃত করার পর বলেন:

''ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহ.) এবং মাযহাবের অন্যান্য মনীষীদের ফতোয়া দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রূহ বের হয়ে যাওয়ার পর মৃত ব্যক্তি শ্রবণ করে না, যেমনটি মত প্রকাশ করেছেন উম্মুল মু'মিনীন আয়শা রাদিয়াল্লাহু আনহা। হানাফীগণ মাযহাবের কোনো আলেমদের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো প্রকার মতবিরোধের বর্ণনা করেন নি...''।[৩৮০]

এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন:''মৃত ব্যক্তির শ্রবণ না করার ব্যাপারে হানাফী ও তাদের মতের সমর্থনকারীদের বক্তব্যকে এ বিষয়টিও সমর্থন করে যে, মৃত ব্যক্তি যদি সাধারণভাবেই শ্রবণ করে থাকবে, 'তা হলে তাকে প্রশ্ন করার সময় তার নিকট রূহ ফিরে আসা, অতঃপর তা চলে যাওয়া' এ মর্মে হাদীস বর্ণিত হতো না''।[৩৮১]

---

379. নু'মান ইবনে মাহমূদ আল-আলূসী, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫১।

380. তদেব; পৃ. ১৯।

381. তদেব;৩৫।

অতঃপর মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা সম্পর্কে তিনি বলেন:

"والعجب من بعض من لا فهم له من ينتسب إلى مذهب الإمام إبي حنيفة يشيع عند العوام أن السماع مجمع عليه، و أنه أيضا مذهب ذلك الإمام الأعظم و أصحابه ممن أخر و تقدم، و لم يعلم أن الحنفية قد تمسكوا كعائشة و غيرها بالآيتين ، وأولوا ما ورد بعد معرفتهم الحديثين".

"ইমাম আবু হানীফা (রহ.) এর মাযহাবের অনুসারী বলে দাবীদার কিছু অজ্ঞ লোকদের ব্যাপারে আশ্চর্য হতে হয় যে, তারা জনগণের মাঝে এ তথ্য প্রচার করে যে, মৃতদের শ্রবণের বিষয়টি নাকি বিজ্ঞজনদের ঐকমত্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং এটাই নাকি ইমাম আবু হানীফা ও তাঁর অগ্র-পশ্চাতের অনুসারীগণের মাযহাব। অথচ তারা জানতেও পারেনি যে, হানাফীগণ এ বিষয়ে আয়েশা (রা.) ও অন্যান্যদের ন্যায়

﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُسۡمِعٖ مَّن فِي ٱلۡقُبُورِ ﴾ [فاطر: ٢٢] এবং

﴿ إِنَّكَ لَا تُسۡمِعُ ٱلۡمَوۡتَىٰ﴾ [النمل: ٨٠] এ আয়াত দু'টি গ্রহণ করেছেন এবং মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত হাদীস দু'টি অবগতির পর (যার একটি উপরে বর্ণিত হয়েছে এবং অপরটি নিম্নে বর্ণিত হবে) এ-দু'টির তা'বীল করেছেন"।[৩৮২]

---

382. তদেব।

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কিত দ্বিতীয় হাদীস:

মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে সামান্য একটু সম্ভাবনা প্রমাণিত হয় নিম্নে বর্ণিত হাদীস থেকে। বদরের যুদ্ধের পরে মুশরিকদের লাশগুলো যখন নিকটস্থ একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়, তখন সেখান থেকে প্রস্থানের পূর্ব মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-সে কূপের নিকটে যেয়ে মুশরিকদের লাশগুলোকে সম্বোধন করে কিছু কথা বলেন। তা দেখে ‘উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

«يَا رَسُوْلَ اللهِ!مَا تُكَلِّمُ مِنْ أَجْسَادٍ لاَ رُوْحَ فِيْهَا؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا أَقُوْلُ مِنْهُمْ»

“হে আল্লাহর রাসূল! রূহ বিহীন লাশের সাথে আপনি কথা বলছেন ? রাসুলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন: যাঁর হাতের মধ্যে মুহাম্মদের আত্মা তাঁর শপথ করে বলছি: আমি তাদের লক্ষ্য করে যা বলেছি তা তাদের চেয়ে তোমরা বেশী শ্রবণ করোনি”।[৩৮৩] এ হাদীস দ্বারা কোনো কোন মনীষী মৃতদের শ্রবণের কথা প্রমাণ করতে চান। তবে অধিকাংশ বিদ্বানদের মতে এ হাদীস দ্বারা তা আদৌ প্রমাণ করা যায়না। পাঠকদের সুবিধার্থে

---

383. বুখারী, প্রগুক্ত; (কিতাবুল মাগাযী, বাব নং ৩, হাদীস নং ৩৭৫৬), ৩/৩/১৮৫-১৮৬।

এ হাদীস সম্পর্কে প্রখ্যাত মনীষীগণ কী বলেছেন, তা নিম্নে বর্ণনা করা হল:

এ হাদীস সম্পর্কে বিভিন্ন মনীষীদের মতামত:

□ মৃতদের শ্রবণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আল্লামা নু'মান ইবনে মাহমূদ আল-আলূসী বলেন:

" لم أر فيها من صرح بأن الميت يسمع سماعا مطلقا عاما، كما كان شأنه في حياته ، و لا أظن عالما يقول به ، و إنما رأيت بعضهم يستدل بأدلة يثبت بها سماعا في الجملة."

“আমি এ বিষয়ে কোনো আলেমকে এ-কথা সুস্পষ্টভাবে বলতে দেখিনি যে, মৃত মানুষেরা দুনিয়ায় জীবিত থাকার ন্যায় মৃত্যুর পরেও সাধারণভাবে শ্রবণ করতে পারেন। কোনো জ্ঞানী এ ধরনের কথা বলতে পারেন বলেও আমি মনে করি না। আমি তাদের কাউকে কোনো কোন দলীল দ্বারা মৃতদের মোটের উপর কিছু শ্রবণের কথা প্রমাণ করতে দেখেছি”।[৩৮৪]

---

[384].আল-আলূসী, নু'মান ইবন মাহমুদ, আল-আ-য়াত আল-বায়্যিনাত ফী আদামি সেমাইল আমওয়াত আলা মাজহাবিল হানাফিয়্যাতিত সা-দাত; সম্পাদনা: আল্লামা নাসিরুদ্দীন আলবানী, (হালব: মাত্বাবা'আতু অফিসত, ২য় সংস্করণ, ১৩৯৯হি:), পৃ.৫১।

□ উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এ হাদীসটি কুরআনুল কারীমে বর্ণিত{ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِيْ الْقُبُوْرِ} "কবরবাসীদেরকে তুমি শুনাতে পারবে না"[৩৮৫] এ আয়াতের মর্মের বিপরীত হওয়ায় তিনি এ হাদীসটি অগ্রাহ্য করেছেন।[৩৮৬]

□ এ হাদীসকে কুরআনের উক্ত আয়াতের সাথে সাংঘর্ষিক মনে না করলেও এ হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করা যায়না। কেননা, রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এ উক্তিটি আসলে কাফেরদেরকে উপদেশ প্রদানের জন্য বলেছিলেন, তাদের বুঝাবার জন্য বলেন নি।[৩৮৭]

□ আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-মিশরী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:এটি ছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি মু'জিযা বিশেষ।[৩৮৮] যা অন্য কোনো মৃতদের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

---

[385]. আল-কুরআন, সূরা ফাত্বির: ২২।

[386]. আল-আলূসী, নু'মান ইবন মাহমূদ, প্রাগুক্ত; পৃ.৫১।

[387]. তদেব; প্র. ৯।

[388]. তদেব;পৃ. ৮।

□ বিশিষ্ট তাবেঈ ক্বাতাদাঃ (রহ.) উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন:

[أَحْيَاهُمُ اللهُ حَتَّى أَسْمَعَهُمْ قَوْلَه تَوْبِيْخًا وَتَصْغِيْرًا وَنِقْمَةً وَحَسْرَةً]

□ "আল্লাহ তা'আলা কাফেরদেরকে ধমকি প্রদান ও হেয় প্রতিপন্ন করা এবং বদলা গ্রহণ ও হতাশাগ্রস্ত করানোর জন্যে জীবিত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শ্রবণ করিয়েছিলেন।"[৩৮৯]

□ ইমাম কুরত্ববী উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন: "কাফেরদের শ্রবণ করানোর ব্যাপারটি সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। আল্লাহ তা'আলা তাদের অনুভূতি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, যার কারণে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কথা শ্রবণ করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের শ্রবণ করার কথা আমাদেরকে না বললে তাঁর এ-কথাগুলোকে আমরা অবশিষ্ট কাফেরদের জন্য ধমকি স্বরূপ এবং মু'মিনদের মনের প্রশান্তি স্বরূপ বলার অর্থে গ্রহণ করতাম"।[৩৯০]

---

[389]. তদেব;পৃ. ৬; আহমদ, প্রাগুক্ত; ৪/২৯।

[390]. আল-ক্বুরত্ববী, প্রাগুক্ত;১৩/৩৩২।

- আল্লামা ইবনে আবিদীন বলেন: "এ শ্রবণ করার বিষয়টি কাফেরদের আফসোসকে বৃদ্ধি করার জন্য তাদের সাথেই বিশেষভাবে সম্পর্কিত ছিল এবং এটি ছিল রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জন্য একটি বিশেষ মু'জিজা"।[৩৯১]
- এ প্রসঙ্গে শায়খ আলবানী বলেন:"এ ঘটনার বর্ণনায় ইবনে 'উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত অপর একটি হাদীস রয়েছে, তাতে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-বলেন:

«هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ ثُمَّ قَالَ:إِنَّهُمْ اَلآنَ يَسْمَعُوْنَ مَا أَقُوْلُ»

"তোমাদের রব যে ওয়াদা করেছিলেন তোমরা কি তা সঠিকভাবে পেয়েছ? অতঃপর রাসূলুল্লাহﷺ বলেন:নিশ্চয় (কাফেররা) এখন আমি যা বলছি তারা তা শ্রবণ করছে"।[৩৯২] অর্থাৎ তাদেরকে সম্বোধন করার সময় তারা তা শুনছিল। মৃতরা সব সময় শুনতে পায়, সে-জন্যই তারা তা শুনতে পেয়েছে, বিষয়টি এমনটি নয়।

---

391 . নু'মান ইবন আলূসী, প্রাগুক্ত;পৃ.১০।

392. ইবনে হাজার, ফাতহুলবারী; ২/২৪২।

- মাহমূদ আলূসী বলেন:“ এ হাদীসে এ-কথার শক্তিশালী ইঙ্গিত রয়েছে যে, মৃতরা শ্রবণ করেন না”।[৩৯৩]
- ইমাম ইবনুত তীন বলেন:“ ইবনে ‘উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস এবং {إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ} এ আয়াতের মধ্যে আসলে কোনো বৈপরিত্ব নেই। কেননা, মৃতরা শ্রবণ করেন না, এ-কথায় কোনই সন্দেহ নেই, তবে যাদের শ্রবণ করার কথা নয়, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদেরকে শ্রবণ করাতে পারেন”।[৩৯৪]

কুরআন, হাদীস ও মনীষীদের মতামতের আলোকে এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, মৃত মানুষ সে যে-ই হোক কেন, জীবিতদের কথা ও কর্ম সম্পর্কে তাদের কিছু শুনা ও জানার নিজস্ব কোনো যোগ্যতা নেই। আল্লাহ তা‘আলা বিশেষ ব্যবস্থায় তাদেরকে কিছু শুনাতে চাইলে তারা কেবল তা-ই শুনতে পারেন। সে বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমেই তাদেরকে কেউ সালাম করলে বা তাদের মাগফেরাতের জন্য কেউ দো‘আ করলে তাদেরকে তা অবগত করানো হয়। কিন্তু তাদের কবরকে কেন্দ্র করে এর বাইরে শরী‘আত বিরোধী যে-সব শির্কী কাজকর্ম হয়, সে সম্পর্কে আল্লাহ

---

[393]. মাহমূদ আলূসী, প্রাগুক্ত; ৬/৪৫৫।

[394]. ইবনে হাজার , ফাতহুলবারী;৩/১৪২।

তা‘আলা তাদেরকে জানানো বা শ্রবণ করানোর কোনো ব্যবস্থা করেননি, তারা নিজ থেকেও তা জানতে বা শ্রবণ করতে পারেন না। তারা যদি তা জানতে পারতেন এবং জীবিতদেরকে কোনো উপদেশ দেবার মত কোনো মাধ্যম তাদের কাছে থাকতো, তা হলে অলিগণের কবরকে কেন্দ্র করে যে-সব শির্কী কর্ম করা হয়, তা পরিত্যাগ করার জন্য তারা সাধারণ জনগণকে উপদেশ দিতেন। কিন্তু এ-সবই তাদের নাগালের বাইরে থাকার কারণে যুগ যুগ ধরে অলিগণের কবর ও কবরকে কেন্দ্র করে অহরহ শির্কী কর্মকাণ্ড হয়েই চলেছে। যেহেতু এ-সব কর্ম শয়তানের প্ররোচনায়ই সেখানে হয়ে চলেছে, তাই মানুষেরা যাতে সর্বদা তা করে যায়, সে-জন্য শয়তান নিজেই অলিগণের কবরে নিরাপদ আস্তানা গেড়ে বসে রয়েছে। নানা উপায়ে সেখানে সে তার বিভিন্ন তেলেশমাতি প্রকাশ করে চলেছে। আর ধর্মীয় জ্ঞানে মিসকীন সাধারণ মানুষ তা দেখে ভাবছে-এ-সব কবরস্থ অলিরই কারামত ও ফয়েয। সাধারণ মানুষ এবং আল্লাহর মাঝে তাঁরা ওসীলা হওয়ার কারণেই কবরে থেকেও তাঁরা এভাবে সাধারণ মানুষের উপকার করে চলেছেন! والعياذ بالله.

উপসংহার:

দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে মানুষ তাদের চিরশত্রু শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে যে-সব অপরাধে লিপ্ত হয় তন্মধ্যে মারাত্মক অপরাধ হচ্ছে শির্ক। এর ফলে একজন মুসলিম তার অজান্তেই ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাতসহ অন্যান্য কোনো সৎকর্মেরই কোনো মূল্য থাকে না। আখেরাতে সে তার সাহায্যকারী ও শাফা'আতকারী বলতেও কাউকে পাবেনা। আল্লাহ তা'আলার প্রতি বিশ্বাসীদেরকে শির্কের এ-ভয়াবহ পরিণতির কথা বুঝানোর জন্যে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

﴿ لَئِنۡ أَشۡرَكۡتَ لَيَحۡبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ﴾ [الزمر: ٦٥]

"তুমি যদি শির্ক কর, তা হলে তোমার 'আমল নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্থদের অমত্মর্ভুক্ত হয়ে যাবে"।[৩৯৫] রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-থেকে কোনো শির্ক সংঘটিত না হওয়া সত্ত্বেও এবং তিনি আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়ভাজন

---

395 . আল-কুরআন, সূরা যুমার: ৬৫।

বান্দা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এ-ভাবে অনেকটা ধমকের সুরে সম্বোধন করে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ-কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে- তাঁর উম্মতদেরকে এ-কথা সুস্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেয়া যে, এ-অপরাধ যার দ্বারাই সংঘটিত হবে, সে ব্যক্তি বাহ্যত তার নিজের ও আমাদের ধারণায় যত উঁচু দরেরই মু'মিন বলে গণ্য হয়ে থাকুন না কেন-আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা তার যাবতীয় সৎকর্ম নিষ্ফল করে দেবেন এবং সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থদের অমত্মর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

এ-আয়াত দ্বারা এ-কথা সহজেই অনুমিত হয় যে, বিশুদ্ধ ঈমান তথা শির্কমুক্ত 'আক্বীদা ও বিশ্বাসই হচ্ছে আখেরাতে সৎ কর্মের প্রতিদান প্রাপ্তির পূর্বশর্ত। সে-জন্য কুরআনুল কারীমে শির্কমুক্ত বিশুদ্ধ ঈমানকে এমন একটি গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে যার শিকড় প্রোথিত রয়েছে মাটির অনেক গভীরে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর কোনো ক্ষতি করতে পারে না বলে সর্বদা যেমনি তা পত্র-পল্লব আর ফুলে-ফলে সুশোভিত থাকে, শির্কমুক্ত বিশুদ্ধ ঈমানের অধিকারীর ঈমানও তেমনি আখেরাতে 'আমলের

পত্র-পল্লব ও ফুলে-ফলে সুশোভিত থাকবে।[৩৯৬] কোনো মুশরিকের নয়।

তবে দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, এ শির্কের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ হওয়া সত্ত্বেও মানব জাতির ইতিহাস এ অপরাধের দ্বারা পরিপূর্ণ।

শির্ক কি ও কেন? এ সম্পর্কে সুদীর্ঘ গবেষণা ও পর্যালোচনা করে কুরআন, হাদীস ও মুসলিম মনীষীদের মতামত যাচাই ও পর্যালোচনার করে আমি যে-সব তথ্যে উপনীত হয়েছি, সংক্ষেপে এর সারকথা নিম্নরূপ:

- আল্লাহ তা'আলার অনেক সুন্দর নামাবলী ও সুমহান গুণাবলী রয়েছে। যেমনিভাবে তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার কেউ তাঁর সত্তার সমকক্ষ হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে তাঁর সে-সব নামাবলী ও গুণাবলীর যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাতেও তাঁর সৃষ্টির মধ্যকার কেউ তাঁর সমকক্ষ হতে পারে না। তিনি তাঁর সে-সব নামাবলী ও গুণাবলীর কারণেই আমাদের ও সমগ্র জাহানের একক রব বা প্রতিপালক। তিনি

---

396. আয়াতটি নিম্নরূপ:

﴿ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [ابراهيم: ٢٤]

আল-কুরআন, সূরা ইবরাহীম: ২৪।

সবকিছুর প্রতিপালক হওয়ার কারণে সবকিছুর উপাস্যও এককভাবে তিনিই। কেননা, যিনি প্রতিপালক হবেন তিনি ব্যতীত আর কেউ উপাস্য হতে পারে না। আর আল্লাহই যখন আমাদের প্রতিপালক, তাই তিনি ব্যতীত আমাদের অপর কোনো উপাস্য বা ইলাহ নেই। তাঁর রুবূবিয়্যাতে যেমন কেউ তাঁর শরীক হতে পারে না, তেমনি তাঁর উলূহিয়্যাতেও কেউ তাঁর শরীক হতে পারে না।

- আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করতে হয় তাঁর সম্মান ও তা'যীম করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে। সে-জন্যে তিনি আমাদের দেহ, অমত্মর ও সম্পদের উপর নির্দিষ্ট প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কিছু উপাসনা ধার্য করে দিয়েছেন। এ-গুলো নিবেদিত হবে কেবল তাঁকে কেন্দ্র করেই। কোনো নবী-রাসূল, সৎ মানুষ ও অন্যান্য কোনো বস্তুর সম্মান, তা'যীম ও সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে তা প্রযোজ্য হতে পারেনা।

- আমাদের উপর আল্লাহ তা'আলার পরে নবী-রাসূল ও সৎ মানুষদের সম্মান পাওয়ার বৈধ অধিকার রয়েছে। তবে আল্লাহর সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য তাঁর উপাসনা হওয়ায় এবং তাঁদের সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্য তাঁদের একরাম করা হওয়ায় উভয়ের সম্মান প্রদর্শিত হওয়ার ধরন ও পদ্ধতি

সম্পূর্ণ পৃথক। যুগে যুগে মানুষেরা নবী-রাসূল ও সৎ মানুষদের সম্মান প্রদর্শনের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করার কারণেই তাঁদের একরাম করতে গিয়ে তারা তাঁদের উপাসনায় লিপ্ত হয়ে আল্লাহর উলূহিয়্যাতে শির্কে লিপ্ত হয়েছে।

- আল্লাহকে আমার রব বলে স্বীকৃতি দেয়ার অর্থ হচ্ছে:তাঁকে নিজের জীবন, জীবিকা, ভাগ্যের ভাল-মন্দ, যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের একচ্ছত্র মালিক ও পরিচালক বলে বিশ্বাস করা। এ-সব ক্ষেত্রে তাঁর কোনো শরীক বা সাহায্যকারী থাকার চিন্তা করাতো দূরের কথা, তা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বস্তুর প্রভাব বা নবী বা অলিগণের সুপারিশকারী থাকার চিন্তা করাও উপর্যুক্ত বিশ্বাসের পরিপন্থী। যুগে যুগে মানুষের অমত্মরে এ-জাতীয় বিশ্বাস লালিত হওয়ার কারণেই তারা তাঁর রুবূবিয়্যাতে শির্কে লিপ্ত হয়েছে।

- আদম (আ.) কে সৃষ্টির পর এক হাজার বছর পর্যন্ত তাঁর সমত্মানেরা তাওহীদের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। অতঃপর তারা আদম (আ.)এর কবরকে সম্মান করার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করতে যেতে সর্বপ্রথম আল্লাহর উলূহিয়্যাতে শির্কে লিপ্ত হয়। এরপর আদম সমত্মানদের মধ্যকার পাঁচজন সৎ

মানুষকে কেন্দ্র করে তাঁদের অনুসারীরা আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতে শির্কে লিপ্ত হয়।

□ আল্লাহর রুবূবিয়্যাত ও উলূহিয়্যাতে গায়রুল্লাহের সমকক্ষতা বা শির্ক মানুষের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের মধ্য দিয়ে হয়ে থাকে। মানুষের বিশ্বাসের মধ্যে যে-সব শির্ক হয়, তা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত। আর কর্মের মধ্যে যে-সব শির্ক হয়, তা আল্লাহর উলূহিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত। আর অভ্যাস যেহেতু সাধারণত বিশ্বাসগত কারণেই গড়ে উঠে, সেহেতু অভ্যাসগত কর্মের দ্বারা যে-সব শির্ক হয়, তাও আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের সাথে সম্পর্কিত।

□ শির্কের দু'টি প্রকার রয়েছে। একটি 'আকবার' আর অপরটি 'আসগার'। শির্কে আকবার আবার চার প্রকার। জ্ঞানগত শির্ক, পরিচালনাগত শির্ক, অভ্যাসগত শির্ক ও উপাসনাগত শির্ক। যারা প্রথম তিন প্রকারের শির্ক করে, তারা আল্লাহর রুবূবিয়্যাতে শির্ক করে। আর যারা শেষ প্রকারের শির্ক করে তারা আল্লাহর উলূহিয়্যাতে শির্ক করে।

□ কেউ যদি অজ্ঞতাবশত একটি শির্কে আকবার করে এবং মুত্যুর পূর্বে তাথেকে তাওবা করে মরতে না পারে, তা হলে মুশরিক হিসেবেই তার হাশর হবে। আর কারো দ্বারা যদি

‘শির্ক আসগার’ সংঘটিত হয়, তা হলে সে মুশরিক বলে বিবেচিত হবে না;তবে তার প্রতিটি ‘শির্কে আসগার’ একেকটি কবীরা গোনাহ হিসেবে বিবেচিত হবে। এথেকে তাওবা করে মরতে না পারলে আল্লাহ তা‘আলা ইচ্ছা করলে তাকে রাসূলুল্লাহ -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শাফা‘আতের মাধ্যমে ক্ষমা করতে পারেন, নতুবা সাময়িক শাসিত্মতে নিমজ্জিত করবেন।

- আল্লাহর উলূহিয়্যাত ও রুবূবিয়্যাতে শির্ক সংঘটিত হওয়ার জন্য মানুষের অজ্ঞতা ও শয়তানের বহুমুখী ষড়যন্ত্রই মৌলিকভাবে দায়ী।

- ধর্মপ্রাণ ইয়াহূদী ও খ্রিস্টানদেরকে তাদের অজ্ঞতার সুযোগে বিভিন্ন নবী ও সৎ মানুষদের মর্যাদা দানের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত করানোর মাধ্যমে শয়তান তাদের কবরসমূহকে উপাসনালয়ে রূপামত্মরিত করেছিল। তাঁদের সম্মানার্থে তাঁদের মূর্তি বানিয়ে তাদেরকে সে-সব মূর্তির উপাসনা করতে লিপ্ত করেছিল। যা বর্তমানেও তাদের মাঝে যথারীতি প্রচলিত রয়েছে।

- শয়তান নূহ আলাইহিস সালামের জাতির লোকদেরকে যে-সব শির্কী ধারণার ভিত্তিতে শির্কী কর্মে অভ্যস্থ করেছিল,

ঠিক সে-রকমের শির্কী ধারণার ভিত্তিতেই আরবের দ্বীনে ইব্রাহীমের অনুসারী বলে দাবীদারদেরকেও সে পাঁচজন ওলির মূর্তিসহ আরো বিভিন্ন মূর্তির উপাসনা করতে অভ্যস্ত করেছিল। ফেরেশ্তাদেরকে আল্লাহর মেয়ে হওয়ার ভ্রামত্ম ধারণা দিয়ে তাদের নামে লাত, উয্যা ও মানাত নামের দেবী বানিয়ে সে-গুলোকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়ার মাধ্যম ও তাঁর নিকট সুপারিশকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করেছিল। সে মূর্তিগুলোকে তাদের জীবনের বিবিধ কল্যাণ ও অকল্যাণ করার সামর্থ্যবান বলেও ধারণা দিয়েছিল। আল্লাহর নিকট থেকে পার্থিব কল্যাণ প্রাপ্তি ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য দেব-দেবীদের মধ্যস্থতা ও সুপারিশ পাওয়ার আশায় তাদেরকে সে-গুলোর উদ্দেশ্যে মানত করা, এদের পার্শ্বে অবস্থান করা এবং বিপদে এদের আহ্বান করাসহ মৌখিক, শারীরিক ও আমত্মরিক বিভিন্ন উপাসনায় লিপ্ত করেছিল। এ-ছাড়া তাদের অভ্যাসের মাঝেও নানা রকমের শির্কী কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিল।

 নূহ আলাইহিস সালামের জাতি থেকে আরম্ভ করে শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত দীর্ঘ সময়ের মানুষদেরকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষেত্রে শয়তান যে ধরনের কলা-কৌশল অবলম্বন করেছিল, সে রকমের কলা-

কৌশল অবলম্বন করেই সে সাধারণ মুসলিমদেরকেও পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালিয়েছে। এ-চেষ্টার ফলেই সে তাদেরকে জ্ঞানগত, পরিচালনাগত, অভ্যাসগত ও উপাসনাগত বিভিন্ন রকম শির্কী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

- রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ও ওলিগণ সর্বত্র হাজির ও নাজির হতে পারেন, তাঁরা গায়েব সম্পর্কে শুনতে ও জানতে পারেন এবং মৃত্যুর পরেও মানুষের উপকার করতে পারেন... ইত্যাদি মর্মে যে-সব ধ্যান-ধারণা সাধারণ মুসলিমদের মাঝে প্রচলিত রয়েছে, তা শয়তানের দেয়া শির্কী ধারণা বৈ আর কিছুই নয়। এর মাধ্যমে সে রাসূল-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- ও ওলিগণ কে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর পর্যায়ে উন্নীত করেছে।
- আরবের মুশরিকদের মাঝে নূহ (আ.)-এর সময়কার পাঁচজন ওলি ও তিনজন ফেরেশ্তার নামে নির্মিত মূর্তি ও দেবীসমূহকে সাধারণ মানুষ ও আল্লাহর মাঝে মধ্যস্থতা ও সুপারিশকারী হওয়ার যে ধারণা দিয়েছিল, মুসলিমদের মাঝেও তাদের ওলিদের ব্যাপারে হুবহু সেই ধারণার জন্ম দিতে সক্ষম হয়েছে।

- ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সরাসরি আল্লাহর কাছে আবেদন-নিবেদন না করে আরবের মুশরিকদের ন্যায় তা মৃত অলিগণের ওসীলা ও সুপারিশের মাধ্যমে চাইতে অভ্যস্ত করেছে।
- অলিগণের মধ্যস্থতা ও সুপারিশ প্রাপ্তির মাধ্যমে পার্থিব কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের আশায় তাদেরকে মুশরিকদের ন্যায় অলিগণের কবর ও কবরসমূহে মানত দান, সেখানে অবস্থান করা, রোগমুক্তি কামনা এবং বিপদে সাহায্যের জন্য আহ্বান করাসহ বিভিন্ন রকমের মৌখিক, শারীরিক ও আমত্মরিক উপাসনায় লিপ্ত করেছে।
- ভাগ্যের ভাল ও মন্দের প্রতি যথার্থ ঈমান না এনে সুস্থ জীবন ও উত্তম জীবিকা লাভের জন্য শরী'আত নির্দেশিত বৈধ পন্থায় তদবীর ও কর্ম না করে নানা রকম শির্কী পন্থায় তদবীর ও কর্ম করতে তাদেরকে অভ্যস্ত করে তুলেছে।
- নবী, ওলি ও সাধারণ মানুষ নির্বিশেষে সকল কবরবাসীকে সালাম দিলে আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থাপনায় তারা তা শুনতে পান ও সালামের জবাব দেন। তাদের মাগফিরাতের জন্য দো'আ করলে এবং ছওয়াব রেছানী করলে এতে তাদের রুহ আনন্দিত হয়। তারা আমাদের জন্য নেক দো'আও

করেন। এ-ক্ষেত্রে ওলি আর সাধারণ মানুষ বলে কোনো পার্থক্য নেই। তবে তাদের সে দো‘আ আমাদের কোনো উপকারে আসেনা। কেননা, বিশুদ্ধ হাদীস মতে মানুষ মৃত্যুর পর মানুষের উপকারযোগ্য তাদের যাবতীয় ‘আমল বন্ধ হয়ে যায়। তা ছাড়া বরযখী জীবন কোনো উপকারযোগ্য কর্মের জীবন নয়। কিন্তু শয়তান সাধারণ মানুষদের নিকট অলিগণের বিষয়টি এ সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম বলে ধারণা দিয়েছে। তাঁরা মরে যাওয়ার পরেও জীবিত থাকার ন্যায় আমাদের উপকার করতে পারেন বলে ধারণা দিয়েছে। তাঁদের আহ্বান করলে তাঁরা শুনতে পারেন বলেও ধারণা দিয়েছে। অথচ তাঁদের ব্যাপারে এমন ধারণা করা তাঁদেরকে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের বৈশিষ্ট্যে শরীক করার শামিল।

- শয়তান মুশরিকদের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের সাথে সাধারণ মুসলিমদের অনেক বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাসের বহুলাংশে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে বরং তাদেরকে মুশরিকদেরও অগ্রগামী করতে সামর্থ্য হয়েছে। আরবের মুশরিকরা যেখানে সমুদ্রে মারাত্মক ঝড় ও তুফানের কবলে পতিত হলে বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য তাদের দেবতাদের কথা ভুলে যেয়ে

একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকেই সাহায্যের জন্য আহ্বান করতো; সেখানে অনেক মুসলমাদেরকে অনুরূপ বিপদে আল্লাহর পরিবর্তে সাহায্যের জন্য বদর পীর, বড়পীর আব্দুল কাদির জীলানী ও মঈনুদ্দিন চিশ্তীকে আহ্বান করতে শিখিয়েছে।

- আল্লাহ তা'আলার রুবূবিয়্যাতে শির্ক করা থেকে বাঁচতে হলে জানতে হবে যে, যে-সব নামাবলী ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ আমাদের রব, সে-সব বৈশিষ্ট্যের সামান্যতম কোনো বৈশিষ্ট্যেও তিনি কাউকে তাঁর শরীক করেন না। কেউ নিজ প্রচেষ্টায়ও তাতে তাঁর শরীক হতে পারেনা।

- মানুষের ভাগ্যের যাবতীয় কল্যাণ ও অকল্যাণের বিষয়টি আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের আওতাধীন বিষয়। কোনো মানুষ বা কোনো বস্তুর পক্ষে কারো কোনো উপকার বা অপকার করার নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নেই। আল্লাহর ইচ্ছা হলেই কেবল কোনো মানুষ বা কোনো বস্তু কারো উপকার বা অপকারের ওসীলা বা মাধ্যম হতে পারে। তাই কোনো মানুষ বা কোনো বস্তুর দ্বারা উপকৃত হলে বলতে হবে: আল্লাহর রহমতে অমুক মানুষ বা অমুক বস্তুর মাধ্যমে উপকৃত হয়েছি। কোনো ঔষধ পান করলে বলতে হবে: অমুক ঔষধ পান করার মাধ্যমে আল্লাহর রহমতে উপকার পেয়েছি। এক কথায় যাবতীয় উপকার ও অপকারের

বিষয়কে কোনো মানুষ বা বস্তুর সাথে সম্পর্কিত না করে কেবল আল্লাহ তা'আলার সাথেই সম্পর্কযুক্ত করতে হবে।

□ একমাত্র যমযমের পানি ব্যতীত অন্য কোনো ওলি বা পীর ফকিরের সাথে সংশিলষ্ট কোনো কূপ বা পুকুরের পানি, কবরের পুড়ানো মোম, মাটি ও গাছ ইত্যাদি মানুষের কোনো কল্যাণ করতে পারে বলে বিশ্বাস করা আল্লাহ রুবূবিয়্যাতে শির্কের শামিল।

□ ভাগ্য পরিবর্তন বা রোগ ব্যাধি নিবারণের জন্যে জ্যোতিষ, গণক, জিন সাধক, ফকির ও কবিরাজদের নিকট এরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক কিছু জানে এমন ধারণা নিয়ে যাওয়া এবং তাদের দেয়া পাথরের আংটি, বালা ও তা'বীজ ব্যবহার করা ব্যবহারকারীর মনের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে শির্কে আকবার বা আসগার হতে পারে।

□ সৎ ও অসৎ মানুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই আল্লাহর রহমতের দরজা সর্বদা উন্মুক্ত রয়েছে। মানুষ গায়েব সম্পর্কে জানতে পারেনা বলে কাউকে কোনো সংবাদ দিতে হলে প্রয়োজনে অন্যের ওসীলা গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু মহান আল্লাহ যাবতীয় গায়েব সম্পর্কে জানেন বলে তাঁর কাছে আমাদের যে কোনো সমস্যার কথা জানাতে হলে এ-

জন্যে কোনো নবী, ওলি ও বুজুর্গদের নামের ওসীলা গ্রহণের কোনো বৈধতা স্বীকৃত নয়। কেননা, আমাদের প্রয়োজনের কথা কোনো ওসীলা ছাড়াই সরাসরি তাঁকে জানানো যায়। তবে ওসীলা গ্রহণ করলে তাঁর সুন্দর নামাবলী, ঈমানের রুকুনসমূহের প্রতি ঈমান, যে কোনো সৎকর্ম, জীবিত মানুষের দো‘আ, নিজের অপরাধের স্বীকৃতি ও অসহায়তা বর্ণনার ওসীলা গ্রহণ করতে হবে। কোনো নবী বা ওলির নামের ওসীলায় নয়। কেননা, মানুষেরা পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে এমন ওসীলা মানুষের মধ্যে চলতে পারে। কিন্তু মহান আল্লাহ কারো নাম শুনে প্রভাবিত হন না। তাই কারো নামের ওসীলায় তাঁর নিকট কিছু আবেদন করা যেতে পারেনা। কোনো কোন হাদীস দ্বারা বাহ্যত এমন ওসীলা গ্রহণের বৈধতা প্রমাণিত হয় বলে কারো মনে হলেও বাস্তবে সে-সব হাদীস দ্বারা তা প্রমাণিত হয়না। কেননা, সে-সব হাদীস দ্বারাও প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট সাহাবীদের দো‘আর ওসীলা গ্রহণই মূলত উদ্দেশ্য। তাঁদের নাম ও মর্যাদার ওসীলা গ্রহণ করা সে-সবের উদ্দেশ্য নয়।

- যে-সব বিষয় আল্লাহ ব্যতীত অপর কেউ দিতে পারেনা, তা আল্লাহ ব্যতীত অপর কারো নিকট চাওয়া যায়না। রাসূল -সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- বা ওলিগণ মৃত্যুবরণ

করেছেন বলে তাঁরা দুনিয়ার মানুষের ছোট বা বড় কোনো উপকারই করতে পারেন না। তাই তাঁদের নিকট কিছু চাওয়া যায়না। কেউ তাদের কাছে কিছু আবদার করলেও কুরআনের শিক্ষানুযায়ী তাঁরা সে আবদার শুনতে পারেন না। শুনতে পারলেও তাঁরা এর কোনো জবাব দেবেন না। তাঁদের কাছে কিছু আবদার করা শির্ক হওয়ার কারণে সূরায়ে মরয়ামের ৮২ নং আয়াতের বর্ণানুযায়ী কেয়ামতের দিন তাঁরা তাঁদের আহ্বানকারীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন।

- কোন জীবিত মানুষের দ্বারা কোনো অলৌকিক কর্ম সংঘটিত হলে তিনি যদি শরী'আতের যথার্থ অনুসারী হন, তা হলে তা তার কারামত হিসেবে গণ্য হতে পারে। তবে এটি তাঁকে বিভ্রান্ত করার জন্য তাঁর অজান্তে তাঁর মাধ্যমে প্রকাশিত শয়তানের কোনো তেলেশমাতিও হতে পারে। আর যদি তিনি শরী'আতের অনুসারী না হন, তা হলে তা নিঃসন্দেহে শয়তানের তেলেশমাতি হয়ে থাকবে। বিষয়টি তাঁর কারামত হোক আর না-ই হোক, এ-কারণে তাঁর ব্যাপারে অতিরঞ্জিত চিন্তা করে তাঁকে আল্লাহর রুবূবিয়্যাতের কোনো কোন বৈশিষ্ট্যের অধিকারীর মর্যাদায় উন্নীত করা

যাবেনা। কেননা, ওলিদের ব্যাপারে অতিরঞ্জিত চিমত্মা করেই যুগে যুগে সাধারণ মানুষেরা শির্কে নিমজ্জিত হয়েছে।

□ আল্লাহ তা'আলার উলূহিয়্যাতে শির্ক করা থেকে বাঁচতে হলে বুঝতে হবে যে, যে বস্তু দান করা শয়তানের সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে, তা কোনো মৃত ওলির কবর ও কবরে আবেদনের পর অলৌকিক উপায়ে কেউ পেয়ে থাকলে এটাকে সম্পূর্ণরূপে শয়তানের তেলেশমাতি বলেই বিশ্বাস করতে হবে। কেননা, কবরে আবেদনকারী ও অন্যান্য সাধারণ মানুষদেরকে বিভ্রামত্ম করার জন্য শয়তান অদৃশ্যে থেকে সে নিজেই বা তার অনুসারীদের মাধ্যমে এমন আহ্বানকারীদের প্রয়োজন পূর্ণ করে দেয়। আবেদন পূর্ণ করা যদি শয়তানের সামর্থ্যের মধ্যে না থাকে, তা হলে বুঝতে হবে যে, আল্লাহই নিজ অনুগ্রহে আবেদনকারীর প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করে তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। তাতে কবরস্থ ওলির আদৌ কোনো কেরামতি নেই। কেননা, আমরা জানি যে, আরবের মুশরিকরা তাদের ওলি ও ফেরেশ্তাদের নামে নির্মিত দেবতাদের কাছে বৃষ্টি চাইলে বৃষ্টি হতো। তারা এটিকে তাদের দেবতাদের ওসীলায় পেয়েছে বলেও বিশ্বাস করতো। অথচ এ বৃষ্টি আল্লাহর রহমতেই বর্ষিত হতো। এর পিছনে যেমনি তাদের দেব-

দেবীদের আদৌ কোনো হাত ছিল না, তেমনি কবরে আবেদনকারীদের প্রয়োজন পূরণের পিছনেও কবরস্থ ওলির আদৌ কোনো হাত নেই।

- মানুষের ঈমান ও ধৈর্যের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য আল্লাহ তাদের ভাগ্যে কল্যাণ ও অকল্যাণ দিয়ে দীর্ঘ বা স্বল্প মেয়াদী পরীক্ষা গ্রহণ করে থাকেন। পরীক্ষা শেষে ইচ্ছা হলে তিনিই তা পরিবর্তন করেন। তাই কোনো কল্যাণার্জন বা অকল্যাণ দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত বৈধ পন্থা অবলম্বন করতে হবে। ওসীলার নামে এদিক-সেদিক মুখ না ফিরিয়ে ভয় ও আকাঙ্ক্ষার সাথে কেবল আল্লাহকেই বিনয়ের সাথে স্মরণ ও আহ্বান করতে হবে। উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গৃহীত পন্থার উপর নির্ভরশীল না হয়ে তা প্রাপ্তির জন্য বিষয়টিকে আল্লাহর ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিয়ে ধৈর্যের সাথে কেবল তাঁর উপরেই ভরসা করতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, কোনো কবর বা কবরের পাশে অবস্থান করা, জীবনের যে কোনো কল্যাণার্জন ও অকল্যাণ দূরীকরণের জন্যে কোনো মৃত ওলির শরণাপন্ন হওয়া, তাঁদের সাহায্যের আশাবাদী হয়ে তাঁদেরকে আহ্বান করা ও তাঁদের উপর ভরসা করা প্রকাশ্য শির্ক। আখেরাতে মানুষের মুক্তির সোপান হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমান ও সঠিক

'আমল। যারা এ দু'টি বৈশিষ্ট্যে বলীয়ান হবে, কেবল তারাই এ দু'য়ের ওসীলায় আল্লাহর রহমতে মুক্তি লাভে ধন্য হবে।

- যারা বিশুদ্ধ ঈমান ও সঠিক 'আমল ব্যতীত মৃত ওলিদের শাফা'আতের মাধ্যমে আখেরাতের মহাসমুদ্র নিরাপদে পাড়ি দেয়ার চিমত্মা করে, তাদের সে চিমত্মা মাকড়সার জালের ন্যায়ই দুর্বল,[৩৯৭] মৃদু বাতাসে যে জাল ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়, সে জালকে মাকড়সার পক্ষে যেমন নিরাপদে বসবাসের জন্যে আশ্রয় স্থল হিসেবে ধারণা করা ঠিক নয়, তেমনি কারো পক্ষে আখেরাতের ভয়াবহ দিনে ওলিগণ কে মুক্তির নিরাপদ আশ্রয় স্থল হিসেবে ধারণা করাও ঠিক নয়।

- অলিগণের সুপারিশ লাভে আখেরাতে ধন্য হওয়ার আশায় যারা তাঁদের কবর ও কবরে সময় অতিবাহিত করছে, তারা প্রকৃতপক্ষে মারাত্মক ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে। কেননা, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে তাঁর প্রিয়ভাজন বলতে এমন কেউ নেই- যিনি তাঁর পূর্ব অনুমতি ব্যতীত স্বীয় মর্যাদার

---

[397]. আয়াতটি নিম্নরূপ:

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوۡلِيَآءَ كَمَثَلِ ٱلۡعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتۡ بَيۡتٗاۖ وَإِنَّ أَوۡهَنَ ٱلۡبُيُوتِ لَبَيۡتُ ٱلۡعَنكَبُوتِۚ لَوۡ كَانُواْ يَعۡلَمُونَ ٤١ ﴾ [العنكبوت: ٤١]

আল-কুরআন, সূরা আনকাবূত: ৪১।

ওসীলায় আখেরাতে তাঁর কাছে কারো জন্যে শাফা'আত করতে পারেন। বরং সাধারণ মানুষেরা আজ যাদেরকে আখেরাতে তাদের বিপদকালীন সময়ে সুপারিশ করতে পারবেন বলে সাব্যস্ত করে নিয়েছে, আল্লাহ সেদিন তাদের বলবেন: "তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বলে মনে করতে, তাদেরকে ডাকো, তখন তারা তাদেরগকে ডাকবে। কিন্তু তাঁরা তাদের ডাকে সাড়া দেবেন না। উপরন্তু আল্লাহ তাদের মাঝে একটি অমত্মরায় সৃষ্টি করে দেবেন"।[৩৯৮] ফলে তাদের সকল আশা ও ভরসা চিরতরে ব্যর্থতায় পরিণত হবে।

- আখেরাতে রাসূলুল্লাহ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-ব্যতীত অন্যান্য নবী-রাসূলসহ সকল মু'মিন ও ওলিগণ নিজের চিমত্মায় উদ্বিগ্ন থাকবেন। হাশরের ময়দানে হিসাব-নিকাশ চলাকালীন সময়ে একমাত্র সর্ব শেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মদ-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত সাধারণভাবে কারো জন্যে কারো কোনো সুপারিশের অস্তিত্ব কুরআন ও বিশুদ্ধ

---

[398]. আয়াতটি নিম্নরূপ:

﴿ وَيَوۡمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِيَ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمۡ فَدَعَوۡهُمۡ فَلَمۡ يَسۡتَجِيبُواْ لَهُمۡ وَجَعَلۡنَا بَيۡنَهُم مَّوۡبِقٗا ﴾ [الكهف: ٥٢]

আল-কুরআন, সূরা:কাহাফ: ৫২।

হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয়। হ্যাঁ, সাধারণভাবে তাঁদের সুপারিশ স্বীকৃত হয়েছে কেবল জাহান্নামী মু'মিনদের জাহান্নামে যাওয়ার পর তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনার ক্ষেত্রে। আল-কুরআনে আখেরাতে শাফা'আতের বিষয়টি শুধুমাত্র কাফির ও মুশরিকদের বেলায়ই অস্বীকার করা হয়নি, বরং মু'মিন মুশরিকদের বেলায়ও তা অস্বীকার করা হয়েছে।

অতএব, যে-সব মুসলিম ভাই ও বোনেরা আখেরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়ে ধন্য হয়ে মুহূর্তের জন্যেও জাহান্নামে না যেয়ে প্রথমেই জান্নাতে যেতে আগ্রহী, তাদেরকে এখন থেকেই যাবতীয় জ্ঞানগত, পরিচালনাগত, উপাসনাগত ও অভ্যাসগত শির্ক হতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে। নিজ বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাস থেকে যাবতীয় শির্কী কর্মকাণ্ডকে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে নিতে হবে। নিজের অজান্তে যত ছোট বা বড় শির্ক হয়ে গেছে সে সবের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইতে হবে। মনে রাখতে হবে, এর মধ্যেই রয়েছে আমাদের সকলের পরিত্রাণ।

تمت بالخير و لله الحمد و المنة. وما علينا إلا البلاغ . و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . و صلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم، ومن سار على نهجه و تبع هدايته إلى يوم الدين .

গ্রন্থপঞ্জী

1. আল-কুরআনুল করীম

তাফসীর গ্রন্থসমূহ:

2. ইবনে কাছীর, ইসমাঈল, আবুলফেদা, **তাফছীরুল ক্কুরআনিল ‘আযীম**; (বৈরুত: দ্বারুল মা‘রিফাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.)।
3. আল-খাযিন, ‘আলা উদ্দিন আলী ইবনে মুহাম্মদ, **তাফছীরুল খাযিন**; (লাহোর: নু‘মানী কুতুবখানা , সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।
4. আল-আলূছী, মাহমূদ, **রূহুল মা‘আনী**; (বৈয়রুত: দারু এহইয়াইত তুরাছিল ‘আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.)।
5. আল-রাজী, ফখরুদ্দীন, **তাফসীরুল কাবীর**, (স্থান বিহীন, ৩য় সংস্করণ , তাং বিহীন)।
6. আল-কুরত্বাবী, আবু ‘আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন আহমদ আল-আনসারী, **আহকামুল কুরআন**; ((মিশর:আল-হাইআতুল মিশরিয়্যাহতু লিল কুত্তাব, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.)।
7. কাজী ছানা উল্লাহ পানিপথী, আত-**তাফসীরুল মাযহারী**, (দেহলী: এদারাতু এশা‘আতিল ‘উলূম, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।
8. মুহাম্মদ শফী‘, মাওলানা মুফতী, **মা‘আরেফুল ক্কুরআন**;অনুবাদ ও সম্পাদনা: মাওলানা মহিউদ্দীন খান, (মদিনা: সৌদি ‘আরব, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

9. শাহ 'আব্দুল 'আযীয আদ-দেহলভী, **তাফসীরে ফাতহুল আযীয**।

10. যমাখশারী, জারুল্লাহ মাহমূদ ইবনে 'উমার, **আল-কাশশাফ**; (কুতুবখানা মাযহারী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

হাদীসের গ্রন্থসমূহ:

11. আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম, **মুসনাদ; (**বৈরুত: দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

12. ইবনে আবী শায়বাঃ, আবু বকর 'আব্দুল্লাহ, **আল-মুসান্নাফ** ;সম্পাদনা: কামাল ইউসুফ, (রিয়াদ:মাকতবাতুর রুশ্দ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৯হি:)।

13. ইবনে হিববান, মুহাম্মদ আল-বুস্তী, **সহীহ ইবনে হিববান**; (বৈরুত: মুআছছাছাতুর রিছালাঃ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯২ খ্রি.)।

14. ইবনে খুযায়মাঃ, মুহাম্মদ , **সহীহ**; সম্পাদনা: ড.মুহাম্মদ মুস্তফা আল-'আযমী, (বৈরুত: আল-মাকতবুল ইসলামী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৭০ খ্রি.)।

15. ইবনে মাজাহ, মুহাম্মদ ইবন ইয়াজীদ, **আস-সুনান**;সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুআদ আব্দুল বাকী, (স্থান বিহীন: দ্বার এহইয়াউত তুরাছিল আরাবিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

16. ইবনে হিববান, মুহাম্মদ আল-বুস্তী, **সহীহ ইবনে হিববান**;সম্পাদনা:শু'আইব আরনাউত, (বৈরুত: মুআস সাসাতুর রিসালাঃ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.)।

17. আবু জা'ফর ত্বহাবী, আহমদ ইবন মুহাম্মদ, **শরহে মা'আনী আল-আ-ছার**;সম্পাদনা:মুহাম্মদ যুহরী আন-নাজ্জার, (বৈরুত: দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৩৯৯হি.)।

18. আত-তাবরিযী, ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব, **মিশকাতুল মাসাবীহ** ; (মাকতাবা রশীদিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

19. আত-তিরমিযী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা, **আল-জামে'উস সুনান**; (মিশর:শরিকাতু মুস্তফা আল-বাবী..., ১ম সংস্করণ, ১৯৬২ খ্রি.)।

20. আদ-দারিমী, 'আব্দুল্লাহ ইবনে 'আব্দুর রহমান, **সুনানিদ দারিমী**;সম্পাদনা:ফাওয়ায আহমদ, (বৈরুত: দ্বারুল কিতাবিল 'আরাবী, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭হি:)।

21. আদ-দায়লামী, আবু শুজা' শেরওয়াই ইবন শহরদার ইবন শেরওয়াই , **মুসনাদুল ফেরদাউস**;সম্পাদনা: সাঈদ ইবন বিসুনী যাগলুল, (বৈরুত: দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.)।

22. আস্ সিজিস্তানী, সুলায়মান ইবন আশ'আছ, **আস্ সুনান**; (হিমস: সিরিয়া, সংস্করণ বিতীন, তাং বিহীন)।

23. আল-কুশাইরী, মুসলিম ইবন হাজ্জাজ, **আস-সহীহ**; সম্পাদনা: মুহাম্মদ ফুআদ 'আব্দুল বাকী, (বৈরুত: দ্বার এহইয়াউত তুরাছিল 'আরাবী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

24. আল-বানী, শায়খ মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন , **সিলসিলাতুল আহাদীসিদ দয়ীফাতি ওয়াল মাওদু'আঃ**; (বৈরুত: ১ম সংস্করণ)।

25. আত-ত্ববরানী, সুলায়মান ইবন আহমদ, **আল-মু'জামুল কবীর**; (মুসেল:মাকতাবাতুল 'উলূম ওয়াল হিকাম, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.)।

26. আন-নাসাঈ, আহমদ ইবনে শু'আইব আবু 'আব্দির রহমান, **আস-সুনান**;সম্পাদনা:ড. আব্দুল গাফ্ফার সুলায়মান, (বৈরুত: দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.)।

27. আন্নীসাপুরী, আবু 'আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল্লাহ, **আল-মুসতাদরাক** ;সম্পাদনা: মুস্তফা 'আব্দুল ক্বাদির আত্বা, (বৈরুত: দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯০ খ্রি.)।

28. বুখারী, আবু 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইবন ঈসমাঈল, **আস-সহীহ**;সম্পাদনা: ড. মুস্তফা আদীব আল-বাগা, (বৈরুত: দ্বার ইবনে কাছীর আল-ইয়ামামাঃ, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৭খ্রি.)।

29. বায়হাক্বী, আহমদ ইবনে হুসাইন, **আস্সুনানুল কুবরা**; (মক্কা: মাকতাবাতু দ্বারুল বায, সম্পাদনা: মুহাম্মদ আব্দুল কাদির আত্বা, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯৪ খ্রি.)।

30. রাহওয়ায়হ, ইসহাক ইবন ইব্রাহীম ইবন মিখলদ, **মুসনাদ**;সম্পাদনা:ড.আব্দুল গফুর আল-বেলূচী, (মদীনা:মাকতাবাতুল আইমান, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.)।

হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ:

31. ‘আজীমাবাদী, আবুত তাইয়্যিব মুহাম্মদ শামসুল হক, **‘আউনুল মা‘বূদ শরহে সুনানি আবী দাউদ**; (বৈরুত:দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ২য় সংস্করণ, ১৪১৫হি:)।

32. ইবনে হাজার ‘আসকালানী, **ফতহুল বারী বি শরহিল বুখারী,** (বৈরুত:দ্বারুল মা‘রিফাঃ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

33. ইবনুল আছীর, **আননেহায়াতু ফী গারীবিল হাদীসি ওয়াল আছার**; (বৈরুত: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

34. নববী, শরফুদ্দীন, শরহু **সহীহ মুসলিম**; (স্থান বিহীন: ১ম সংস্করণ, ১৯২৯ খ্রি.)।

35. মুল্লাহ ‘আলী আল-কারী, **মিরক্বাতুল মাফাতীহ;** (মুলতান:মাকতাবাঃ ইমদাদিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

36. শিববীর আহমদ ‘উছমানী, **ফতহুল মুলহিম বি শরহে সহীহ মুসলিম**; (করাচী: মাকতাবাতুল হেজায, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

‘আকীদার গ্রন্থাদি:

37. আহমদ বাহজাত, **আল্লাহু ফীল আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাঃ;** (কায়রোঃ মুআছ ছাসাতুল আহরাম, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.)।

38. আল-বরীকান, ইব্রাহীম, ড., **আল-মাদখালু লি দেরাসাতিল ‘আক্বীদাতিল ইসলামিয়্যাঃ;** (আল-খুবার: দ্বারুস সুন্নাঃ, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯২ খ্রি.)।

39. আল-জাযাইরী, আবু বকর জাবির, **'আক্বীদাতুল মু'মিন**; (জেদ্দা: দারুস শুরুক, ৫ম সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.।)।

40. আল-গাযালী, আল-ইমাম, **আল-ইক্বতেসাদ ফী উসূলিল এ'তেকাদ**।

41. আস-সাইয়্যিদ সাবেক, **আল-'আক্বাইদুল ইসলামিয়্যাঃ**; (বৈরুত: দারুল কিতাবিল 'আরাবী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৭৫ খ্রি.)।

42. 'আব্দুল 'আযীয আল-মুহাম্মদ আল-সলমান, **আল-আসইলাতু ওয়াল আজয়িবাতিল উসূলিয়্যাতি 'আলাল 'আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাঃ লি ইবনে তাইমিয়্যাঃ**; (প্রকাশ বিহীন, ২১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.)।

43. ইবন আবিল ইয্য, আল-হানাফী**, শরহুল 'আক্বীদাতিত ত্বাহাবিয়্যাঃ** ; (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৫ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন)।

44. শেখ 'আব্দুর রহমান ইবন হাসান আ-লুশ শেখ, **ফাতহুল মাজীদ বি শারহি কিতাবিত তাওহীদ** ; (লাহুর : আনসারুস সুন্নাতিল মুহাম্মদিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

45. শাহ ইসমাঈল শহীদ, **তাক্বিয়াতুল ঈমান**; (দেওবন্দ: মাকতাবা থানভী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮৪ খ্রি.)।

46. সুলাইমান ইবন 'আব্দিল্লাহ ইবন মুনী', আশ-শায়খ, **তাইসীরুল 'আযীযিল হামীদ ফী শরহে কিতাবিত তাওহীদ**; (বৈরুত: আল-মাকতবুল ইসলামী, ১ম সংস্করণ, ১৪০২হি:)।

47. মুবারক ইবন মুহাম্মদ আল-মীলী, **আশশির্কু ওয়া মাজাহিরুহু;** (মদীনা:আল-জামি‘আতুল ইসলামিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৪০৭হি:)।

48. মুল্লা ‘আলী ক্বারী আল-হানাফী, **শরহু কিতাবিল ফিকহুল আকবার**; (বৈয়রুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

49. মাহমূদ শালতুত, **আল-ইসলামু আক্বীদাতুন ওয়া শরী‘আতুন**; (কায়রো: দারুশ শুরুক, ১৭তম সংস্করণ, ১৯৯৭ খ্রি.)।

50. মুহাম্মদ আল-গাযালী, **‘আক্বীদাতুল মুসলিম**; (কায়রো: দারুল কুতুবিল ইসলামিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮০ খ্রি.)।

51. মুহাম্মদ খলীল হার্রাস, **শরহুল ‘আক্বীদাতিল ওয়াসিতিয়্যাঃ;** (মদীনা: মারকাজুদ দাওয়াঃ, সৌদি আরব, ৭ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন)।

52. যাকারিয়্যা ‘আলী ইউছুফ, **আল-ঈমান ওয়া আ-ছারুহু ওয়া আশশির্কু ওয়া মাজাহিরুহু**; (কায়রো: মাকতাবাতুস সালাম আল-‘আলমিয়্যাঃ, ২য় সংস্করণ, তারিখ বিহীন)।

ফিকহের গ্রন্থ সমূহ:

53. আল-কা-সানী, ‘আলউদ্দীন আবু বকর ইবন মাস‘উদ, **বাদাই‘উস সানাই‘উ**; (করাচী: এস.এম.সাঈদ কম্পানী, ১ম সংস্করণ, ১৯১০ খ্রি.)।

54. ইবনে ‘আবিদীন, **হাশিয়াত ুরদ্দিল মুহতার ‘আলাদ দুররিল মুখতার**; (পাকিস্তান:এইচ.এম.সাঈদ কম্পানী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

55. ইবনুল হুমাম, কামাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইবন ‘আব্দুল ওয়াহিদ, **শরহে ফতুহুল কাদীর**; (স্থান বিহীন: দ্বার এহইয়াউত তুরাছিল ‘আরাবী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

56. ইমাম নববী, **আল-মাজমূ‘ শরহুল মুহাজ্জাব**; (স্থান বিহীন:দ্বারুল ফিকর, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

57. ক্বাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি, ফতাওয়া রশীদিয়াঃ।

58. মুহাম্মদ ‘আব্দুর রহীম, **ফতাওয়া রহীমিয়্যাঃ**; (গুজরাট : মকতবা-ই- রহীমিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

59. মাওলানা ‘আব্দুল হাই, **ফতাওয়া আব্দুল হাই**; (মাকতাবা থানবী: দেওবন্দ , ১ম সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি.)।

60. সারখাসী, আবু বকর মুহাম্মদ ইবন আহমদ, **আলমাবসূত**ব; (করাচী: এদারাতুল কুরআনি ওয়াল ‘উলূমিল ইসলামিয়্যাঃ)।

ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কিত গ্রন্থাদি:

61. আল-মুবারকপূরী, সফিয়্যুর রহমান, **আর-রাহীক্বুল মাখতুম** ; (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৯৯৪ খ্রি., সংস্করণ বিহীন)।

62. ইবনে কাছীর, **আল-বেদায়াতু ওয়ান নেহায়াঃ**; (বৈরুত: মককতাবাতুল মা‘আরিফ, ৬ষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.)।

63. ইবনে হিশাম, **আস্ সীরাতুন নববিয়্যাঃ**;সম্পাদনা:মুস্তফা আস-সাক্কা ও গং, (মিশর:তুরাছুল ইসলাম, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

64. নদভী, সৈয়দ সুলায়মান, **তারীখু 'আরদিল 'আরব**; (করাচী:দ্বারুল এশা'আত, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

65. নদভী, সৈয়দ সুলায়মান, মাওলানা, **তারীখু আরদিল কুরআন**; (করাচী: দারুল এশা'আত, ১ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন)।

66. মুহাম্মদ ইবন 'আব্দুল ওয়াহহাব, **মুখতাসারু সীরাতির রাসূল**; (রিয়াদ: আর-রিয়াসাতুল দআ-স্মাহ লি এদারাতিল বুহুছিল ইলমিয়্যাঃ..., সংস্করণ বিহীন, ১৪০৮হিজরী)।

67. হাসান ইব্রাহীম হাসান, ড., **তারীখুল ইসলাম**; (কায়রো: মাকতাবাতুন নাহদাতিল মিশরিয়্যাঃ, ১৪ সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.)।

অন্যান্য 'আরবীগ্রন্থ:

68. ইবনে তাইমিয়্যাঃ, **আল-ক্বা'ইদাতুল জালীলাঃ ফিত তাওয়াসসুলি ওয়াল অছীলাঃ**; সম্পাদনায় সৈয়দ রশীদ রেজা, (...: মাকতাবাতিছ ছেক্বাফাতিত দ্বীনিয়্যাঃ, স্ংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

69. ইবনে তাইমিয়্যাঃ, আহমদ, **একতেজাউস সিরাতিল মুস্তাকীম**, সম্পাদনা: হামিদ আল-ফক্বী, (বৈরুত:দারুল মা'রিফাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

70. ইবনে তাইমিয়্যাঃ, **যিয়ারাতুল কুবূরি ওয়াল ইস্তেনজাদি বিল মাকবূর**; (রিয়াদ: আর রিয়াসাতুল 'আ-ম্মাঃ..., দারুল ইফতা, ১ম সংস্করণ, ১৪১০হি:)

71. ইবনুল জাওযী, আবুল ফরজ 'আব্দুর রহমান, **তলবীসে ইবলীস**; (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.)।

72. ইবনে হাজার আল-'আসক্বালানী, **লেসানুল মীযান**; (বৈরুত: মুআসসাসাতুল এ'লাম লিল মাত্ববূ'আত, ৩য় সংস্করণ, ১৯৮৬ খ্রি.)।

73. ইবনে কাছীর, ইসমাঈল, আবুল ফেদা ইসমাঈল, **ক্বাছাছুল আম্বিয়া**; সম্পাদনা : আব্দুল কাদির আহমদ আত্বা, (কায়রো: মাত্ববায়াতু হেসান, ১ম সংস্করণ, ১৯৮১ খ্রি.)।

74. ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ, মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর, **হাশিয়াতু ইবনিল কাইয়্যিম**; (বৈরুত: দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ২য় সংস্করণ, ১৯৯৫ খ্রি.)।

75. ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ, **এগাছাতুল লাহফান**; (কায়রো: দারুত তুরাছিল 'আরাবী, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.)।

76. ইবনে কাইয়্যিম আল-জাওযিয়্যাঃ, **মিফতাহু দারিস সা'আদাঃ**, (বৈরুত: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

77. আবু যুহরাঃ, ইমাম, **মুকারানাতুল আদইয়ান**; (কায়রো:দারুল ফিকরিল 'আরাবী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯১ খ্রি.)।

78. আহমদ রূমী, **মাজালিসুল আবরার**; (করাচী:দ্বারুল এশা‘আত, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

79. আহমদ শালাবী, ড.; **মুক্বারানাতুল আদইয়ান**; (কায়রো:মাকতাবাতুন নুহদাতিল মিসরীয়্যাঃ, ৮ম সংস্করণ, ১৯৮৯ খ্রি.)।

80. আস্ফাহানী, আবু নাঈম আহমদ ইবন ‘আব্দুল্লাহ**, হিলয়াতুল আউলিয়া**; (স্থান বিহীন, দ্বারুল কিতাবিল ‘আরাবী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৯৮৫ খ্রি.)।

81. আল-বানী, মুহাম্মদ নাসির উদ্দিন, **তাহজীরুস সাজিদ ‘আন ইত্তেখা-জিল কুবূরি মাসাজিদা**; (বৈরুত: আল-মাকতাবুল ইসলামী, ৪র্থ সংস্করণ, ১৪০২হিজরী)।

82. আল-জুরজানী, শরীফ ‘আলী ইবন মুহা**ম্মদ, কিতাবুত তা‘রীফাত**;বৈরুত: দাবুল কুতুবিল ইলমিয়্যাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি)।

83. আল-জাযাইরী, আবু বকর জাবির, **ওয়া জাউ ইয়ারকুদুন!!! মাহলান ইয়া দো‘আতাত দালালাঃ**; (وجاءوا يركضون !!! مهلا يا دعاة الضلالة) (স্থান বিহীন: মিন ওয়াছাইলিদ দা‘ওয়াঃ, ১৪০৬হিজরী)।

84. আদ-দেহলভী , শাহ ওয়ালী উল্লাহ, **হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাঃ**; (বৈরুত: দ্বারুল মা‘রিফাঃ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

85. আদ-দেহলভী, শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস, **আল-ফাউজুল কাবীর** ; (দেওবন্দ : এমদাদিয়া কুতুবখানা, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

86. গংগোহী, মাওলানা মুহাম্মদ হানীফ, **জাফারুল মুহাসসিলীন বি আহওয়ালিল মুআললিফীন**; (করাচী:দারুল এশা‘আত, ১ম সংস্করণ, সন বিহীন)।

87. ওয়াহিদ উদ্দিন খান, **আল-ইসলামু ইয়াতাহাদ্দা**; (কায়রো: আল-মুখতারুল ইসলামী, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

88. ফারুক হামাদাহ, ড., **আল-ওয়াসিয়্যাতুন নববীয়্যাঃ**; (আল-মাগরিব: দারুছ ছেক্কাফাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৮৩ খ্রি.)।

89. কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথি, **ইরশাদুত তালিবীন**।

90. মুহাম্মদ আরিফ সম্বহলী, মাওলানা, **ব্রেলভী ফিৎনা কা নয়া রূপ**; (উর্দূ ভাষায়), (লাহুর : আশ্রাফ ব্রাদার্স , ২য় সংস্করণ, ১৯৭৮ খ্রি.)।

91. মুহাম্মদ ইবন ‘আব্দুল ওয়াহহাব, **মাসাইলুল জাহিলিয়্যাঃ**; (মদীনা: মাত্বাবি‘উল জামে‘আতিল ইসলামিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, ১৩৯৬হিজরী)।

92. নদভী, আবুল হাসান ‘আলী , **মা-যা খাছিরাল আ-লামু বি ইনহেত্বাত্বিল মুসলিমীন**; (আলমিল ইসলামী লিল মুনাজ্জামাতিত ত্বুল্লাবিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮১ খ্রি.)।

93. নূর কেলীম, মাওলানা, **ব্রেলভী মাযহাব আওর ইসলাম**; (ফয়সালাবাদ : মাকতাবা দারুল উলূম ফয়যে মুহাম্মদী, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)

94. হাসানুল বান্না, **মাজমূ'আতু রাসা-ইলিল ইমাম আশ-শহীদ**; (বৈরুত: আল-মুআচ্ছাছাতুল ইসলামিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।

95. সাঈদ আহমদ বালনপূরী, **আল-'আউনুল কবীর ফিল ফাওযিল কবীর্**; (দেওবন্দ: মাকতাবাতু হেজায, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন, সংস্করণ বিহীন)।

বাংলা গ্রন্থ

96. 'আব্দুল মান্নান তালিব, **বাংলাদেশে ইসলাম**; (ঢাকা:আধুনিক প্রকাশনী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮০ খ্রি.)।

97. অধ্যাপক 'আব্দুলন্নুর সালাফী, **তৌহিদ বনাম শির্ক**; (রংপুর: সালাফিয়া প্রকাশনী, সংস্করণ বিহীন, ১৯৮৪ খ্রি.)।

98. এ.এইচ.এম শামসুর রহমান, **আপন গৃহে অপরিচিত**; (খুলনা: জাহান প্রিন্টিং প্রেস, ১ম সংস্করণ, ২০০০ খ্রি.)।

99. গোপাল হালদার, **সংস্কৃতির রূপান্তর**;মুহাম্মদ 'আব্দুর রহীম, মাওলানা, শির্ক ও তাওহীদ; (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২৫তম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.)।

100. গোলাম সাকলায়েন, **বাংলাদেশের সূফী সাধক**; (ঢাকা:ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ৫ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.)।

101. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান।

102. জয়ন্তানুজ বন্দোপধ্যায়, **ধর্মের ভবিষ্যৎ**; (কলিকাতা: এলাইড পাবলিশারস, ১ম সংস্করণ, তারিখ বিহীন), পৃ. ২৫।

103. দেওয়ান নূরুল আনোয়ার চৌধুরী, **শাহ জালাল (রহ.)**;৩য় সংস্করণ, ই.ফা.বা., ১৯৯৫ খ্রি.)।

104. মেহরাব আলী, **পীর চেহেল গাজী**; (স্থান বিহীন: ১ম সংস্করণ, ১৯৬৮ খ্রি.)।

105. মুহাম্মদ ইউনুছ, চৌধুরী লড়াই।

106. মো: বুরহানুদ্দিন, **‘শেরেক বিনাশ বা বেহেস্তের চাবি** , (আল-নাহদা প্রকাশনী, ১৩৯৫ বাংলা)।

107. মাওলানা সৈয়দ আহমদ, **‘শেরেক বর্জন**, (সাতক্ষীরা : হামিদিয়া লাইব্রেরী , ১৩৬৮ বাংলা)।

108. মাওলানা আকরম খাঁ**, মোসলেম বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস**; (ঢাকা: আজাদ অফিস, ১ম সংস্করণ, ১৯৬৫ খ্রি.)।

109. মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী, **আল্লাহ কোনো পথে**; (ঢাকা: সূফী ফাউন্ডেশন, আরামবাগ, ৩য় সংস্করণ, সন বিহীন)।

110. মাহবুবে খোদা দেওয়ানবাগী, **রাসূল সত্যই কি গরীব ছিলেন;** (ঢাকা: সূফী ফাউন্ডেশন, আরামবাগ, সংস্করণ বিহীন, সন বিহীন)।

111. মুহাম্মদ ফযলুল করীম, **তৌহীদ-রেসালত ও নূরে মুহাম্মদী (সা.)-এর সৃষ্টি রহস্য**; (কুমিল্লা:জমইয়াতু ‘উলামাই আহলিস সুন্নাত ওয়াল জামা‘আত, ১ম সংস্করণ, ১৯৯১ খ্রি.)।

112. **সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ**; (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৭ খ্রি.)।

113. সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, **ভেদে মা'রেফত**; (ঢাকা:আল-এছহাক প্রকাশনী, সংশোধিত সংস্করণ, ১৪০২ বাংলা)।

114. সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক, **তাবিজের কিতাব**; (ঢাকা: আল-এছহাক প্রকাশনী, সংশোধিত সংস্করণ, ১৩৯৭ বাংলা)।

115. স্বর্গীয় রমেশ চন্দ্র সরকার, **মুক্তির দরবার** ; (চট্রগ্রাম : শ্রী পুলিন বিহারী শীল, সংস্করণ বিহীন, ১৯৯২ খ্রি.)।

116. সৈয়দ মোস্তফা কামাল, **শাহ জালাল ও তাঁর কারামত**; (সিলেট : নিউ এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম সংস্করণ, ১৯৯৬ খ্রি.)।

117. হাবীবুর রহমান, **আছুদগানে ঢাকা**, উর্দ্দূ ভাষায় রচিত, (ঢাকা: মনজর প্রেস, ১ম সংস্করণ, ১৯৪৬ খ্রি.)।

118. "প্রেমের শুরা-এঙ্কের খনী (প্রকাশক: চাঁদপুরী শাহ দরবার শরীফ: খাদেম মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম, ১ম সংস্করণ)। লেখকের নাম বিহীন বই।

গবেষণা

১১৯. মুহাম্মদ আফাজ উদ্দিন, **"ইসলামী দাওয়াত বিস্তারে ও ধর্মীয় - সামাজিক সংস্কারে 'আব্দুল আউয়াল জৌনপুরী এর অবদান"**, পি.এইচ.ডি থিসিস, (ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া, অপ্রকাশিত, ১৯৯৮ খ্রি.),

অভিধান

119. অধ্যাপক আনতুয়ান না'মাহ ও গং, **আল-মুনজিদ;** বৈরুত: দারুল মাশরিক, ২১ সংস্করণ, ১৯৭২ খ্রি.।
120. ইবনে মানজুর, **লেছানুল 'আরব**; (কুম:নাশরুল আদাবিল হাওযাহ, সংস্করণ বিহীন, ১৮০৫হি:।
121. ইব্রাহীম মুস্তফা ও গং, **আল-মু'জামুল ওয়াসীত**; (তেহরান: আল-মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাঃ, সংস্করণ বিহীন, তারিখ বিহীন)।
122. 'উমার রেজা কাহহা-লাহ, **মু'জামুল মুআল্লিফীন**; (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাঃ, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৩ খ্রি.)।
123. ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, **'আরবী-বাংলা ব্যবহারিক অভিধান**; (ঢাকা: রিয়াদ প্রকাশনী, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮ খ্রি.।

পত্রিকা

124. দৈনিক ইনকেলাব, ২৫ সেপ্টেম্বর , ১৯৯৭ খ্রি.)।
125. দৈনিক 'করতোয়া', (বগুড়া : ১৮/১২/১৯৮৭ খ্রি.)।
126. সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা, (শুক্রবার, ৪/৮/২০০০ খ্রি.)।